জীবনের স্মৃতিদীপে

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার



প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, লেনিন সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৯

শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন
স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

আমার পরম স্নেহাস্পদা স্বর্গতা জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যার
দৌহিত্রী, পৌত্রী ও পৌত্র কেতকী, নন্দিনী, সৌগত
এবং
কাকলী সেনের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম

ভূমিকা

"ইতিহাস"-নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি ইহার প্রতি সংখ্যায় আমার "স্মৃতিকথা" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা শেষ হইবার পূর্বেই এই পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে আমার ভূতপূর্ব ছাত্র জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমান সুরেশচন্দ্র দাস ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। নবতিবর্ষ বয়সে নূতন করিয়া ইহার অবশিষ্ট অংশ লিখিতে অসমর্থ হওয়ায় "ইতিহাস" পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করি—ইহাই এই গ্রন্থখানি রচনার ইতিহাস। সুরেশচন্দ্রই এই গ্রন্থের নামকরণ-কর্তা।

"ইতিহাস" পত্রিকায় প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু আমি মুখে মুখে বলিয়া যাইতাম, আর শ্রীমান শোভনচন্দ্র বসু ইহা লিখিত। এইজন্য শোভনের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্য লেখার পর আমি নিজে ইহা পড়িয়া দেখিতাম।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের জন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তবে এইটুকু বলিতে পারি, আমি জ্ঞাতসারে সত্যের অপলাপ করি নাই।

এই জীবনকাহিনী একটি স্মৃতিচারণ মাত্র। নব্বই বছর বয়সে স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। সুতরাং এই গ্রন্থ আমার পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী নহে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বিষয়-সূচী

বংশ পরিচয়

বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া গ্রামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর এক বৈদ্যবংশে আমার জন্ম। আমাদের বংশ কুলীন হিসেবে এক সময় অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল ; এখন আর সেসব কিছুই নেই। বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় আমাদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের অনেক উল্লেখ আছে। বাল্যকালে আমার এক বৃদ্ধ জ্যাঠামহাশয়ের কাছে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক কাহিনী বহুবার শুনেছি। এইসব কাহিনী কতদূর সত্য বলতে পারিনা। তবে ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী হিসেবে এর কিছু মূল্য আছে এবং বিভিন্ন প্রাচীন পরিবারের এরূপ কাহিনী একত্র করলে মধ্যযুগের ইতিহাসের কিছু উপকরণ সংগৃহীত হতে পারে। এ জন্যই কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করছি।

বল্লাল সেন যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তিত করেছিলেন আমাদের বংশ সেই প্রথা অনুসারে কুলীন বলে পরিচিত। আমরা বিষ্ণুদাসের বংশধর ; এই বংশের অনেক বৈদ্যসন্তান বাংলা দেশের নানা স্থানে বাস করেন। আমাদের বংশের ইষ্টগুরু সিদ্ধগুরু সর্ববিদ্যার সন্তান এবং এই সর্ববিদ্যা সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

আমাদের বংশের আদি নিবাস ছিল রাঢ় দেশে। সেখান থেকে এই বংশের কয়েকজন বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মূলঘর (নামান্তর খাড়ারিয়া) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই বংশে মূলঘরে হরিনাথ নামে একজন বড় জমিদার ছিলেন ; তাঁর রাজা উপাধি ছিল। রাজা হরিনাথের প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও মূলঘরে আছে এবং তাঁর বংশধরদের কেউ কেউ এখনও সেখানে বাস করে। রাজা হরিনাথ বাইশটি পরগনার মালিক ছিলেন এবং সে সময়ে তিনি একজন খুব প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এই প্রতিপত্তির সাহায্যে সমগ্র বৈদ্যবংশে শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করবেন—এই সংকল্প করে তিনি বৈদ্যদের একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। অন্যান্য বৈদ্যসম্প্রদায় তাঁকে বাধা দেবার জন্যে ঘটকবংশের এক ব্যক্তিকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে এই সভায় পাঠালেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হরিনাথের প্রজা। সুতরাং তারা হরিনাথের অনুকূলে ছিল, অর্থাৎ তিনিই যে বৈদ্যকুলে শ্রেষ্ঠ— এই দাবির প্রতিবাদ করতে সাহস করল না। ঘটকবংশীয় প্রতিনিধি তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—'রাজা

বাহাদুর, আপনার মাতুলগোষ্ঠীর কাউকেই এই সভায় দেখছি না।' এর স্পষ্ট ইঙ্গিত হল এই যে হরিনাথের মাতার বংশ ছিল অকুলীন; কাজেই উভয় কুলের কৌলীন্য না থাকায় তাঁর পক্ষে কুলীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা অসংগত। সুতরাং এই উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে হরিনাথ সভাভঙ্গ করলেন; সভা থেকে বাইরে এসেই সেই ঘটককে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন। ঘটক পূর্বেই এমন ঘটবে অনুমান করে একটি নৌকা প্রস্তুত রেখেছিলেন; সভায় নিজ বক্তব্য নিবেদন করেই তিনি নৌকাযোগে পলায়ন করলেন। সেই থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানে আমাদের বংশ এবং উক্ত ঘটক বংশের কেউ উপস্থিত থাকলে বৈদ্যদের মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিতর্ক বাধত। কারণ বিবাহ-সভায় উপস্থিত কুলীন বৈদ্যদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীনকে একটি থালা ও মালাচন্দন দেওয়ার প্রথা ছিল। এই থালা কার প্রাপ্য এ নিয়ে ঘোরতর কলহ হত। আমি নিজে বিবাহসভায় এমন কলহ দেখেছি। এখন অবশ্য এসব কিছুই নেই।

রাজা হরিনাথ খুব প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর পিতা বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় পুনরায় বিবাহ করেন এবং এই স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মলাভ করাব পরেই এই স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। তখন হরিনাথের স্ত্রী সেই শিশুকে লালন-পালন করতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি দুভাগ হওয়ার আশঙ্কায় হরিনাথ এই শিশুকে হিংসা করতেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে বধ করবার সংকল্প করলেন। হরিনাথের স্ত্রী তা টের পেয়ে তাঁর এক প্রজাকে ডেকে এই শিশুপুত্রকে একটি ডোলের মধ্যে লুকিয়ে তাঁদের জমিদারির মধ্যে বহুদূরে অবস্থিত সেনদিয়া নামে একটি গ্রামে পাঠিয়ে দেন। এই শিশুই আমার পূর্বপুরুষ যাদবচন্দ্র।

যথাকালে বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করে হরিনাথের জমিদারির অর্ধেক দাবি করলেন। তাঁর দাবি মঞ্জুর হল, নবাব তাঁকে এক ফরমান দিয়ে জমিদারির অর্ধাংশের মালিক করে দিলেন। এই দানপত্র নিয়ে দেশে ফেরবার সময় পথে দ্বিপ্রহরে স্নান-আহারের জন্য তিনি একটি গাছের তলায় আশ্রয় নেন। কাপড়-চোপড়ের পুঁটলিটি গাছের তলায় রেখে তিনি স্নানের জন্য পুকুরে নামেন, এমন সময় একটি বানর এসে সেই পুঁটলিটি নিয়ে গাছের উপরে উঠে বসে; অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে এই মূল্যবান দলিলটিও বানর ছিঁড়ে ফেলে। এই ব্যাপারে হতাশ হয়ে আমার সেই পূর্বপুরুষের ধারণা হয় জমিদারি ভোগ করা তাঁর কপালে নেই। সুতরাং সেনদিয়ায় ফিরে এসে নিজ অংশ উদ্ধারের আর কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি।

যাদবচন্দ্রের বংশের অনেকেই সেনদিয়া গ্রামে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকঘর দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন; কেউ কেউ এখনও আছেন। সেনদিয়া নিবাসী আমাদের এই বংশের অম্বিকাচরণ মজুমদার জ্ঞাতি হিসাবে

আমার দাদা ছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। অধুনা স্বাধীন বাংলা দেশের অন্যতম মন্ত্রী এই বংশের ফণী মজুমদার এখনও সেনদিয়ায় আছেন।

আমার এক পূর্বপুরুষ অবস্থাবিপাকে সেনদিয়া গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর এক জ্ঞাতি ভাই একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আহারাদির পর হঠাৎ বুকের উপর বসে জোর করে একটি দানপত্রে সই করতে বাধ্য করেন। আমাদের সম্পত্তির অনেকটা অংশ ঐ জ্ঞাতি ভাইকে দান করা হল— দানপত্রে এরূপ লেখা ছিল। এই ঘটনার পরেই আমার ঐ পূর্বপুরুষ সেনদিয়া ত্যাগ করে আট-দশ মাইল দূরে খান্দারপাড়া গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন।

খান্দারপাড়ায় আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের এক ভাই কবিরাজচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁর লেখা দু-একখানি বইয়ের কথা ছেলেবেলায় শুনেছি। এইসব বইয়ের পুঁথিও নাকি আমাদের বাড়িতে ছিল; কিন্তু বহু খোঁজ করেও আমি তা পাই নি। কবিরাজচন্দ্র নাটোরের রানী ভবানীর সভায় বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি সভাপণ্ডিতের মর্যাদা পেতেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদিন তিনি আমাদের গ্রামের বাড়ির সামনে পুকুরে (পুকুরটি এখনও আছে) নেমে হাত-মুখ ধুচ্ছেন এমন সময় সেখানে দশ-পনেরো জন ব্রাহ্মণের আগমন ঘটে। কিছু দূরের এক গ্রামে তাঁদের বাড়ি; অন্য গ্রামে এক শ্রাদ্ধসভায় তাঁরা যাচ্ছেন। পথে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়িতে তাঁরা সেদিন অতিথি হয়েছিলেন। কবিরাজচন্দ্র শুনলেন ঐ শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদের মধ্যে যে তর্ক হবে তাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কী কী প্রশ্ন করবেন তাই বলাবলি করছেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে তিনি বললেন— আপনারা ঐ প্রশ্ন না করে যদি এরূপ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন তা হলে বিপক্ষকে পরাস্ত করা সহজ হবে। কবিরাজচন্দ্রের সঙ্গে এভাবে কিছু আলাপ-আলোচনার পর ব্রাহ্মণেরা তাঁকে বললেন—আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে আপনি তর্কে যোগ দেবেন। কবিরাজচন্দ্র বললেন— আমি জাতিতে বৈদ্য। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের তর্কসভায় অংশ নেওয়া আমার পক্ষে অনুচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা শুনলেন না। তাঁরা বললেন— আমাদের সঙ্গী হয়ে আপনি চলুন। আপনাকে কোনো প্রশ্ন করতে হবে না। আপনি পাশে বসে বলে দেবেন, আমরা সেইমত তর্ক করব। অগত্যা কবিরাজচন্দ্র তাঁদের সঙ্গী হয়ে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হলেন। সেখানে উভয়পক্ষে তুমুল তর্কবিতর্ক চলে। কবিরাজচন্দ্রের প্রশ্ন ও উত্তর শুনে বিপক্ষের পণ্ডিতেরা বিশেষ আশ্চর্য হলেন এবং তাঁর নিবাস কোথায় জানতে চাইলেন। উত্তর শুনে তাঁরা বললেন— এতদিন জানতাম মা সরস্বতীর এক চরণ বাকলায়, অন্য চরণ নবদ্বীপে। এই নগণ্য জায়গায় আপনার ন্যায় পণ্ডিতের বাস এ জানা ছিল না। কবিরাজচন্দ্র বললেন— মা সরস্বতীর দু চরণ দু জায়গায় ঠিকই আছে। কিন্তু সেজন্যেই তো তাঁর দৃষ্টি ঠিক মধ্যস্থানে

পড়েছে। উত্তরে মুগ্ধ হয়ে একজন পণ্ডিত তাঁকে প্রণাম করতে অগ্রসর হলেন। কবিরাজচন্দ্র শশব্যস্তে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন— প্রণাম করবেন না। কারণ আমি জাতিতে বৈদ্য, ব্রাহ্মণের প্রণাম নেওয়া আমাদের অপরাধ। এই শুনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দিলেন— তুমি বৈদ্য হয়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক করেছ; তুমি নির্বংশ হও।

কবিরাজচন্দ্র বিষণ্ণ চিত্তে গ্রামে ফিরে এলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি গণনা করে দেখলেন তাঁর দুই পুত্রই অকালে প্রাণত্যাগ করবে এবং তিনি নির্বংশ হবেন। মনের দুঃখে তিনি সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। আমাদের বাড়ির সামনে একটি বড় গাছ ছিল, ছেলেবেলায় আমিও সেটি দেখেছি। দুই শিশুপুত্রকে নৌকাযোগে মাতুলালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে কবিরাজচন্দ্র সেই গাছে উঠে বসলেন। নৌকায় পুত্রেরা দূরে চলে যাচ্ছে, তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। নৌকা একেবারে চোখের আড়ালে চলে যাবার পর তিনি গাছ থেকে নেমে সংসার ত্যাগ করে চলে যান।

কবিরাজচন্দ্র মজুমদারের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলে খুব খ্যাতি ছিল। আমাদের বাড়িতে একটি টোল ছিল; অনেক ছাত্র সেখানে পড়তে আসত। যেখানে এই টোল ছিল সেখানে একটি পঞ্চবটী আমি দেখেছি। আমার বাল্যকালে বৃদ্ধ জ্যাঠামহাশয়ের কাছে শুনেছি তাঁর যখন আট-দশ বছর বয়স তখন পাল্কি করে যেতে যেতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ির পঞ্চবটীর কাছে পাল্কি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করেন কবিরাজচন্দ্র মজুমদারের বংশের কে এখন জীবিত আছে? জ্যাঠামহাশয় তাঁকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিলেন। শুনলেন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, আমাদের বাড়ির টোলে তিনি কবিরাজচন্দ্রের কাছে পড়তেন। এই অঞ্চলে কার্য উপলক্ষে তিনি এসেছেন; যে-স্থানে টোল ছিল সেই স্থানটি দেখার জন্যই তিনি সেখানে এসেছেন। ঐ পণ্ডিত আরো জিজ্ঞাসা করেন কবিরাজচন্দ্রের যে অনেক পুঁথি ছিল সে-সব কোথায়? জ্যাঠামহাশয় উত্তরে বললেন আমাদের বাড়িতে কিছু নেই। আমার ছেলেবেলায় একজন প্রতিবেশী সেগুলি নিয়ে গেছেন এবং বহুদিন হল টোলও বন্ধ হয়ে গেছে। এর কারণস্বরূপ জ্যাঠামহাশয় বলেন যে সংসার ত্যাগ করে চলে যাবার সময় কবিরাজচন্দ্র বলেছিলেন যে তাঁর বংশের কেউ যেন আর কখনও সংস্কৃত শিক্ষা না করে; করলে বংশ থাকবে না।

এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি যখন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার জন্য সংস্কৃত শিখতে মনস্থ করি এবং একজন পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিখতে শুরু করি তখন সেই জ্যাঠামহাশয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে সংস্কৃত শিখতে নিষেধ করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এই পূর্ব কাহিনী তিনি আমাকে বললেন। আমি অবশ্য সংস্কৃত বিশেষ শিখি নি; তবে একজন পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত গ্রন্থাদি কিছু পড়েছিলাম। আমার একটিমাত্র পুত্র; সেই পুত্রের

কোনো সন্তান নেই। সুতরাং কবিরাজচন্দ্রের অভিশাপ বুঝি সত্যসত্যই ফলেছে। এখানে বলা আবশ্যক আমি ছাড়া আমাদের বংশের আর কেউ স্কুলকলেজের সংস্কৃত পাঠের বাইরে কখনও সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করেন নি।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার সংস্কৃত বিদ্যাও যেমন কম, কবিরাজচন্দ্রের অভিশাপও সেরূপ আংশিকভাবে ফলেছে বলা চলে। কারণ আমার দুই দৌহিত্র এবং এক দৌহিত্রী আছে এবং তাদের এক পুত্র ও তিন কন্যা আছে। আশা করা যায় এদের দ্বারা আমার বংশধারা ও বংশস্মৃতি আরো শতবর্ষ বহমান থাকবে।

কবিরাজচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ— আমার প্রপিতামহ রামকুমার মজুমদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও আমার পিতামহের বিমাতা সহমরণে যান। এর সঠিক তারিখ জানি না। তবে সম্ভবতঃ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এটি অনুষ্ঠিত হয়। আমার জ্যাঠাইমা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং আমি তাঁর মুখে এই বিবরণ শুনেছি। সহমরণের উদ্যোগের খবর শুনে থানার দারোগা আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, সহমরণে যাওয়া বে-আইনি। তিনি আমার পিতামহের বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করেন— আপনি কি স্বেচ্ছায় সহমরণে যাচ্ছেন? না, কেউ জোর করে, অথবা প্রলোভন দেখিয়ে আপনাকে সহমরণে যেতে বলছে? তিনি বলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সহমরণে যাচ্ছেন। মনের দৃঢ় ইচ্ছা প্রমাণ করবার জন্যে দারোগার সামনে একটি সরিষার তেলের প্রদীপ জেলে তিনি নিজের হাতের একটি আঙুল সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ফেলেন। এই ঘটনার পর দারোগা আর তাঁকে বাধা দেন নি। আমাদের গ্রামে একটি কালী মন্দিরের কাছে যে শ্মশানঘাট ছিল সেখানেই তিনি সহমরণে যান। আশেপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এসেছিল ঐ দৃশ্য দেখতে। সহমরণের জায়গায় গ্রামবাসীরা একটি বেলগাছ লাগিয়েছিল। ছেলেবেলায় আমরা ঐ গাছের কাছে প্রায়ই যেতাম। এই অঞ্চলে এর পরে আর কোনো সতীদাহ হয় নি।

আমার পিতামহ রতনমণি মজুমদার এক জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। তাঁর মাহিনা ছিল মাসিক মাত্র পাঁচ টাকা। তবে তহুরী প্রভৃতি বাবদ আরো কিছু উপরি পেতেন এবং সামান্য কিছু জমিজমাও ছিল। এর দ্বারাই তিনি সেকালে তাঁর নাতিবৃহৎ সংসার চালিয়েছেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমান বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া নামে একটি ছোট গ্রামে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর আমার জন্ম হয়। এই গ্রাম তখন মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে গোপালগঞ্জ মহকুমার অধীনে আসে। আমার পিতা হলধর মজুমদার আগরতলায় ত্রিপুরা এস্টেটের রাজার উকিল ছিলেন। তখন প্রাচীন যৌথ পরিবারের রীতি অনুসারে তিনি বিদেশে একাকী থাকতেন; মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন।

আমার পিতামহের ছয় পুত্র— তিনজন দেশে থাকতেন, আর অন্যরা বাইরে চাকরি করতেন। আমাদের যৌথ পরিবার, পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশজন। গ্রামে আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, যে সামান্য জমি ছিল তা থেকে বছরে আয় হত মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। আমার পিতাকে এই বৃহৎ পরিবারের ভরণ পোষণ করতে হত। শৈশবে দারিদ্র্যের মধ্যে আমরা মানুষ হয়েছি ; কোনো রকমে আমাদের সংসার চলত। দু-চার দিন অন্ন জোটে নি, এমন ঘটনাও মনে পড়ে। আমার পায়ে জুতাও ছিল না। পাঁচ-ছ বছর বয়সে 'নিমা'র মতো (ফতুয়ার মতো দেখতে) এক প্রকার চার-ছ' আনা দামের জামা প্রথম পরি। সে দিনগুলি ছিল খুবই দুঃখকষ্টের। আমাদের ঘর ছিল খড়ের। লোকে শত্রুতা করে দু-তিনবার আমাদের ঘরে আগুন দেয়। আমরা যখন বড় হই, তখন টিনের ঘরে বাস করতাম। আমাদের ঘরে মাটির মেঝে, বাঁশ ও হোগলার বেড়া ছিল। আমার যখন দেড় বছর বয়স তখন আমার মাতা বিধুমুখী দেবী পরলোক গমন করেন। তারপর জ্যাঠাইমা আমাকে প্রতিপালন করেন। আমরা তিন ভাই। আমিই কনিষ্ঠ, অন্য দুজনের নাম প্রকাশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র। আমার দুই দিদি ছিলেন শশীমুখী ও প্রমদা। এঁরা সকলেই এখন পরলোকে।

আমার মাতৃকুলের বংশ পরিচয় সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। আমার মাতামহ প্রসন্নকুমার সেন মহারাজা রাজবল্লভের অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র অর্থাৎ ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ। আমার মাতা তাঁর একমাত্র সন্তান। অনেকেই জানেন যে রাজা রাজবল্লভ নবাব আলিবর্দী ও সিরাজ-উ-দৌল্লার সময়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। নবাব আলিবর্দীর কন্যা ঘসেটি বেগমের স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন। রাজবল্লভ প্রথমে তাঁর এবং তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা ঘসেটি বেগমের দেওয়ানের পদলাভ করেছিলেন; পরে কিছুকালের জন্য বিহারের শাসনকর্তাও ছিলেন। ঢাকার কাছে রাজনগরে তাঁর বিশাল প্রাসাদ এবং পঞ্চরত্ন, নবরত্ন ও একুশরত্ন মন্দির ছিল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্মের অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত আমার মাতামহ রাজনগরের বাড়িতেই ছিলেন। বাড়িটি ছিল পদ্মার ধারে। নদীর স্রোতের টানে বসতবাড়ির অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে তিনি গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইখানেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজনগর শহরটি পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

লর্ড কার্জন ভাইসরয় হয়ে এদেশে আসার পর কোম্পানির আমলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের—যাঁরা এক সময় ইংরাজদের কোনো-না-কোনোভাবে সাহায্য করেছিলেন—সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। এই সূত্রে তিনি রাজা রাজবল্লভের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন। রাজবল্লভের কোনো বংশধর আছেন কিনা সে বিষয়ে কর্মচারীদের সন্ধান করতে বলেন। এই সূত্রে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্ধান তিনি পান। সম্ভবতঃ ভাইসরয়েরই নির্দেশে আমার ভ্রাতা একটি সরকারী চাকরি লাভ করেন। বলা আবশ্যক যে এর পূর্বে আমার মাতামহকেও ইংরাজ সরকার ডেপুটিগিরির

মতো একটি ভালো চাকরি দিয়েছিলেন, কিন্তু মদ্যপানে অতিরিক্ত আসক্তির ফলে সে চাকরি তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর দুর্দশা আমি নিজে দেখেছি। তিনি পরে কালীঘাটে খোলার ঘরে থাকতেন এবং সামান্য উপার্জন করতেন। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চাকরি পেলে তাঁকে মাসিক সাহায্য করতেন। এইভাবে রাজবল্লভের বংশধরের জীবিকা নির্বাহ হত। কলকাতায় এসে যখন আমি স্কুলে ভর্তি হই, তাঁর সঙ্গেই থাকতাম। তাঁর জ্ঞাতিদের মধ্যে কেউ কেউ যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। আমি তাঁদের কয়েকজনকে দেখেছি। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র চন্দ্রকান্ত সেন ও তাঁর পুত্র কালীচরণ সেন দুজনেই আসামের সরকারী উকিল ছিলেন। গৌহাটিতে এখনও তাঁদের বাড়ি আছে।

মহারাজা রাজবল্লভের বংশধরদের অনেকেরই কেন এমন দুর্দশা হয়েছিল, আমার মাতামহীর কাছে সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনেছি। তার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; কেবল একটির কথা বলি।

পূর্ববঙ্গে এবং অন্যান্য বহু জায়গায় তাঁদের বড় বড় জমিদারি ছিল। কিন্তু মদ্যপানে আসক্তির জন্য জমিদারেরা নিজেরা কেউ জমিদারি দেখাশোনা করতেন না। কর্মচারীরাই ছিল সর্বেসর্বা। খাজনা বাকীর দায়ে জমিদারি অন্যের নামে নীলাম করিয়ে কর্মচারীরাই তা ভোগদখল করত। সেন পরিবারের একটি খুব বড় পরগনা ছিল বজর গোমেদপুর অথবা গোবিন্দপুর। যখন সেই পরগনার জমিদারি নীলামে ওঠে, তখন জমিদারবাবু বললেন— বাংলা দেশে এত বড় ধনী কে আছে যে আমার এত বড় পরগনা কিনবে? তাঁর খেয়াল ছিল না যে নীলামে সবচেয়ে বেশি ডাক যে দেবে সেই জমিদারির মালিক হবে। এভাবেই সেই পরগনাটি (অথবা অন্য একটি) নীলামে ক্রয় করে ঢাকার গণি মিঞা তাঁর জমিদারির পত্তন করেন।

মাতামহীর কাছে গল্প শুনেছি ৺বিজয়া দশমীর দিন বাবুরা আশ্রিতজনকে আশীর্বাদ করতেন। একটি বড় ধামাতে টাকা রাখা হত, হাতের মুঠোয় যা উঠত তাই তাঁরা আশীর্বাদস্বরূপ দিতেন।

৺বিজয়ার সময় আর-একটি বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। একটি বড় চৌবাচ্চা মদ ঢেলে পূর্ণ করা হত। মাঝখানে একটি ফুল ভাসানো থাকত। চৌবাচ্চার চারপাশে বসে বাবুরা নল মুখে দিয়ে টানতেন, ফুলটিকে নিজের দিকে টেনে আনতে পারলে বাবুর জয়। মাতামহী শ্বশুর বাড়ি এসে নিজেই এসব দেখেছেন। সুতরাং এ সবই যে সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা দেশের অনেক অভিজাত পরিবার কিরূপে ধ্বংস হয়েছে, এই কাহিনীগুলিতে তার স্পষ্ট আভাস আছে। রাজনগর ধ্বংস হবার পর আমার মাতামহ প্রথমে পালং গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন পরে কালীঘাটে বাস করেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেক পরিবারের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল তারই নমুনা-স্বরূপ এই কাহিনী উল্লেখ করলাম।

যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম এবং যেখানে আমার বাল্য ও শৈশবকাল কেটেছিল, তার সঙ্গে পাকিস্তান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বরাবরই আমার বিশেষ যোগ ছিল।

কলেজে পড়বার পরেও প্রতি বছর ছুটিতে বাড়ি যেতাম। যে সামাজিক পরিবেশে আমার গ্রাম-জীবন কেটেছে, তা তখনকার প্রচলিত হিন্দু গোঁড়ামিরই পরিচায়ক। নানা বিষয়ে সামাজিক দলাদলি ছিল এবং বিবাহাদি কোনো শুভ কার্যে একটা গোলমাল প্রায় অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার ছিল। যতদূর মনে পড়ে গ্রামের মধ্যে পরস্পর রেষারেষির ভাবটা খুব বেশি ছিল। এক পরিবারের সঙ্গে আর-এক পরিবারের মামলা মোকদ্দমা লেগেই থাকত। তার ফলে একে অন্যের অনিষ্ট করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করত না। কবিতায় বা কল্পনায় আমরা গ্রামের যে শান্তিময় জীবনের ছবি দেখে মুগ্ধ হই, আমার জীবনে অন্ততঃ সেরূপ অভিজ্ঞতা তেমন নেই। আমার অভিভাবকেরা একটু তেজীয়ান মানুষ ছিলেন, কারুর কাছে বড় নতি স্বীকার করতেন না। ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা থাকলেও স্পষ্ট কথা বলতেন। ফলে এই হয়েছিল যে, আমার বাল্যকালে গ্রামের লোকে শত্রুতা করে আমাদের বাড়িতে আগুন লাগাত; এর মধ্যে দু'বারের কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। আমাদের ছিল খড়ের ঘর, সবগুলিই এই আগুনে পুড়ে যায়। মেজদাদা ও আমি অভিভাবকদের নির্দেশমতো এই সময় একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক 'ব্রহ্মা রক্ষা করো'— এই কটি কথা আওড়াতে থাকি। শত্রুতা করে মানুষে যে আগুন দিয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। সামাজিক ব্যাপারেও দলাদলির অন্ত ছিল না। সে সময়ে অন্ততঃ গ্রামদেশে বিলেত যাওয়া সমাজের অনুমোদন পায় নি। আমার মেজদাদা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। সেজন্য গ্রামের লোকে আমাদের একঘরে করেছিল। অর্থাৎ আমাদের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে কেউ আসত না এবং অন্যদের ক্রিয়াকর্মেও কেউ আমাদের যেতে বলত না। কেবল আমাদের গ্রামেই নয়, অন্যান্য গ্রামের স্বজাতীয় বৈদ্যরা আমাদের এই রকম ত্যাজ্য করে রাখে। আমার দাদা ফিরে এলে আমাদের কুলগুরুর ইচ্ছানুসারে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা আত্মীয়কুটুম্বরা আমাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বর্জন করেছিলেন। অবশ্য ধীরে ধীরে সব-কিছুরই পরিবর্তন হয়। যখন অনেক বাড়ি থেকেই ছেলেরা বিলেত যেতে আরম্ভ করল, তখন আস্তে আস্তে আমরাও সমাজে উঠে গেলাম। বাংলা দেশের হিন্দু সমাজে এ এক বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিক্ষালাভের জন্য মেজদাদা বিদেশ যাওয়ায় আমরা একঘরে হয়েছিলাম। এর প্রায় ৫০ বছর পরে আমি নিজে যখন সস্ত্রীক বিলেত ঘুরে এলাম, তখন এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই কেউ তোলেন নি। হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে কী গুরুতর পরিবর্তন ও সংস্কার আপনা আপনি ঘটে গেছে, এটি তারই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গ্রাম-জীবনের আরো দু-একটি কথা— যা এখনকার পরিস্থিতিতে বিশেষ করে মনে পড়ে, তা হল হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্ক এবং হিন্দুর মধ্যে অস্পৃশ্য জাতির অবস্থা। আমাদের গ্রামে চাল্লিশ-পঞ্চাশ ঘর বৈদ্য ব্রাহ্মণ ও নীচু শ্রেণীর কায়স্থ ছিলেন, আর আশেপাশে চারিদিকেই মুসলমান কিম্বা নমঃশূদ্রের গ্রাম। প্রতি গ্রামে হয় সবাই মুসলমান, নয়তো সবাই নমঃশূদ্র। কদাচিৎ আমাদের গ্রামের মতো দু-একটি বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-কায়স্থের গ্রাম দেখা যেত— সেখানে দু-চার ঘর ধোপানাপিত, নমঃশূদ্রও থাকত। আমার বেশ মনে আছে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দুর বা মুসলমানের কোনো অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু জাতিভেদের কঠোরতা বজায় ছিল। আমাদের বাড়িতে আমাদের গ্রামেরই একজন নমঃশূদ্র চাকর ছিল। তাকে উঠানে বসে খেতে হত, ঘরের বারান্দায় বসেও সে খেতে পেত না। কিন্তু এটা সে খুব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিত ; এ নিয়ে কোনোদিন কোনো আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করে নি। ঠিক এইভাবেই মুসলমানের ছোঁয়া রান্না-জিনিস খাওয়ার কথা কেউ কল্পনা করতে পারত না। সম্ভ্রান্ত কোনো মুসলমান কোনো হিন্দুর বাড়ি এলে তাঁকে ঘরের বারান্দায় বসতে হত ; তিনি ঘরের মধ্যে আসতে পারতেন না। অথচ আমাদের পরস্পরের মধ্যে আসা-যাওয়া চলত। মুসলমানেরা আমাদের বাড়িতে আসতেন, আমরাও তাঁদের বাড়ি যেতাম। একই স্কুলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পড়ত। আমার অনেক মুসলমান সহপাঠী ছিল। তাদের বাড়িতে আমি বহুবার গেছি। অনেক সময় সেখানে ফল কিম্বা মুড়ি খেতে দিয়েছে। কিন্তু জল খেতে হলে পুকুর ঘাটে গিয়ে খেতে হত। তারা জল খেতে কখনো অনুরোধ করে নি। আমি যে ঘাটে গিয়ে জল খেতাম—এটাই তারা স্বাভাবিক মনে করত। সুতরাং একদিক থেকে জাতিভেদের কঠোরতা খুবই ছিল। কিন্তু তার জন্য ঝগড়া বিবাদ বা মনোমালিন্য ছিল না। পুজোর সময় মুসলমানেরা হিন্দুর বাড়িতে মূর্তি দেখতে আসতেন, পুজো দেখতেন। বিজয়ার সময় আমাদের মুসলমান প্রজারা পুজোমণ্ডপ থেকে প্রতিমা নামিয়ে জলে বিসর্জন দিতেন। পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল, এর সঙ্গে তার বড় একটা মিল নেই। বাল্যকালে যে-সব মুসলমানের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, যাদের বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত ছিল, পাকিস্তান হওয়ার পর যে দু-চারজন হিন্দু আমাদের গ্রামে ছিল, তাদের উপর এরাও অত্যাচার করেছে শুনেছি। সেই লোকেরাই আমাদের গ্রামের বাড়ি ঘর সব জোর করে দখল করে নিয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের এমন আমূল পরিবর্তন একই জীবনে দেখতে পেলাম।

গ্রামে আর একটি বড় অসুবিধা ছিল— যাতায়াতের কষ্ট। পাকা রাস্তা তো ছিলই না, কাঁচা রাস্তারও অস্তিত্ব বিশেষ ছিল না। কলকাতা থেকে আমাদের গ্রামে যেতে হলে প্রথমে রেলপথে খুলনা এবং খুলনা থেকে স্টীমার। স্টীমারে

যেখানে নামতে হত সেখান থেকে আমাদের গ্রাম দশ-বারো মাইল দূরে। নদী থেকে গ্রাম পর্যন্ত কোনো বাঁধা সড়ক নেই, কেবল মাঠ। দুই জমির মধ্যে যে আঁকাবাঁকা আল থাকে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই পথে গোরুর গাড়ি যেতে পারত না। ছেলেবেলায় আমি গোরুর গাড়ি দেখি নি। মেয়েরা সাধারণতঃ ডুলিতে স্টেশনে যাতায়াত করত। বর্ষাকালে সমস্ত অঞ্চলটিই জলে ডুবে যেত। গ্রাম মাঠ সবই জলে ডুবে যেত। জলের মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটি বাড়ি মাথা তুলে থাকত। খুব ছেলেবেলার কথা মনে আছে, তখন বাড়ির উঠানেও বর্ষায় জল উঠত। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলেও সেই জল ভেঙে যেতে হত। কাঠের নৌকা, তালগাছের ডোঙা এবং কলাগাছের ভেলা ছাড়া এ বাড়ি ও বাড়ি যাওয়া-আসার উপায় ছিল না। কার্তিক অঘ্রান মাসে এই জল সরে গেলে নানা রকম রোগ দেখা দিত। গ্রামে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এবং দু-একজন কবিরাজ ছিলেন। চৈত্র মাসে পুকুর শুকিয়ে গেলে গ্রামে পানীয় জলের খুব কষ্ট হত। গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল, সেখানেই আমার প্রথম বিদ্যাশিক্ষা। সেখানে পড়াশোনার যা ব্যবস্থা এবং প্রণালী ছিল, তা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। গুরু নিন্দা করা উচিত নয়, তাই শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। গ্রামে একটি পোস্ট-অফিস ছিল। পোস্টমাস্টার মাইনে পেতেন মাসে পাঁচ টাকা। সকালে গ্রামের লোক পোস্ট-অফিসে এসে জড়ো হত, বিশেষ করে যেদিন হিতবাদী বা বঙ্গবাসী কাগজ আসার কথা। সারা গ্রামে ঐ একটিই কাগজ আসত। একজন পড়ত, বাকী সকলে শুনত।

ছেলেবেলার আর-একটি কথা বেশ মনে আছে। আমার এক সহপাঠী ছিল কুলীন ব্রাহ্মণ। তার বাবা পঞ্চাশ ষাটটি বিবাহ করেছিলেন, এর মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছজন স্ত্রী আমাদের গ্রামে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। তাঁদের গ্রামের নামেই তাঁদের ডাকা হত (যেমন অমুক গ্রামের বউ)। এঁর আর এক ভাইও ঐ রকম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি বিবাহ করেছিলেন।

একদিন সকাল বেলা গ্রামের ডাকঘরে যথারীতি অনেকে সমবেত হয়েছেন। একটি যুবক এসে জিজ্ঞাসা করল— শ্যামাচরণ মুখার্জির বাড়িটা কোন্ দিকে। এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমার কে হন ? যুবকটি উত্তর দিল, তিনি আমার পিতা। উক্ত শ্যামাচরণ মুখার্জিও সেখানে ছিলেন। বলা বাহুল্য, পুত্রকে তিনি কোনোদিন দেখেন নি। তিনি খুব লজ্জিত হলেন— এবং পুত্রকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

যাতায়াতের অসুবিধার জন্য গ্রামে বাইরে থেকে জিনিসপত্র আমদানী হত না। সুতরাং বিলাসিতার উপকরণ বড় একটা ছিল না। এ কারণেই অবশ্য মাছ ও তরকারী খুব সস্তা ছিল। আশি তোলায় প্রতি সের দুধের দাম ছিল দু'পয়সা। চার-পাঁচ পয়সার মাছ কিনলে একটি বড় পরিবারের কুলিয়ে যেত।

কিন্তু অন্যদিকে আলু, কাঁঠাল, ভালো আম প্রভৃতি যে-সব জিনিস গ্রামে হত না, তা পাওয়াই যেত না কিম্বা পাওয়া গেলেও দাম ছিল খুব বেশি। এর একটি ভালো ফল হয়েছিল। আমরা বারো-চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খুব সাদাসিধাভাবে দিন যাপনে অভ্যস্ত ছিলাম। পরে যখন কলকাতায় পড়তে আসি তখনও স্বভাব খুব বেশি বদলায় নি।

গ্রামের ভালো মন্দ দুদিকই আছে। কবিরা যে দৃষ্টিতে গ্রাম দেখেন বা যে কারণে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় তার সঙ্গে খুব বেশি মিল আমি দেখি নি। অথচ এই গ্রামের উপর আমাদের কী গভীর টানই না ছিল। কলকাতায় আসার পর প্রতি ছুটির দশ-বারো দিন আগে থেকে দিন গুনতাম কবে ছুটি হবে এবং বাড়ি যাব। এর প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন বেশির ভাগই গ্রামে থাকতেন। কলকাতায় বাসা করার রেওয়াজ তখন ছিল না। আর একটি কারণ গ্রামের সকলের মধ্যেই একটি মেলা-মেশার ভাব ছিল। ছোটবেলা থেকেই সকলের মধ্যে বেশ একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত। সকল জাতির মধ্যেও এমন প্রীতির ভাব ছিল। আমাদের গ্রামের কয়েকঘর ধোপা-নাপিত ছিল। তাদের বাড়ির বয়স্কা মেয়েরা আমাদের বাড়ির অল্পবয়সী বউ-ঝির উপর বেশ কর্তৃত্বই করতেন। তাঁরা আমাদের খুব আপনার জন মনে করতেন। কলকাতায় বসবাস শুরু করলে দেশের ধোপা-নাপিতরা অনেক সময় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলকাতায় এলে আমাদের বাড়িতে থাকত। এটা তারা তাদের অধিকার বলেই মনে করত। তাদের বাড়িতে রাখতে আপত্তি করার কথা আমাদেরও কখনো মনে হয়নি। যে নমঃশূদ্র চাকরের কথা পূর্বে বলেছি বৃদ্ধ বয়সে সে আমার মেজদাদার বাড়িতে এসে ওঠে। কয়েক বছর সে সেখানে ছিল। তখন সে এত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো কাজ করতে পারত না। ছেলে-বেলায় সে আমাদের মানুষ করেছে— এইজন্য আমরা ভায়েরা কেউ আপত্তি করি নি। যদিও বাড়ির বউ এবং ছেলেরা এতে বেশ অস্বস্তি বোধ করত।

শহর থেকে বহু দূরে পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামে আমার বাল্য ও কৈশোরের কিছুকাল কেটেছে। বাল্য ও কৈশোরের সে-জীবন আর কখনও ফিরে আসবে না। আমাদের পুত্র পৌত্র বা তার পরবর্তী উত্তরপুরুষরা সে জীবনের কোনো পরিচয় জানবে না ও তার আস্বাদ পাবে না। আমাদের স্মৃতির মধ্যেই আজ তা বেঁচে আছে, আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে স্মৃতিও লোপ পাবে। সুখে-দুঃখে, ভালোয়-মন্দয়, দোষে-গুণে সব মিলিয়ে বাংলার গ্রাম্য জীবনের নিজস্ব একটি অপূর্ব ও নিবিড় মাধুর্য ছিল। এর পরে ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনেকেরই এ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিছুই থাকবে না। সেজন্যেই গ্রামের কথা একটু বিস্তৃত করে লিখলাম। বাংলা দেশের ইতিহাসে এই গ্রামের ছবি হয়তো এককালে খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

ছাত্রজীবন

পাঁচ বছর বয়সে আমি গ্রামের মধ্য ইংরেজী অর্থাৎ মাইনর স্কুলে ভর্তি হই। একটি খড়ের (বাংলা দেশে 'ছন' বলে) ঘরে আমাদের ক্লাস হত। কাঠের বেঞ্চিতে আমরা বসতাম। শিক্ষকদের জন্য কাঠের চেয়ার ও ছোট টেবিল ছিল। স্কুলে চারজন শিক্ষক ছিলেন। কয়েকজন মুসলমান ছাত্রও ছিল, তবে স্কুলে কোনো মৌলবী ছিলেন না।

আমাদের গ্রামের চারপাশে কেবল মুসলমান ও নমঃশূদ্র পরিবারের বাস ছিল। ঐ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল। ক্লাসে কয়েকজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। আমাদের গ্রামের এক প্রান্তে লস্কর পাড়ার লাল মিঞা বা জলিলুর রহমান নস্করের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। লাল মিঞা তালুকদার ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি কলকাতায় আমার বাড়িতে এসে দেখা করেছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমি ক্লাসের মুসলমান বন্ধুদের বাড়ি যেতাম, তাদের বাড়িতে ফলমূল খেয়েছি। এ কথা পূর্বেই বলেছি। তারাও আমাদের বাড়িতে আসত। আমার পরিচিত মুসলমান পরিবারের মহিলারা পর্দানশীন ছিলেন।

গ্রামের স্কুলে আমি সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম ; শেষ পরীক্ষা ('মাইনর' পরীক্ষা) দিতে পারি নি। আমার বড়দাদা প্রকাশচন্দ্র মজুমদার একটি সরকারী ইংরাজী বিদ্যালয়ে পঁচাত্তর টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজ পাওয়ায় মেজদাদা সতীশচন্দ্র ও আমি পড়ার জন্য কলকাতায় চলে আসি। বড়দাদা আমার চেয়ে এগারো বছরের বড় ছিলেন। ১৯০০ সালের মাঝামাঝি আমি কলকাতায় আসি। মেজদাদা ও আমি মাতামহ প্রসন্নকুমার সেনের সঙ্গে কালীঘাটের সিকদারপাড়া রোডের (এখন মহিম হালদার স্ট্রীট) একটি খোলার ঘরে থাকতাম। তখন আমার মাতামহের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর দুখানি খোলার ঘর ছিল। বড়দাদা আমাদের খরচপত্র দিতেন। তিনি তাঁর দাদাশ্বশুর কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের বাড়িতে থাকতেন। বড়দাদা খুবই কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁর সাহায্যে ও যত্নে মেজদাদা ও আমার পড়াশোনা চলে। তিনি কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং পরে হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর একটি প্রেস ও চা বাগান ছিল। বড়দাদা বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; অবশ্য এ বিষয়ে তিনি কোনোদিন আমাদের কিছু বলেন নি। তিনি

কখনও জেলে যান নি ; তবে তিনি রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করতেন এবং পি. মিত্রের বাড়িতে ঘন ঘন যেতেন। বড়দাদার কমলা প্রেস থেকে ভূপেন দত্তদের 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রথম ছাপা হয়। পুলিশের গণ্ডগোলের ভয়ে 'যুগান্তর' কমলা প্রেস থেকে সরিয়ে অন্যত্র ছাপানো হয়। ডঃ ভূপেন দত্তের গ্রন্থে প্রকাশচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে যে-সব তথ্য রয়েছে তা থেকে বড়দাদার সঙ্গে গুপ্ত সমিতির যোগাযোগের খবর পাওয়া যায়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বড়দাদা পরলোক গমন করেন।

মেজদাদা সতীশচন্দ্র আমার চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন। বাল্যকালে এবং ছাত্রজীবনে দীর্ঘকাল আমরা দু'জনে একসঙ্গে থেকেছি ; ফলে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। বড় হয়েও এই সম্পর্ক বজায় ছিল। মেজদাদা স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলাত যান এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি. ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি ইম্পিরিয়াল সার্ভিস গ্রহণ করে প্রথমে মাদ্রাজে যান ; পরে বদলী হয়ে বাংলা দেশে আসেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। River System of Bengal সম্পর্কে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মেজদাদা পরলোক গমন করেন!

কলকাতায় প্রথমে আমি সাউথ সুবার্বান স্কুলে ফিফ্থ ক্লাসে ভর্তি হই। তখন ঐ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন বেণীমাধব গাঙ্গুলি। আমাদের ক্লাসে দুটি কি তিনটি সেকশন ছিল ; প্রতি সেকশনে প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র। শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ফোর্থ ক্লাসে উঠলাম ; এজন্য স্কুল থেকে পুরস্কার পাই। ফোর্থ ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। তারপর আমি জেনারেল অ্যাসেম্বলি স্কুলে থার্ড ক্লাসে ভর্তি হই। মন্মথ বসু তখন ঐ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। কিন্তু ওখানেও আমি বেশি দিন ছিলাম না।

ঐ স্কুলে থাকাকালীন আমার জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমার এক জেঠতুতো দাদা কটন স্কুলে কাজ করতেন। তিনি এক জমিদারপুত্রের গার্ডিয়ান টিউটর হয়ে কলকাতায় থাকার প্রস্তাব পেলেন। ঠিক হল, মেজদাদা ও আমি তাঁর সঙ্গে থাকব। এই আশায় মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেজদাদা ও আমি বাস করতে লাগলাম। কিন্তু সেই জমিদারপুত্র আর কলকাতায় পড়তে এল না। ১৫/২০ দিন ঐ বাড়িতে আমরা ছিলাম। বাড়িওয়ালা আমাদের কাছে ভাড়া চাইবে এই আশঙ্কায় আমরা দু'ভাই একদিন গভীর রাতে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকের ঘটনা। ঐ বাড়িতে থাকার সময় আমরা এক বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেলে আট কিম্বা দশ পয়সা খরচ করে ডাল-ভাত-মাছ খেতাম। ঐ বাড়ি ছাড়ার পর অবস্থা এমন হয় যে আর কলকাতায় থাকা সম্ভব হল না।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মেজদাদা ও আমি ঢাকা শহরে পড়তে যাই। সেখানে আমার মায়ের মামার বাড়িতে ছিলাম। ইনি উকিল ছিলেন। আমরা দু'ভাই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হই। তিন মাস এই আত্মীয়ের বাড়িতে থাকার পর আমরা স্কুলের হস্টেলে চলে গেলাম। হস্টেলে থাকা-খাওয়ার জন্য প্রতি মাসে খরচ ছিল সাড়ে সাত টাকা; বড়দাদা আমাদের টাকা পাঠাতেন। ঢাকার এই রাজচন্দ্র হিন্দু হস্টেলে আমরা একরকম ভালোই ছিলাম। ঢাকায় আমি থার্ড ক্লাসে পড়ি। পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য এখানেও পুরস্কার পাই। এক বছর ঢাকায় ছিলাম। ঢাকা কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক সত্যেন ভদ্র মহাশয় আমাকে কলেজে সেক্সপীয়রের একটি ইংরাজী নাটক অভিনয়ে পার্ট দেন। ভালো অভিনয় করায় তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং অভিনয়ের জন্য অনেকেই আমার প্রশংসা করেছিলেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে আমি ঢাকা থেকে হুগলী যাই এবং কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হই; সেখানে হস্টেলে থাকতাম। মেজদাদা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকাতে এনট্র্যান্স পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনিও হুগলী কলেজে ভর্তি হন। বড়দাদা সাময়িকভাবে হুগলী কলেজে ইংরাজীর অস্থায়ী অধ্যাপক হয়ে আসেন। তখন আমরা তিনভাই একবাড়িতে থাকতাম। বড়দাদা হুগলীতে এক বছর ছিলেন। তারপর তিনি হিন্দু স্কুলে বদলী হওয়ায় আমি হিন্দু স্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে ভর্তি হই। বড়দাদা আবার সেখান থেকে কটকে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হন। আমিও ঐ স্কুলে চলে যাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মেজদাদাও কটকে এই কলেজে ভর্তি হন। বাবাও অবসর গ্রহণ করে কটকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই প্রথম বিদেশে বাবার সঙ্গে থাকবার সুযোগ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কটক স্কুল থেকে আমি এনট্র্যান্স পরীক্ষা দিই। ডঃ সুশীলকুমার দে আমার সহপাঠী ছিলেন। আমরা দুজনেই বৃত্তি পাই। মেজদাও এল. এ. পাস করে একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন।

বড়দাদা চাকুরি ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। আমি এফ. এ. পড়তে বরিশাল গেলাম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে আমি ব্রজমোহন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই। রজনীকান্ত গুহ ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। তখন মহাপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালের বিখ্যাত নেতা। তিনি তাঁর বাবার নামে ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রতি সপ্তাহে কলেজে ধর্ম ও নীতিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের উপদেশ দিতেন। সবাই অশ্বিনীবাবুকে দেবতা জ্ঞান করতেন। বিখ্যাত বিপ্লবী সতীশ চট্টোপাধ্যায় তখন ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের সবাইকে দেখবার ও এঁদের বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি কলেজ বোর্ডিং-এ একটি খড়ের ঘরে থাকতাম। একদিন ঝড়ে তার চাল উড়ে যায়। অশ্বিনীবাবুর নির্দেশে কলেজের ছাত্রদের নিয়ে একটি সেবাদল গঠন করা হয়েছিল। দুঃস্থ ও রুগ্নদের সেবা করাই ছিল এর কাজ।

আমিও একবার একজন কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করেছিলাম। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নানাভাবে সমাজসেবার মনোভাব জাগ্রত করা হত। আবাসিক বিদ্যালয়ের আদর্শে কলেজটি পরিচালিত হত। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে সে সময় প্রায় ছশো ছাত্র ছিল। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের পিতা ক্ষেত্রমোহন ঘোষ আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। বরিশালে বেশিদিন কিন্তু আমি থাকতে পারি নি। ওখানে আমি প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগতাম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় এসে আমি রিপন কলেজে ভর্তি হই।

শারীরিক কারণ ছাড়া অবশ্য আরো দুটি কারণে আমি রিপন কলেজে পড়বার সিদ্ধান্ত নিই। প্রথমতঃ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পড়বার আগ্রহ এবং দ্বিতীয়তঃ, রিপন কলেজে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ। আমার জ্ঞাতি-ভাই অম্বিকাচরণ মজুমদার, যিনি পরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাকে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একটি চিঠি লেখেন। তার ফলে রিপন কলেজে ঐ সুবিধা পাই। তখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত, রামসর্বস্ব পণ্ডিত, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালগোপাল মুখার্জি, প্রফুল্ল ঘোষ ও হারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি রিপন কলেজে এফ. এ. ক্লাসে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে আমি এফ. এ. পাস করি। সেবার মাত্র বাহান্ন জন প্রথম বিভাগে পাস করেছিল। পরিচিতরা সকলেই তখন আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়তে উপদেশ দিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাসে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম। এই সময় থেকে মাত্র একটি বিষয় অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পূর্বে এক দুই বা তিনটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া চলত।

প্রেসিডেন্সি কলেজ অধ্যাপক পার্সিভাল আমাদের ইতিহাস ও সেক্সপীয়র পড়াতেন। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও অধ্যাপক জে. এন. দাশগুপ্তের কাছে আমি ইতিহাস পড়েছি। অধ্যাপক দাশগুপ্ত ইংলন্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস পড়াতেন। বি. এ. পরীক্ষায় আমরা তিনজন ঐ কলেজ থেকে অনার্স পেয়েছিলাম। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই ; কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ (মাসে ৩২ টাকা) পেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই আমি এম. এ. পড়তাম। অধ্যাপক ওটেন, অধ্যাপক ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অধ্যাপক জে. এন. দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী আমাদের ইতিহাস ক্লাস নিতেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত অশোকের শিলালিপি সম্বন্ধে পড়াতেন ; তিনি অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। নীলমণিবাবু সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার ঐচ্ছিক বিষয় (optional group) 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' পড়াতেন। তিনি প্রাচীন

ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু জানতেন। নীলমণিবাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর অধীনে তিন বছর গবেষণা করেছিলেন। আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমি এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। প্রথম হয়েছিলেন শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়। পাস করার পর সুবোধ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হয়েছিলেন। আমি এম. এ. পাস করে আইন পড়ি। আইনে ফার্স্ট পার্ট পাস করে কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল গুণদাচরণ সেনের আর্টিকল্ড ক্লার্কও ছিলাম।

অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তীর পরামর্শে আমি গবেষণা শুরু করি। গবেষণার কাজে সুবিধা হবে মনে করে নীলমণিবাবু আমাকে পটলডাঙা স্ট্রীটে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে নিয়ে যান। গবেষণা করতে চাই শুনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে ধমক দিয়ে বললেন— গবেষণা করে কিছু হবে না, চাকরি করো গিয়ে। আশুবাবুর আমলে কোনো গবেষণা হবে না, ইত্যাদি। বুঝলাম শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপর খুব ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। তখনও তিনি আমাদের আসন গ্রহণ করতে বলেন নি। তারপর নীলমণিবাবু আস্তে আস্তে বললেন— এই ছেলেটি খুব ভালো ; ওকে দেখিয়ে দিন, দেখবেন ও গবেষণায় সাফল্য লাভ করবে। তখন তিনি আমাদের বসতে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— সত্যি সত্যি পড়াশোনা করবে তো ? ঐ রাখাল এখন মস্তবড় হয়ে গেছে, আর দেখাই করে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে গবেষণা করতেন। তিনি রাখালবাবুকে খুব স্নেহ করতেন। এই-সব কথা বলার পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে কতকগুলি বই পড়তে বললেন এবং পরে আবার দেখা করতে বললেন।

একদিকে গবেষণার জন্য পরিশ্রম করছি, আবার চাকরিরও খোঁজ করছি। কারণ চাকরি. না করলে আমার চলবে না। এমন সময় ঢাকা কলেজে একটি পদ (প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস) খালি হল। আমি আবেদন করলাম ; কিন্তু কাজটি আমার হল না। আমার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাস করেছিল এমন এক সহপাঠী ঐ পদে মনোনীত হলেন। কারণ তাঁর দাদামহাশয় রায়বাহাদুর ও রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির (পি. আর. এস.) জন্য থিসিস দাখিল করি। একেবারে শেষ তারিখে থিসিস জমা দিতে গিয়ে দেখি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী পি. আর. এস.-এর জন্য থিসিস জমা দিতে এসেছেন। আমি রাখালবাবুকে বললাম— আপনি এবার থিসিস দিচ্ছেন জানলে আমি দিতাম না ; কারণ আপনি যখন থিসিস দাখিল করছেন তখন আমার আর পি. আর. এস. পাওয়ার সম্ভাবমা নেই। কিন্তু ফল বের হলে দেখলাম আমিই পি. আর. এস. পেয়েছি। আমার থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন ডঃ জি. থিবো।

আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'অন্ধ্র কুষাণ আমল' (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ পর্যন্ত)। বিক্রম সম্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি নূতন মত ব্যক্ত করি। ডঃ থিবো আমার থিসিসের খুবই প্রশংসা করেন। পি. আর. এস. হওয়ায় আমি চার হাজার, কি সাড়ে চার হাজার টাকা পেয়েছিলাম। গবেষণার বার্ষিক রিপোর্টের ভিত্তিতে তিন বছরে এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাই। প্রতি বছর আমার গবেষণার রিপোর্ট আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে দিতে হত। এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এবং গবেষণা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁর সঙ্গে আলোচনা হত। প্রথমবার তিনি আমার গবেষণা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি রিপোর্ট পাঠান যার মর্ম সিণ্ডিকেট ঠিক. বুঝতে পারেনি। ফলে আমার বৃত্তির টাকা বন্ধ হয়ে যায় এবং ভয়ানক অসুবিধায় পড়ি। রেজিস্ট্রার জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রিপোর্টের কথা আমাকে বললেন। ডঃ শীলের সঙ্গে দেখা করে আমার অসুবিধার কথা বলতেই তিনি আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য জোর সুপারিশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চিঠি দিলেন। সব কথা শুনে তিনি মন্তব্য করেন—এই তো সিণ্ডিকেটের সদস্যরা, যারা একটি ইংরাজী রিপোর্টও বুঝতে পারেন না।

আমি পি. আর. এস. পাওয়ার পর আমার বাবার খুব ইচ্ছা হল যে, আমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হই। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই পদের জন্য দুটি নাম মনোনীত করে সরকারের কাছে পাঠান হত, তার মধ্য থেকে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচিত হত। আমার নাম পাঠানোর জন্য বাবা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। স্যার আশুতোষ বাবাকে বললেন, আপনার পুত্রকে গবেষণা করতে দিলেই সব দিক থেকে ভাল হত। শেষ পর্যন্ত বাবার অনুরোধে স্যার আশুতোষ আমাকে মনোনীত করলেন এবং আমার নামই প্রথমে দিলেন। যথারীতি দার্জিলিংএ ইণ্টারভিউ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে নির্দেশ এল। আমিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি এবং আমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরিও হয়নি। কেন যাওয়া হল না—সে-কথাই এখন বলব।

বি.এ.পরীক্ষা দেওয়ার পাঁচ ছ' মাস পূর্বে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমার বিবাহ হয়। আমার শ্বশুর দীনবন্ধু সেন বরিশালের একজন বড় উকিল ছিলেন। তাঁর জমিদারিও ছিল। তাঁর আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলায়। তাঁর চার ছেলে ও চার মেয়ে। তাঁর ছোট মেয়েকে আমি বিবাহ করি। দার্জিলিং-এ ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়ার কয়েক দিন পূর্বে পূজার সময় আমার স্ত্রী ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তখন কলকাতায় চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে থাকি। বাড়িতে আমি ও আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই অবস্থায় স্ত্রীকে একলা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। সব খবর দিয়ে দার্জিলিংএ জরুরী টেলিগ্রাম করলাম। আমার যাওয়া সম্ভব হল না, সরকার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মনোনীত

করলেন। এই ঘটনায় আমার পরিবারের সকলেই খুব বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু এই ঘটনায় আমার জীবনের মোড় সম্পূর্ণ বদলে গেল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি হল না বলেই ঐতিহাসিক গবেষণার পথই আমি গ্রহণ করলাম। এই দৈব দুর্ঘটনা যে আমার জীবনে সৌভাগ্যেরই কারণ হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। জীবনে একাধিকবার যে ঘটনাকে দুর্ভাগ্য মনে করে সাময়িক কষ্ট হয়েছে—পরিণামে তা সৌভাগ্যের সূচনা বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছি। জীবনে বারে বারেই মনে হয়েছে যে কোন দৈবশক্তি যেন আমার জীবনের পথ নির্দেশ করে চলেছে, তার উপর আমার কোন হাত নেই।

সাহিত্য চর্চা

আমি যখন হিন্দু হোস্টেলে থেকে বি. এ. পড়ি তখনই এক হিসেবে আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। অবশ্য এ সাহিত্য নিতান্ত ছেলেখেলার সাহিত্যই ; তবুও তা একেবারে স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। এ বয়সে যেমন হয়ে থাকে, দু'চারটি কবিতা লিখতাম। হিন্দু হোস্টেলের অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় এবং তার জন্য একটি পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম এবং অপ্রত্যাশিত-ভাবে পুরস্কারটি আমিই পেয়েছিলাম। কি জন্য পরীক্ষকেরা পুরস্কার দিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগী ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন করেছিল। কেউ কেউ বলেছিল যে, একজন পরীক্ষক ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং সেজন্যেই আমার প্রতি পক্ষপাত করে আমাকে পুরস্কারটি দিয়েছিলেন। এ নিয়ে অবশ্য কোন গোলমাল হয়নি। আমার দেড় বছর বয়সের সময় আমার মা মারা যান। এই কবিতাটিতে মাতৃহারা সন্তানের মনের ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলাম। কবিতাটির নামও ছিল 'মাতৃহারা'। এটি বহুকাল লোপ পেয়েছে এবং তাতে বঙ্গসাহিত্যের কোন ক্ষতি হয়নি।

কথায় বলে লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু। আমারও হল সেই অবস্থা। এই সময় 'কুন্তলীন' প্রভৃতি সুগন্ধি তেলের আবিষ্কর্তা একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে পাঁচ টাকা থেকে আরম্ভ করে কুড়ি-পঁচিশ টাকা পর্যন্ত কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই প্রতিযোগিতার একমাত্র শর্ত ছিল যে, গল্পের মধ্যে সুকৌশলে কুন্তলীনের গুণের ব্যাখ্যা থাকবে অথচ গল্পের রসভঙ্গ হবে না। কবিতায় পুরস্কার পাওয়ার পর আমার লোভ হল। কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য আমি একটি গল্প লিখে পাঠালাম। পুরস্কার পেলাম না, কিন্তু এর ফল একরকম ভালই হল। জীবনে আর কখনও কবিতা বা ছোট গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।

আর একটি শিল্পকলায় এই সময়ে আমার হাতে-খড়ি হয়। হিন্দু হোস্টেলে প্রতি বছর নাটক হত, তাতে আমিও দু'একবার অভিনয় করেছি। এর পরে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কয়েকবার অভিনয় করি। এখন বললে হয়তো অনেকেই হাসবেন যে, আমি যখন ইনস্টিটিউটে এই অভিনয় করি তখন বাংলাদেশের দুজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা—শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং নরেশচন্দ্র

মিত্র—এই দু'জনের অভিনয়ও ঐখানেই আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে ঐ দুই জনের সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব হয় সারা জীবনে তা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরবর্তী জীবনে শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন অভিনয়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তখন আমি ছুটিতে ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে তার নাটক দেখতে যাই। শিশির অভিনয় করবার সময় স্টেজ থেকে আমাকে দেখতে পায় এবং একটু পরেই সাজঘরে আমাকে ডেকে পাঠায়। তাকে না জানিয়ে টিকিট কিনে নাটক দেখতে এসেছি, এজন্য সে আমাকে খুব ভৎসনা করতে থাকে। এর পরে যখনই কলকাতায় এসেছি, তার প্রত্যেক অভিনয় দেখার জন্য শিশির আমাকে ও আমার স্ত্রীকে কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে। শিশির কিছুদিন সিনেমাও করেছিল। আমি তখন এম. এ. পাশ করে বেকার বসে আছি। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা কি ছবি ওরা তোলবার চেষ্টা করছিল। পাত্র-পাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ যুগোপযোগী হয় কিনা তা দেখবার জন্য বেশ মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করল। আমিও একরকম রাজী হলাম। কিন্তু আমার বড়দাদা খুবই আপত্তি করায় আমার আর সে-কাজে যোগ দেওয়া হল না। আমি ঢাকায় থাকতে শিশির একবার দলবল নিয়ে ঢাকায় অভিনয় করতে গিয়েছিল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের থাকবার জন্য একটি বাড়ি ঠিক করা হয়েছিল। আমি শিশিরকে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করবার জন্য সেখানে গেলাম। আমাকে ঢুকতে দেখেই শিশির চীৎকার করে অভিনেত্রীগণকে বলতে লাগল—'তোরা সব সরে যা সরে যা।' অভিনেত্রীদল সাধারণ ভাবে কাপড়-চোপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকল। আমি শিশিরকে নিমন্ত্রণ করে ফিরে এলাম। আমার বাড়িতে সেদিন ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সরকারী কাজে ঐ অঞ্চলে ট্যুর করতে এলে আমার বাড়িতেই থাকতেন। তিনি বললেন শিশিরের জন্য ভোজনের পূর্বে একটু মদ্যপানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি প্রমাদ গণলাম। বললাম, আমার গৃহিণী টের পেলে সর্বনাশ হবে—তিনি এই সখ একেবারে দেখতে পারেন না। রাখালবাবু অভয় দিলেন যে বৈঠকখানায় বসে খাওয়া যাবে, গৃহিণী যাতে টের না পান সে ব্যবস্থা তিনি করবেন। অগত্যা আমাকে রাজী হতে হল। রাত্রে বৈঠকখানায় বসে দুই জনে দুই গ্লাসে মদ খাচ্ছেন—হঠাৎ গৃহিণী ঘরের দরজায় এসে খবর দিলেন যে খাবার সময় হয়েছে। দূর থেকে গৃহিণীকে আসতে দেখেই রাখালবাবু যেরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গ্লাস দুটি একটি আলমারির পেছনে লুকিয়ে রাখলেন—দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু শিশিরের একটু নেশা হয়েছিল; খেতে বসে থিয়েটার-প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্যে শিশির হঠাৎ আমার স্ত্রীকে বলে উঠল—আপনাদের মত গেরস্থ ঘরের মেয়েরা রঙ্গমঞ্চে না নামলে অভিনয় ভাল হতে পারে না। আমার স্ত্রী একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন দেখে রাখালবাবু তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লেন।

শিশিরের নাটক ৩।৪ রাত্রি হয়েছিল। অনেক লোক টিকিট কিনে যেত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিশিরকে কার্জন হলে এক সভায় সম্বর্ধনা করল। পরে তাকে কবিতা আবৃত্তি করতে চারিদিক থেকে অনুরোধ আসতে লাগল। শিশির বাংলা ও ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করল। সকলেই শুনে মুগ্ধ হল। শিশির আজ আর বেঁচে নেই। তার মৃত্যুর পরে নরেশ মিত্র বহুদিন বেঁচে ছিল। দুজনে একত্র হলে সেইসব দিনের কথা মাঝে মাঝে আমরা স্মরণ করতাম। ইনস্টিটিউটে অনেক অভিনয়ের স্মৃতি আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু কবিতা ও ছোটগল্প লেখার ন্যায় আমার অভিনয়ও ছাত্রজীবনের সঙ্গেই শেষ হয়।

এই সময়ে আমার জীবনে আর একভাবে সাহিত্যচর্চার যে সূত্রপাত হয় উত্তরকালে তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। আমি যে কোনদিন লেখক হব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনজন লোকের প্রভাবে আমার মনে সাহিত্যচর্চার আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং ফলে লিখবার শক্তিও কিছু অর্জন করি। এর পূর্বে স্কুলে বা কলেজে কোন প্রবন্ধ লিখতে হলে খুব সংকোচ বোধ করতাম, কিছুতেই লিখতে সাহস হত না। যখন এফ. এ. ক্লাশে পড়ি তখন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কুলদাপ্রসাদ মল্লিক নামে একজনের সঙ্গে আমার খুব সৌহার্দ হয়। কুলদা বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ ছয় বছর বা তারও বেশি বড় ছিল, কিন্তু আমরা দু'জনেই এফ. এ. অর্থাৎ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কলকাতায় আমরা বিভিন্ন কলেজে পড়তাম। ইনস্টিটিউটেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে এনট্রান্স পাশ করে অনেক দিন কলেজে ভর্তি হয়নি। সে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে চর্চা করত, ভাল বক্তৃতা দিতে পারত। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তার বেশ ভাল পড়াশোনা ছিল এবং আমার চেয়ে এ বিষয়ে তার অনেক বেশি জ্ঞান ছিল।

কুলদা যখন এফ. এ. পড়তে এল এবং তার সঙ্গে আমার আলাপ হল তখন বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সম্বন্ধে সে অনেক কথা বলত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের কাছে এক রকম দুর্বোধ্যই ছিল। কুলদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে আমাদের বুঝিয়ে দিত। ক্রমে ক্রমে পাঁচ ছ'জন মিলে একটা দল তৈরি হল। কুলদা এই দলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যাখ্যা করে শোনাত। দু' একবার নৌকা করে আমরা শিবপুরের বাগানে বেড়াতে গেছি। যাতায়াতের সময় নৌকায় এবং বাগানে বসে কুলদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করত। তার আবৃত্তি এবং কবিতার বিশ্লেষণ আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাধুর্য আস্বাদ করে জীবনে অনেক আনন্দ পেয়েছি—এর জন্য কুলদাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারি না।

চার বছর পরে, আমি সবে এম. এ. পাশ করেছি, এমন সময় একদিন কুলদা এসে বলল যে, সে 'বীরভূমি' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করছে বা করবে

এবং তাতে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতেই হবে। আমি বললাম যে জীবনে কোনদিন বাংলায় প্রবন্ধ লিখিনি এবং লেখার ক্ষমতাও আমার নেই। সুতরাং নিতান্ত বন্ধু হলেও তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু কুলদাও নাছোড়বান্দা; নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে লিখতে হল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রুপ নিয়ে সদ্য এম. এ. পাশ করেছি। অনেক ভেবেচিন্তে অশোক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে ভয়ে ভয়ে এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। প্রবন্ধটি ছাপা হল। ছাপার অক্ষরে এইটিই আমার প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এর কিছুদিন পরে একদিন কুলদা এসে উপস্থিত, তার হাতে একটি মাসিক পত্র। দেখলাম সেটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য'। এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল অন্য সব কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা। সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের বিশেষ দুর্নাম ছিল যে, তিনি সহজে কাউকে রেহাই দিতেন না। কুলদা পত্রিকাটির একটি পৃষ্ঠা খুলে আমাকে দেখাল— সেখানে 'বীরভূমি'র সমালোচনা আছে। তার মধ্যে আমার প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য ছিল যে, এটি সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। কুলদা বলল যে, তুমি তো লেখা দিতে চাওনি, অথচ সমাজপতির মতো সম্পাদকও তোমার লেখার প্রশংসা করেছেন। অতএব এখন থেকে তোমায় লিখতে হবে। এইভাবে 'বীরভূমি' নামে অধুনাবিস্মৃত মাসিক পত্রে আমার লেখা শুরু হয়। কয়েকটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লিখেছিলাম।

এই সময়ে আমার আর এক সহপাঠী ও বন্ধু গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'দেবালয়' নামে একটি মাসিক পত্র বার করে। তার অনুরোধে পূর্বের ন্যায় বহু আপত্তিসত্ত্বেও আমাকে অনেকগুলি প্রবন্ধ এই পত্রিকার জন্য লিখতে হয়। প্রবন্ধ ছাড়াও এই 'দেবালয়'কে উপলক্ষ করে আমাকে আর এক ধরনের লেখা অভ্যাস করতে হয়, যা সারা জীবনই আমার সঙ্গী হয়ে আছে। 'দেবালয়' নামটি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমানে বিধান সরণী) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশ দিয়ে ঠিক উত্তর দিকে একটি ছোট গলি আছে। সেই গলির একটি ছোট বাড়িতে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান এবং গোঁড়া ব্রাহ্ম। সপ্তাহে দু'একদিন সেখানে ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা হত। গিরিজা সেখানে নিয়মিত যেত এবং সেই সূত্রেই সে তার পত্রিকার নামকরণ করেছিল 'দেবালয়'। গিরিজার ঘন ঘন সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্য একটি কথা বেশ রটেছিল যে, তার নাকি শশীবাবুর মেয়েকে বিবাহ করার খুব ইচ্ছা ছিল। একথা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি না। তবে ঐ পরিবারের সঙ্গে গিরিজার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং আমাকেও সে মাঝে মাঝে সেখানে নিয়ে যেত। একদিন আলোচনাপ্রসঙ্গে শশীবাবু রামায়ণের খুব নিন্দা করে বলেন যে, রাম 'ঘোড়ার ডিম' এবং সীতা 'ঘোড়ার ডিম'। এই

কথা শুনে আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সভা ছেড়ে চলে আসি। হিন্দু হোস্টেলে এসে বন্ধুদের একথা বললাম। বলা বাহুল্য, সে বয়সে যা হয়ে থাকে, আমরা সকলেই বেশ উত্তেজিত হয়ে এ সম্বন্ধে কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করলাম। ফলে এর দু' একদিনের মধ্যেই খবরের কাগজে ('বেঙ্গলী' কি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ঠিক মনে পড়ছে না) তীব্র প্রতিবাদ করে আমি ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখি। চিঠিটি ছাপা হলে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আরও অনেক চিঠি বের হতে থাকে। অনেকের কাছ থেকে আমিও চিঠি পেতে থাকি। একটি চিঠির কথা আমার মনে আছে। তাতে একজন লিখেছিলেন, 'মহাত্মন্! আপনি হিন্দুধর্মের রক্ষক।' এই শুনে বন্ধুরা আমাকে উপাধি ছিল—Defender of the Faith. আমি বোধ হয় পাঁচ সাতটি চিঠি উত্তরস্বরূপ লিখেছিলাম। এরপর পুজোর ছুটিতে গ্রামে চলে যাই। গ্রামে সেই ইংরেজী কাগজ যেত না। সুতরাং বেশ কিছুদিন আমার আর লেখার সুযোগ বা প্রয়োজন হয়নি। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে এসে দেখলাম যে, চিঠির উত্তর ও প্রত্যুত্তর পূর্বের মতই চলেছে। আমার অনুপস্থিতিতে আমার বন্ধুরাই আমার নাম দিয়ে চিঠি লিখে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদের চিঠিপত্র বেশ কিছুদিন চালিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে বহুবার এই রকম বাদানুবাদে যখন নামতে হয়েছে, তখনই 'ঘোড়ার ডিম' প্রসঙ্গে এই তর্কাতর্কির কথা আমার মনে পড়েছে।

গিরিজাশঙ্কর পরবর্তী কালে সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। কিন্তু এই বাদানুবাদের ফলে শশীবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব ভেঙ্গে যায়। সেখানে সে আর যেতও না। এটা আমার খুব দুঃখের কারণ হয়েছিল। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও গিরিজাকে এ বিষয়ে রাজী করাতে পারিনি। গিরিজাশঙ্কর আমার আজীবন বন্ধু ছিল। কয়েক বছর পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে। এক কালে সে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল এবং চিত্তরঞ্জনের বাংলা অভিভাষণের অনেকগুলিতেই গিরিজার লেখা আছে—এরূপ শুনেছি। স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে তার একটি বই আছে। তাছাড়া চৈতন্যদেব সম্পর্কে তার একটি বই বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

কুলদা এবং গিরিজা ছাড়া তৃতীয় আর একজন আমার সাহিত্যচর্চার পথ-প্রদর্শক। আমি এম. এ. পাশ করার দু'বছর পরে ঢাকায় ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপকের চাকুরি পাই। সে-সময় অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ঢাকা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। তাঁর বাড়ি ছিল আমাদের গ্রামের কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। কিছুদিন আমরা ঢাকায় এক বাড়িতে এক সঙ্গে 'মেসে'র মতো করেছিলাম। সে সময়ে ঢাকায় বেশ সাহিত্যচর্চা হত। এ বিষয়ে দু'টি বেশ বড় দল ছিল। এক দলের নায়ক ছিলেন ঢাকা কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র। তাঁর নিজের একটি ছাপাখানা ছিল এবং তিনি একটি কাগজ বার করতেন। অন্য দলের নেতা ছিলেন অবিনাশচন্দ্র

মজুমদার। তিনি 'প্রতিভা' নামে একটি মাসিক পত্র বার করতেন। ঢাকায় একটি সাহিত্য পরিষদ ছিল, তিনি তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অবিনাশ মজুমদার আমাকে তাঁর দলে টেনে নিলেন এবং 'প্রতিভা'তে' লেখার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। এই পত্রিকাতেও আমি অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখি। এর মধ্যে একটিতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাসে'র (প্রথম ভাগ) বিস্তৃত সমালোচনা করেছিলাম। 'প্রতিভা'র তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাখালবাবু তখন উদীয়মান ঐতিহাসিক এবং পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ প্রাচীন লিপির পাঠ উদ্ধার করতে তাঁর সমকক্ষ তখন এদেশে আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে ইতিহাস পাঠ করেননি। এবং তিনি ছিলেন খুব আরামপ্রিয়। ধনীর সন্তান এবং ধনীর দৌহিত্র—বহু অর্থ তাঁর হাতে এসেছিল। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে তিনি বলে যেতেন, একজন তা লিখে নিত। এইভাবে তাঁর বই লেখা হত। এইসব কারণে তাঁর বই-এ বহু ভুল ছিল। আমার এই প্রবন্ধে তাঁর বই-এর অনেকগুলি ভুলের উল্লেখ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। ভয় হয়েছিল বোধ হয় তিনি এই সমালোচনা পড়ে আমার উপর খুবই রুষ্ট হবেন, কিন্তু কার্যত তা হয়নি। এক ছুটিতে আমি ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছি, হঠাৎ একদিন রাখালবাবু আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। আমি সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালাম। তিনি বললেন যে আমি যে ভুলগুলি দেখিয়েছি তা সবই তিনি মেনে নিচ্ছেন। তখন তাঁর একটি বই লেখা শেষ হয়েছে ; সেটি ছাপা হওয়ার পূর্বে একবার দেখে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। তাঁর সে অনুরোধ আমি রেখেছিলাম। ফলে তাঁর সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব হয় তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা পরে বলতে হবে। এই পরিচয়ের কথা জানা থাকলে পরের কথাগুলি সহজে বুঝতে পারা যাবে।

অবিনাশ মজুমদার আর এক বিষয়ে আমাকে সাহিত্যচর্চায় সাহায্য করেন। সেই সময় পাবনায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। আমি এসব সম্মিলনের কোন খোঁজ খবর রাখতাম না। অবিনাশবাবু জোর করে আমাকে পাবনার সাহিত্য সম্মিলনে নিয়ে গেলেন, পথে স্টিমারে বঙ্গসাহিত্যের অনেক রথী মহারথীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সম্মিলনেও অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। এই সম্মিলনে ইতিহাস শাখার আলোচনা সভায় আমি যোগ দিয়েছিলাম। এরপর অনেকবার বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে যোগ দিয়েছি এবং প্রবন্ধ পাঠ করেছি। এ বিষয়ে অবিনাশবাবুই আমার পথপ্রদর্শক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে যোগ দেওয়ার পূর্বেই এইভাবে কুলদা, গিরিজা এবং অবিনাশবাবুর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার সামান্য যোগাযোগ শুরু হয়। পরবর্তী কালে এই সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছিল। তারই সূত্রপাতের কথা এখানে বললাম।

অধ্যাপনা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা ট্রেনিং কলেজে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে একটি শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় সরকার আমাকে ঐ কাজে নিয়োগ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আমি এই কাজে যোগ দিই। এখানে বয়স্ক শিক্ষকরাও পড়তেন। আমার দু'জন ভূতপূর্ব শিক্ষকও আমার ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত আমি সেখানে কাজ করি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দিয়ে আমার সহপাঠী সুবোধ মুখোপাধ্যায় ভারত সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের অফিসার নিযুক্ত হওয়ায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকুরি ছেড়ে দেন। সুবোধ স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমার খবর জিজ্ঞাসা করেন ও সুবোধকে বলেন—'তুমি রমেশকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দাও যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।' সুবোধ আমাকে টেলিগ্রাম করে; আমি কলকাতায় এসে স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন—'ডঃ থিবো (যিনি আমার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য লেখা মৌলিক গবেষণামূলক রচনার পরীক্ষক ছিলেন) তোমার খুব প্রশংসা করেছেন। আমি স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা ও গবেষণা দুই-ই নূতন করে ভালোভাবে গড়ে তুলতে চাই। তোমাকে ঢাকার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে হবে। এখন কিছু অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা থাকলেও ভবিষ্যতে তোমার ভালোই হবে।' সরকারী চাকুরি ছেড়ে দেওয়াতে আমার বাবার খুব অমত ছিল। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে আমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে লেকচারার হিসাবে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে আমি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়াতাম। এইভাবে আমার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলাম। এই সাত বৎসর আমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রধান ভিত্তি বলা চলে। ভবিষ্যৎ জীবনে আমি যা কিছু করেছি বা হয়েছি তার মূল খুঁজলে এই সাত বৎসরের জীবনেই পাওয়া যাবে।

এখন যাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অবস্থা

জানেন তাঁদের পক্ষে সেই সময়কার অবস্থা কল্পনা করাও কষ্টকর। তখন বেশির ভাগ অধ্যাপকই বাইরে অন্য কলেজে চাকুরি করতেন; সপ্তাহে দু'তিন ঘণ্টা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ক্লাস নিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ইতিহাস বিভাগে ছিলাম আমরা মাত্র দু'জন—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী ও আমি। এ ছাড়া হুগলী কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যপক জে. এন. দাসগুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্তের পুত্র অজয় দত্ত (ব্যারিস্টার), এম. এন. বসু (ব্যারিস্টার) এবং আরো দু-একজন সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করে কোনো-একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াতেন। ছাত্রসংখ্যাও ছিল তখন খুব কম। দ্বারভাঙ্গা ভবনের ফটক পার হয়েই ছোট সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথম বাঁ দিকের যে ছোট ঘর সেইটিই ছিল একাধারে অফিস ও শিক্ষকদের বসবার জায়গা। মাত্র একজন বয়স্ক কেরানী ছিলেন। তিনি আমাদের মতো অল্পবয়সী শিক্ষকদের বড় একটা আমলই দিতেন না। ক্লাসে যাওয়ার আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রেজিস্টার কোথায়?' তিনি টেবিলে পা তুলে চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছিলেন, বললেন, 'ওহে ছোকরা, ঐ আলমারী দেখো, ওখানেই আছে, খুঁজে নাও।' এই তো অফিসের অবস্থা। যে-সব প্রবীণ অধ্যাপকেরা এতদিন পড়াচ্ছিলেন তাঁরা আমাদের মতো ছেলেমানুষকে সহযোগীরূপে গ্রহণ করতে খুবই নারাজ। তাঁরা আমার সম্বন্ধে নানারকম মিথ্যা প্রচার করতেন। আমি তখন ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে থাকি; প্রতিদিন সকালবেলায় ময়দানে বেড়াতে যেতাম। স্যার আশুতোষেরও প্রতিদিন ময়দানে বেড়নোর অভ্যাস ছিল। দু-চারজন সঙ্গীসহ তিনি ঘোড়ার গাড়িতে এসে বির্জিতলার মোড়ে সেণ্ট পল্‌স্‌ গীর্জার কাছে নামতেন; তারপর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে যে পুকুর আছে সেই পর্যন্ত হেঁটে যেতেন। পথে আরো কয়েকজন সঙ্গী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন। বেড়ানোর দলটি এভাবে বেশ ভারী হত। একদিন আমি যখন সকালে বেড়াতে গেছি, স্যার আশুতোষের দলটিও তখন হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁদের দেখে নমস্কার করে আমি রাস্তার একপাশে একটু সরে দাঁড়ালাম। ওঁরা কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই স্যার আশুতোষ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে বলে তিনি নিরালায় আমাকে বললেন, 'তোমার চাকুরি হওয়াতে বুড়োরা খুব চটেছে। আমার কাছে নালিশ করেছে যে, তুমি নাকি সময়মতো ক্লাসে যাও না, পড়াতে পারো না, ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই মিথ্যা কথা। কারণ আমাকে তোমাদের সব খবর দেবার অন্য লোকও আছে। তবু মিথ্যা হলেও তোমাকে বললাম এইজন্য যে, খুব সাবধানে এদের সঙ্গে চলবে।' এইটুকু বলেই আমার কিছু বলবার পূর্বেই হন্‌ হন্‌ করে তিনি এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এই সামান্য ক'টি কথায় আমার প্রতি তাঁর মনোভাবের যে পরিচয় পেলাম, তাতে সত্য সত্যই খুব অভিভূত হয়েছিলাম এবং সেজন্যই আজও তা আমার মনে আছে। এরপর অবশ্য এরকম

পরিচয় আরো অনেক পেয়েছি ; কিন্তু চাকুরিতে যোগ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই এই ব্যাপারটি ঘটে। তাতে সত্যিই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।

গবেষণার সূত্রপাত

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে প্রথমে আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ইতিহাস পড়াতাম। দু-এক বছর পরেই স্যার আশুতোষ আমাকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করতে বললেন—যাতে আস্তে আস্তে অভিজ্ঞ হয়ে ঐ বিষয়েরই ক্লাস নিতে পারি। ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের অধ্যাপনা যাতে ভালোভাবে হয়, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। সে সময়ে এ বিষয়ে পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এর কয়েক বছর পরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চাকুরি নিয়ে পাটনায় চলে গেলেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ভূগোল বিষয়ে পড়াতেন। স্যার আশুতোষ আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি এই সামনের গ্রীষ্মের ছুটিতে এই বিষয়টি পড়ে রাখবে, যাতে পরের সেসনেই তা পড়াতে পারো। তিন-চার বছরের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটি বইও তোমাকে লিখতে হবে।' যাতে এই নূতন বিষয়ে পড়াশোনায় বেশি সময় দিতে পারি সেজন্য তিনি আমার আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ক্লাস কমিয়ে দিলেন। এই বই লেখার জন্য দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে অনেক নোট লিখেছিলাম। সেগুলি বহুকাল আমার কাছে ছিল ; কিন্তু আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা আসায় সে বই লেখা হয়ে ওঠে নি।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি এই সময়ে এদেশে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেছিলেন। একদিন স্যার আশুতোষ আমাকে ডেকে বলেন যে, অধ্যাপক লেভি বলেছেন যে একজন ভালো ছাত্র বা অধ্যাপককে চীনা ভাষা শেখাতে হবে, কারণ ঐ ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ আছে। তিব্বতী ভাষাও ঠিক ঐ কারণেই শেখা দরকার। সেজন্য তিনি দুজন তিব্বতী লামা নিযুক্ত করবেন। তাঁরা দার্জিলিং-এ থাকবেন এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তি দার্জিলিং গিয়ে তাঁদের কাছে পড়াশোনা করবে। আমাকে বললেন, 'তোমাকে চীন দেশে পাঠাব। যে মাইনে এখন পাও, তা পাবে। দুবছর সেখানে থাকবে, চীনা ভাষা শিখে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপকরণ যা পাও তা সংগ্রহ করবে।' আমার কাছে এ এক অভাবনীয় সুযোগ। আনন্দের সঙ্গে আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু পরে আমার বাবা এবং দাদারা ভয়ানক আপত্তি করায় আমার আর চীনে যাওয়া হয়ে উঠল না। কিন্তু স্যার আশুতোষ নিজের সংকল্প ত্যাগ করেন নি। আমার বদলে তিনি প্রবোধচন্দ্র বাগচীকে সেখানে পাঠালেন। তিব্বতী শেখার ব্যবস্থা করতেও অনেক দেরি হয়। সব ঠিক করে তিনি আমাকে তা শিখতে বললেন।

এর কিছুদিন পরেই আমি চাকুরি নিয়ে ঢাকায় চলে যাই। সুতরাং তিব্বতীও আমার আর শেখা হল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়েই আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রীতিমতভাবে গবেষণা শুরু করি। তখন বিভিন্ন পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশিত হচ্ছে; তাতে স্যার আশুতোষ খুব খুশি হন। মনে আছে *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain*-এ আমার প্রবন্ধ ছাপা হলে—এ খবরটি তিনিই আমাকে ডেকে প্রথমে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে গবেষণার যে এত উন্নতি হয়েছিল, তার প্রধান কারণ তিনি নিজে এ বিষয়ে সকলকে নানাভাবে খুবই উৎসাহ দিতেন। যাঁরা গবেষণা করতেন তিনি তাঁদের ক্লাসের সংখ্যা কমিয়ে দিতেন; প্রত্যেক বছর কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি তাঁদের গবেষণার কথা উল্লেখ করতেন।

এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দু-চারটি কথা বলছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ হলে আমি প্রায়ই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যেতাম। তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ছিল গঙ্গার ধারে স্ট্র্যান্ড রোডের উপর মেটকাফ হলে। একদিন স্যার আশুতোষ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাইকোর্ট থেকে ফেরবার পথে প্রায়ই তোমাকে ওদিকে যেতে দেখি। তুমি কোথায় যাও?' আমি বললাম যে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে তো অনেক বই নেই। আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পড়তে যাই। তিনি শুনে বললেন যে, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে দরকারী সব বই থাকবে না—এটা ভালো কথা নয়। যেভাবেই হোক বই সংগ্রহ করতে হবে।

একদিন খবরের কাগজে কিম্বা কোনো ক্যাটালগে কোথায় যেন দেখলাম যে বিলেতে পীশেল (Pischel) এবং আরো দু-একজন প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তির লাইব্রেরি বিক্রি হবে। খবরটি পড়ে তখনই আমি স্যার আশুতোষের বাড়িতে হাজির হলাম। ওঁর নিয়ম ছিল সকালে আধ ঘণ্টার জন্য দোতলায় বৈঠকখানায় বসতেন, সেইখানেই বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন। তারপর তেতলায় উঠে যেতেন, বাড়িতে সকালে আর তাঁর দেখা পাওয়া যেত না। খুব তাড়াতাড়িই গিয়েছিলাম; কিন্তু দেখলাম যে তিনি তেতলায় চলে গেছেন। তখন একটি কাগজে লিখে পাঠালাম যে, বই সংগ্রহের একটি খুব ভালো সুযোগ হঠাৎ এসেছে এবং এটি খুবই জরুরী। তিনি আমাকে তেতলায় ডেকে পাঠালেন। সব শুনে বললেন, 'এখনই এর ব্যবস্থা করতে হয়, নইলে বিক্রি হয়ে যাবে।' একটি কাগজে দু-চার লাইন কী লিখে আমাকে দিয়ে বললেন, 'তুমি এ নিয়ে বেলা ন' দশটার মধ্যে ক্যাম্ব্রে কোম্পানির (M/s R. Cambray & Co.) দোকানে যাবে। তাদের এই কাগজটা দেখিয়ে বলবে এখনই যেন বিলেতে 'কেবল' করে দেয়। পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম হলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেন এ বই অবশ্যই কেনা হয়। তারপর দুপুরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, শৈলেনকে

সব বলে এই কাগজটি তাকে দেবে।' আমি যথারীতি প্রথমে ক্যাম্বে কোম্পানিতে গেলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এ্যাকাউন্ট্যাট শৈলেনবাবুকে (শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বা বসু) সব বললাম। শৈলেনবাবু বললেন, 'আপনারা এভাবে এ-সব করেন আর জবাবদিহি করতে আমাদের প্রাণ যায়। এই যে পঁচিশ হাজার টাকার বই কেনা হল, এর কোনো স্যাংশান নেই। কমিটি হল না, সিন্ডিকেটে গেল না। যখন অডিটে ধরবে তখন আমাকে বলতে হবে, এর কোনো ভাউচার নেই; কর্তার মুখই এর ভাউচার। এ সবই খুব বে-নিয়ম।' আমি বললাম, 'আমাকে এ সব কথা বলে লাভ কি? যা বলবার স্যার আশুতোষকে বলবেন।' অবশ্য বিলক্ষণ জানতাম যে স্যার আশুতোষকে এ কথা বলবার সাহস তাঁর হবে না।

এর বহুকাল পরের কথা—আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। সেখানকার লাইব্রেরির জন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বই কেনার কথা বললে ভাইস-চ্যান্সেলার হার্টগ সাহেব এ বিষয়ে খুবই সহানুভূতি দেখান। কিন্তু যখনই এ রকম কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি নিয়মমাফিক প্রথমে লাইব্রেরি কমিটি তারপর ফিনান্স কমিটি এবং একজিকিউটিভ কাউন্সিলে তা আলোচনা করেন। এঁদের সম্মতি পেলে তবে বই কেনার অর্ডার দেওয়া হয়। প্রায়ই দেখা যেত যে অর্ডার পেঁছিনোর আগেই সে বই বিক্রি হয়ে গেছে। কয়েকবার এ রকম হওয়ার পর আমি তাঁকে উপরের ঘটনাটি বললাম। আশুতোষ যেভাবে বইয়ের সন্ধান পাওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ তা কেনার ব্যবস্থা করতেন, তাঁকেও তাই করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষে এক আশুতোষ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ভাইস্-চ্যান্সেলার নেই যিনি নিজের ইচ্ছামত এভাবে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারেন। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

স্যার আশুতোষ সম্পর্কে আরো কয়েকটি ব্যক্তিগত কথা বলি। একদিন তিনি আমাকে বললেন যে তুমি এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হয়ে যাও; কারণ সেখানে পড়াশোনা এবং গবেষণা করার অনেক সুযোগ পাবে। তিনি তখন এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সদস্য হওয়ার কিছুদিন পরেই আবার আমাকে বললেন, 'তোমাকে কাউন্সিলের সদস্য করব ঠিক করেছি।' আমি বললাম, 'কাউন্সিলের মিটিং হয় রাত ন'টার পর। মিটিং সেরে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত্রি হবে, সে সময় ট্রাম বাস পাওয়া যাবে না। কাজেই আমার পক্ষে কাউন্সিলের সদস্য হওয়া সম্ভব হবে না।' তিনি বললেন, 'তুমি মিটিংএর দিন আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে যাবে। ফেরার পথে তোমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার মোড়ে তোমাকে নামিয়ে দেব।' প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে স্যার আশুতোষ তখন বাংলা দেশের শীর্ষস্থানে। অনেকেই এবং খবরের কাগজওয়ালারাও তাঁকে বলত 'বাংলার বাঘ'—এমনই রাশভারী পুরুষ ছিলেন

তিনি। আমার ন্যায় অল্পবয়স্ক শিক্ষকের প্রতি তাঁর অযাচিত অনুগ্রহের কথা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। এরকম আরো দৃষ্টান্ত আছে। তার একটি বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

একদিন দ্বারভাঙ্গা ভবনের বড় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, স্যার আশুতোষ তখন নীচে নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'তোমার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?' আমি বললাম যে কদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে শরীরটা খুবই দুর্বল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কতদিন অসুখ করেছিল, কবে জ্বর ছেড়েছে। সব শুনে বললেন, 'আরো দশ দিন এ মুখো হবে না। বাড়িতে বসে বিশ্রাম করো। যারা কাজকর্ম করে তাদের আমি খুব সাবধানে রাখি।' আমি বললাম, 'ক'দিন ছুটি নিয়েছি; আর বোধ হয় বেশি ছুটি পাওনা নেই।' তিনি বললেন, 'তোমার ছুটির দরকার হবে না। আমার নাম করে জ্ঞানকে বলবে যে, আমি দশদিন তোমাকে আসতে বারণ করেছি।' জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান ঘোষ—তখনকার রেজিস্ট্রার। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, বাড়ি চলে যাও।' জিজ্ঞাসা করলাম—'ছুটি নিয়ে পরে তো কোনো গোলমাল হবে না?' তিনি বললেন, 'কর্তার কথার ওপরে আর কোনো কথা নেই। কিছু ভাবনা নেই; তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা সামান্য কিছুও গবেষণা করতেন, তাঁরা এভাবে স্যার আশুতোষের কাছ থেকে কত সাহায্য, স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। আমার মনে হয় তখন যে গবেষণার প্রতি আমাদের এমন গভীর অনুরাগ ছিল তার একটি প্রধান কারণ আশুতোষের এমন অযাচিত এবং অকৃপণ স্নেহ, সহানুভূতি এবং উৎসাহ—যে জিনিসটি আজকাল একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক গবেষণা ঃ বাংলাদেশে পুরাতত্ত্ব আন্দোলন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়ে আমি অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখি। বিভিন্ন পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। একটি এধরনের প্রবন্ধ লিখে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফিথ পুরস্কার পেয়েছিলাম। সেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির থিসিস্ হিসেবে দাখিল করি এবং ঐ ডিগ্রি লাভ করি। আমার পরীক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল। তাঁর সঙ্গে ক্রমে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় এবং এই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যোগ দেবার কিছুদিন পরে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে কারমাইকেল অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ভারতসরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) ছিলেন। সে চাকুরি ছেড়ে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। আসার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে আরো সুষ্ঠু এবং বিস্তৃতভাবে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা হয় সে সম্পর্কে তিনি যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নিজের বিষয়ে তিনি ছিলেন খ্যাতিমান পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দু' বছর যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি পরে বইয়ের আকারে দুই খণ্ডে ছাপা হয় এবং এগুলি বিশেষ খ্যাতিলাভও করে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁর মতামত এবং কার্যক্রম অনেকের পছন্দ হত না। স্যার আশুতোষকে খুশি করার জন্য এমন অনেক কাজ তিনি করতেন যা একজন অধ্যাপকের পক্ষে বেশ বেমানান। তিনি স্থির করলেন যে আশুতোষের জন্মদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে তাঁর বাড়ি যাবেন। মারাঠা দেশে নাকি এ-রকম নিয়ম আছে। অবশ্য এ-রকম একটি প্রস্তাব হলে সহজে কেউ তার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। সুতরাং কয়েক বছর এভাবে আশুতোষের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানটি হতে থাকে।

এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে ভাণ্ডারকরকে আক্রমণ করে *Modern Review* এবং প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়। তার মধ্যে দু-একটির কথা মনে আছে। একটিতে ছিল: পূর্বে বর্গীরা বাংলা দেশ থেকে চৌথ আদায় করত। এই নূতন বর্গী চৌথের বদলে ঘাসদানা আদায় করছেন।' "কাশিমের মার্কা" নামে একটি প্রবন্ধ তখন খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে

প্রবন্ধটি লেখা হয় তার কথা বলছি। কলকাতা যাদুঘরে নিওলিথ বা নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের অনেক জিনিস আছে। একদিন পঞ্চাননবাবু নামে একজন নৃতত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক হঠাৎ ভাণ্ডারকরকে বললেন যে, এ-রকম একটি জিনিসের পিছনে কি সব লেখা আছে। ভাণ্ডারকর এই কথা শুনে লেখাটি নিজে পড়লেন এবং পড়ে বললেন যে, এটি ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা একটি লিপি। নব্যপ্রস্তর যুগে ব্রাহ্মী লিপির অস্তিত্বের সন্ধান সত্যই একটি বড় আবিষ্কার। সুতরাং ভাণ্ডারকর সাড়ম্বরে এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করলেন। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীর পরের সংখ্যাতেই এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে লেখা হল যে, যাদুঘরে একজন মুসলমান বেয়ারা ছিল, তার নাম কাশিম। তার অভ্যাস ছিল এই সব পাথরের জিনিসের গায়ে ইংরেজিতে তারিখ লেখা। ভাণ্ডারকর এই রকম একটি ইংরেজি তারিখকে উল্টো করে ধরে ব্রাহ্মী লিপি মনে করেছেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে ছবি ছাপা হয় তাতে দেখা যায় যে, সোজা দিকে ধরলে সেটা অধোরেখাযুক্ত পরিষ্কার একটি ইংরেজি তারিখ। এ প্রবন্ধটি যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কিম্বা তাঁর ইঙ্গিতেই লেখা হয়েছে সে বিষয়ে কারুর কোনো সন্দেহ ছিল না। কেননা রাখালবাবু অনেকদিন যাদুঘরে কাজ করেছেন এবং কাশিমের এই অভ্যাস তিনি ছাড়া আর কারুর জানা সম্ভব নয়। রাখালবাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন সুরেন কুমার। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির রিডিং রুমের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এর প্রবন্ধ সুরেন কুমারের নামেই বের হত। রাখালবাবু নিজে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী (সুপারিন্টেন্ডেন্ট) ছিলেন। তিনি ভাণ্ডারকর এবং ডি. বি. স্পুনার প্রভৃতি ঐ বিভাগের অন্য কর্মচারীদের প্রতি খুব বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করতেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ মডার্ন রিভিউ-এ তিনি সুরেন কুমারের নামে লিখেছেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক রামানন্দবাবুর সঙ্গে রাখালবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রাখালবাবুর পক্ষে সেজন্য যে-কোনো প্রবন্ধ এই পত্রিকায় ছাপানো সহজ ছিল।

আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিই প্রায় সেই সময়ে পূর্বোক্ত স্পুনার নামে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক সুপারিন্টেন্ডেন্ট পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে আলোচনা করে প্রতিপন্ন করেন যে, সেটি সম্পূর্ণ পারস্য দেশীয় প্রভাবের পরিচয় দেয় এবং মৌর্য সভ্যতাও পারস্য দেশ থেকে ভারতে এসেছে। এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে তখন একটা তুমুল আলোড়ন হয়। এর প্রতিবাদ করে মর্ডান রিভিউ-এ একটি বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নীচে লেখকের নাম ছিল Nimrod—এটি সুরেন কুমারের ছদ্মনাম। কিন্তু এই প্রবন্ধের প্রকৃত লেখক ছিলেন রাখালবাবু। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করতেন। সুতরাং নিজের নামে ঐ বিভাগের বিপক্ষে কিছু লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেজন্য তিনি বেনামীতে প্রবন্ধটি ছাপিয়েছিলেন।

প্রবন্ধটি পড়েই আমরা অনেকে তা অনুমান করেছিলাম। পরে রাখালবাবু নিজেও তা স্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন যে, এই-সব খবর জেনেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বড় কর্তারা তাঁর ওপর বিরূপ হন এবং তাঁকে যে পরে অপদস্থ হয়ে সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে আসতে হয় এটাই নাকি তার প্রধান কারণ। কিন্তু এ-কথা কতদূর সত্য তা বলতে পারি না। কারণ এই প্রবন্ধ লেখার পরেও অনেক বছর রাখালবাবু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে কাজ করেছেন এবং যে অভিযোগে তাঁর পদচ্যুতি ঘটে তা খুবই গুরুতর এবং সেটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মডার্ন রিভিউ এবং প্রবাসীতে পরে নানারকম লেখা বেরুতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষকই এই কাজের ভার নেন। যতদূর জানি স্যার আশুতোষের ইচ্ছা ছিল আমিও যেন এ-সব লেখার প্রতিবাদ করি। কিন্তু নানা কারণে এই-সকল বাদ-প্রতিবাদে আমি কখনও যোগ দিই নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধ দলের অন্যতম লেখক ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার। ইতিহাস-গবেষকদের যদুনাথ খুবই ভালোবাসতেন এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য করতেন। কিন্তু কি কারণে জানি না আচার্য যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার আশুতোষের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। স্যার আশুতোষও তাঁদের মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। একবার কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন যে, ঐ তিনজন লাটসাহেব হন, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই, যদি তাঁরা বাংলাদেশের বাইরে থাকেন। বহু চেষ্টা করেও এই মনোমালিন্যের কারণ কিছু আমি নির্ণয় করতে পারি নি।

পুণা শহরে ১৯১৯ সালে অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স-এর প্রথম অধিবেশন হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্যার আশুতোষ সেই সম্মেলনে কয়েকজন শিক্ষক প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন—তার মধ্যে আমিও ছিলাম। আশুতোষ বললেন যে পুণায় যখন যাচ্ছ তখন ওর কাছাকাছি কিম্বা আসা-যাওয়ার পথে কয়েকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা তোমরা দেখে আসবে। এর মধ্যে একটি হল সাঁচী। যাতায়াতের খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ই বহন করবে, এরূপ স্থির ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্কৃত কলেজ থেকে আমরা প্রায় আট-দশ জন বাঙালী অধ্যাপক পুণায় গিয়েছিলাম। অশীতিপর বৃদ্ধ স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর ঠিক জন্মতারিখের দিনই এই অধিবেশন হয় এবং এই উপলক্ষে পুণা থেকে মহাভারতের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সময় রাখালবাবু পুণায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। পুণায় পৌঁছে শুনলাম যে, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি এতে যোগ

না দিয়ে ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন। সম্মেলনে খাওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আহারে তৃপ্তিলাভ তো দূরের কথা তাতে আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তিও হত না। সংস্কৃত কলেজের শ্রদ্ধাভাজন দুই বৃদ্ধ পণ্ডিত—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং প্রমথনাথ তর্কভূষণ—আমাকে বললেন, 'বাপুহে! আর তো এভাবে চালাতে পারি না। অন্য কোথাও ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো কিনা চেষ্টা করে দেখো।' রাখালবাবুর কথাই তখন আমার মনে পড়ল। তিনি ছাড়া পুণায় আর কাউকে আমি চিনতাম না। তাঁর বাড়ি কোথায় ঠিক আমার জানা ছিল না। খোঁজ করে অনেক কষ্টে পরের দিন সকালে সেখানে হাজির হলাম। ডাকাডাকি করতে তাঁর ছেলে বেরিয়ে এসে বলল যে রাখালবাবু বাড়ি নেই, বাইরে গেছেন। এ খবর অবশ্য পূর্বেই জানতাম। তাকে বললাম, 'তোমার মাকে একবার ডাকো, তাঁর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে।' কলকাতায় বহুবার রাখালবাবুর বাড়িতে রাত্রে ভূরিভোজন করেছি। খাওয়াদাওয়ায় বিষয়ে তাঁর ব্যবস্থা ছিল রাজসিক ভাবের। সুতরাং তাঁর স্ত্রী আমাকে এবং আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে বেশ ভালোভাবেই জানতেন। তিনি অবশ্য আমাদের সামনে কখনও বের হতেন না। আমার খবর পেয়ে তিনি দরজার ওধারে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথা বললাম। শুনেই তিনি বললেন যে, আমরা যেন সেই দুপুর থেকেই তাঁর বাড়িতে খাই। সকালে তাড়াতাড়ি এত লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে তাঁর কষ্ট হবে এই মনে করে বললাম যে দুপুরের বদলে রাত্রে আসব। তিনি তা শুনলেন না; বললেন দুপুরে না গেলে তিনি দুঃখ পাবেন এবং রাখালবাবুও শুনলে রাগ করবেন। সম্মেলনের সকালের অধিবেশনের পরে আমরা চার পাঁচজন রাখালবাবুর বাড়ি গেলাম; সেখানে বেশ ভালোভাবেই সেদিন আমাদের আহার হল। বৃদ্ধ বিদ্যাভূষণ ও তর্কভূষণ মহাশয় রাখালবাবুর ছেলেকে বললেন, 'তোমার মাকে বলো যে আমরা খুব তৃপ্তি লাভ করেছি এবং তাঁকে আশীর্বাদ করছি।' রাখালবাবুর স্ত্রী বললেন যে, যে-কদিন আমরা পুণায় আছি, দুবেলাই তাঁর বাড়িতে খেতে হবে।

পরের দিন ভোরবেলায় ডেলিগেট ক্যাম্পে শুয়ে আছি, ভালো করে ঘুম ভাঙে নি। এমন সময় শুনি বাইরের দরজায় কে সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলে দেখি স্বয়ং রাখালবাবু দাঁড়িয়ে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় প্রথমেই আমাকে কিছুক্ষণ গালমন্দ করে পরে বললেন, 'আমার বাড়ি থাকতে তোমরা এখানে শুকিয়ে মরছ কেন?' সম্মেলনের আয়োজনকারীদের সম্বন্ধেও কটূক্তি করলেন। তিনি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আমার মালপত্র সব গাড়িতে তুলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। যাবার সময় বিদ্যাভূষণ মশায়দেরও নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তাঁর বাড়িতে যে-রকম খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তা দেখে বললাম, 'পুণায় দেখছি সমুদ্রের মাছও পাওয়া যায়।' মারাঠীদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে

তিনি বলে উঠলেন, 'এদের দেশে কি এসব পাওয়া যায় নাকি! বোম্বাই থেকে আমি নিজেই এ-সব আনাই। বাঙালী সন্দেশ এবং মিষ্টিও বোম্বাই-এ পাওয়া যায়। তাও সেখান থেকে আনাই।' রাখালবাবুর স্বভাবই এমন ছিল। টাকা খরচ করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না; কিন্তু ভালোরকম খাওয়া চাই। সম্মেলনের অধিবেশনের শেষেও তিনি আমাকে ছাড়লেন না। গাড়ি করে অনেক জায়গা তিনি আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন—এর মধ্যে শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ ছিল। রাখালবাবু খ্যাতিমান পণ্ডিত, এবং তাঁর চরিত্রে দোষগুণ দুইই ছিল। কিন্তু তাঁর বন্ধুপ্রীতি এবং অতিথি-বৎসলতার কথা কখনও ভুলব না; সেজন্যই এই ঘটনাটি সবিস্তারে বললাম।

পুণা থেকে ফেরার সময় আমাদের সাঁচী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল আমি ছাড়া আর কারুর সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সাঁচী দেখার আমার ভয়ানক আগ্রহ ছিল। সুতরাং একাই গেলাম। সেখানে থাকার ব্যবস্থা বলতে একটিমাত্র পাকা ঘর—যে ছোট পাহাড়ের উপর সাঁচীস্তূপ ঠিক তার পাদদেশে ছিল এই ঘর। শুনলাম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বড়কর্তা স্যার জন মার্শাল যখন এই স্তূপের সংস্কার সাধন করেন তখন তাঁর থাকার জন্য ঐ ঘরটি তৈরি হয়। এখন সেটি অতিথিদের জন্য ব্যবহার করা হয়। ঘরটি বেশ ভালো। সেখানে একজন চৌকিদার ছিল; সে রান্নার ব্যবস্থাও করত। সাঁচীর পাহাড় তেমন উঁচু নয়; উঠতে কষ্ট হত না। সকাল বিকাল দু'বেলাই পাহাড়ে উঠতাম। দ্বিতীয় দিন বিকালে স্তূপের চারিদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এবং দূরের দৃশ্য দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়ি যে, কখন সন্ধ্যা হয়েছে খেয়াল ছিল না। পাহাড় থেকে নামার সময় দেখি একটি বুনো শুয়োর রাস্তা পার হচ্ছে। চৌকীদার বলল যে সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা ঠিক নয়; কাছেই জঙ্গল আছে, বুনো জন্তু বেরয়। সাঁচী সম্বন্ধে একটি বই আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে স্তূপের রেলিংএর গায়ে যে অসংখ্য চিত্র আছে, সেগুলি মন দিয়ে দেখতাম। স্তূপের অপরূপ ভাস্কর্য এবং স্থানটির চতুর্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। সাঁচীতে আমি তিনদিন ছিলাম।

বাংলাদেশে পুরাতত্ত্ব আন্দোলন

বাংলাদেশে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের মধ্যে যে দুটি বড় দল আছে সে কথা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়েই আমি জানতে পারি। এ দু'দলে খুব রেষারেষি ছিল। এদের একটি হল রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এবং অন্যটি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সাহিত্য পরিষদ

দলের নায়ক। অপর দিকে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। দীঘাপতিয়ার কুমার পুরাদ্রব্য সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। মূলতঃ তাঁরই অর্থসাহায্যে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অক্ষয়বাবু ও রমাপ্রসাদবাবুর সহায়তায় বরেন্দ্র অঞ্চলের নানা স্থান থেকে অনেক পুরাদ্রব্য সংগৃহীত হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রগৃহও (Museum) গঠিত হয়। 'গৌড়রাজমালা' এবং 'গৌড়লেখমালা' নামে দুটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের পুরাতত্ত্বের একটি বিষয় নিয়ে এই সময়ে এই দুই দলের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়। আমাদের দেশের কুলজী গ্রন্থে আছে যে মহারাজা আদিশূরই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে যে কয়জন ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের নিয়ে আসেন তাঁদের বংশধরেরাই পরে কুলীন ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের মর্যাদা পান। অক্ষয়বাবু রমাপ্রসাদবাবু এবং রাখালবাবু এই কিম্বদন্তি বিশ্বাস করতেন না। এমন কি রাজা আদিশূরের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাঁরা অস্বীকার করতেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে আদিশূর ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই আদিশূরকে নিয়ে দুই দলের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে তিনি সম্প্রতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা হরি মিশ্রের কারিকা এবং এডু মিশ্রের কারিকা নামে দুখানি প্রাচীন পুঁথিতে আদিশূরের উল্লেখ দেখেছেন এবং এ-সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন। সুতরাং আদিশূরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। মূল পুঁথিগুলি দেখতে চাইলে তিনি বলেন যে, সেগুলি কোটালিপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ বিধবার কাছে আছে; তিনি তা হাতছাড়া করতে রাজী নন। এ কারণে পুঁথির কয়েকটি শ্লোক মাত্র তিনি লিখে এনেছেন। এ শুনে অক্ষয়বাবুরা একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অনেক টাকাকড়ি দিয়ে গোপনে কোটালিপাড়ায় পাঠালেন। তিনি ঐ পুঁথি নকল করে আনেন। দেখা গেল ঐ পুঁথিতে নগেনবাবু-কথিত অনেক শ্লোকই আছে; কিন্তু আদিশূর সম্পর্কে শ্লোক কয়টি একেবারেই নেই। এই পুঁথির নকল বরেন্দ্র দলের হাতে আসার পর কথা উঠল যে একটি সভা ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হোক। রাখালবাবু বরেন্দ্র দলের প্রতি খুব বিরূপ ছিলেন। তবুও এই বিষয়ে তিনি তাদের সঙ্গেই যোগ দিলেন। কারণ তিনি বলতেন এবং অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে নগেনবাবু পুঁথি জাল করতেন। এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে নূতন পুঁথির উপর অ্যাসিড ছড়িয়ে বালির নীচে রাখলে সেটি পুরনো কীটদষ্ট পুঁথির মতো দেখায়। তিনি বলেন যে নগেনবাবুর অনেক পুঁথি নাকি এ-ভাবেই পুরনো করা হয়েছে।

রাখালবাবুর অনেক দোষ থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সেজন্যই তিনি এ ব্যাপারে অক্ষয়বাবুর দলে যোগ দিলেন এবং আমাকেও ঐ দলে টেনে নিলেন। যখন সাহিত্য পরিষদকে বলা হয় যে আদিশূর সম্পর্কে

একটি আলোচনা সভা হোক— কেননা বাংলার সমাজের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন অনেকেই এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সভার একটি তারিখও স্থির হয়। এর মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং নগেনবাবু কিভাবে খবর পেলেন যে কোটালিপাড়া থেকে সেই পুরনো পুঁথির নকল আনা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁদের এ কথাও বলেছিল যে পুঁথির দরকারী অংশের ফোটোগ্রাফও তোলা হয়েছে। যতদূর জানি এটা সত্যি নয়। এই খবর শুনে সাহিত্য পরিষদের নেতারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে আলোচনা সভা বন্ধ করে দিলেন। যে কুলজী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে তাঁরা আদিশূরের কথা বলছেন— তা সবই জাল বা মিথ্যা, এ কথা আমরা জোর গলায় প্রচার করলাম। সম্প্রতি "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র" নামক গ্রন্থে আমি এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় ও নগেনবাবুকে লোকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞ বলে জানত। অনেকটা এই ব্যাপারের পরে এবং আমাদের অন্যান্য আলোচনার ফলে নগেনবাবুর সে খ্যাতি লোপ পায়। মনে হয় আমাদের এই চেষ্টার ফলে লোকের মনে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটে।

নগেনবাবুর ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি সম্বন্ধে আরো দু-একটি কথা বলছি। আমার সতীর্থ ও সুহৃদ নির্মলচন্দ্র চন্দর কাছে শুনেছি যে একদিন নগেনবাবু নির্মলের পিতামহ বিখ্যাত অ্যাটর্নী গণেশচন্দ্রর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলেন যে আপনাদের কুলপরিচয় পাওয়া গেছে। আপনারা হলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা; তাম্রশাসনে এর উল্লেখ আছে। এই বলে তিনি কিছু টাকাও পেয়ে যান।

একবার বাংলার লাটসাহেব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ দেখতে আসেন। এক-একটি বিভাগ দেখাবার ভার এক-একজনের উপর ছিল। আমি ছিলাম তাম্র-শাসন সংগ্রহশালায়। লাটসাহেবকে কয়েকটি তাম্রশাসনের বিবরণ শোনালাম। তিনি চলে গেলেন। হঠাৎ দেখি নগেনবাবু কৃষ্ণদাস পালের পুত্র রাধাচরণ পালকে ডেকে বলছেন, আপনাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ পাল সম্রাটগণ) বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই তাম্রশাসনগুলিই তার প্রমাণ। বাংলাদেশে ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত প্রণালীর যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে তার জন্য আমাদের দলের কিছু কৃতিত্ব দাবি করলে বোধ করি অন্যায় হবে না।

নগেনবাবুর এমন খ্যাতি ছিল যে পণ্ডিতরা তাঁকে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধি দিয়েছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর পাণ্ডিত্যে কেউ বিশ্বাস করতেন না। শাস্ত্রী মহাশয়ও আমাদের উপর খুবই ক্রুদ্ধ হন। একদিন তিনি নাকি বলেছিলেন, রাখাল, রমেশ— এরা কেবল প্রমাণ প্রমাণ বলে চেঁচামেচি করে! পাথুরে প্রমাণ ছাড়া তারা কিছু বিশ্বাসই করে না। কুলজী পুঁথির মর্যাদাই তারা দেয় না। এজন্য রাগ করে আমি এখন ইতিহাস ছেড়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছি। 'বেনের মেয়ে' তার প্রমাণ।

এর অনেক বছর পরে শাস্ত্রী মহাশয় ও আমি একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি এমন কথা তিনি বলেছিলেন কিনা। বললেন, 'বলেছিলাম এবং এখনও বলি। তোমাদের জ্বালায় আর ইতিহাস লেখার উপায় নেই। কাজেই ইতিহাস না লিখে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছি।' এখানে বলে রাখা দরকার যে বাংলা দেশের বৌদ্ধ যুগের ঘটনা অবলম্বন করে তাঁর লেখা 'বেনের মেয়ে' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস।

সে সময় গবেষণার ক্ষেত্রে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিরোধ ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব বিস্তার করত। তেমনই একটি ঘটনার কথা বলছি। আদিশূরের অস্তিত্ব নিয়ে দু'দলে যখন বিরোধ চলছে, তখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে 'রামচরিত' পুঁথিখানি দেখানো হয়। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরে কিন্তু পুঁথিখানির কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। বাংলার ইতিহাসচর্চায় 'রামচরিত' পুঁথি একটি অমূল্য উপকরণ। এতে রামপালের রাজ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের যেমন বিস্তৃত বিবরণ আছে তা আর কোথাও নেই। এই গ্রন্থের এই একমাত্র পুঁথিটি শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে এনেছিলেন। পুঁথি হারানোয় আমরা সকলেই খুব বিচলিত হই। শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, "বরেন্দ্র সমিতির লোকেরাই এ পুঁথি চুরি করেছে।" তিনি এমন কি পুলিশেও খবর দেওয়ার চেষ্টা করেন যাতে বরেন্দ্র সমিতি থেকে ঐ পুঁথি উদ্ধার করা যায়।

পূর্বেই বলেছি আমি তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের এ অভিযোগ আমরা সকলেই অবিশ্বাস করি। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতেই অন্যান্য কতকগুলি পুরোনো পুঁথির মধ্যে রামচরিত পুঁথিখানি পাওয়া গেল। তখন শাস্ত্রী মহাশয় বলতেন যে পুলিশ ডাকার ভয়েই ওরা পুঁথি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

সে সময়কার প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে আরো অনেক দলাদলি ছিল। বিশেষ করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাণ্ডারকর এবং ভাণ্ডারকর ও জয়সোয়াল এঁদের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। এঁরা প্রত্যেকেই অপরের নামে নানারকম কুৎসা রটাতেন। আমরা একদল ছিলাম এঁদের তিনজনেরই বন্ধু। আমাদেরই অসুবিধা হত বেশি। পণ্ডিতদের মধ্যে কি রকম ছেলেমানুষী ছিল একটি ঘটনা বললে তা বোঝা যাবে। আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধুদের দলে ক্রমে একটি প্রথা দাঁড়িয়েছিল যে প্রত্যেক মাসে একজনের বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। পালা করে ক্রমে ক্রমে সকলের বাড়িতে হলেও নিমন্ত্রণটা রাখালবাবুর বাড়িতেই অবশ্য বেশি হত।

আমার বাড়িতে একদিন খাওয়ার আয়োজন। রাখালবাবু, জয়সোয়াল, সুরেন কুমার, কালিদাস নাগ, যতীন্দ্রমোহন রায় ('ঢাকার ইতিহাস'-প্রণেতা), হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি দলের সকলেরই নিমন্ত্রণ। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক; কিন্তু তিনি ছিলেন রাখালবাবুর

অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রত্নতত্ত্বেও তাঁর খুবই উৎসাহ ছিল। সেজন্য তিনিও এই দলে ছিলেন। এঁরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। আমি বললাম, এখনও ভাণ্ডারকর আসছেন না কেন? শুনেই রাখালবাবু লাফিয়ে উঠলেন—'তুমি ভাণ্ডারকরকে নিমন্ত্রণ করেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'ভাণ্ডারকর এলে আমি এখানে খাব না।' আমি তো মহাসমস্যায় পড়লাম। হেমবাবুকে ধরলাম; তিনি অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে রাখালবাবুকে শান্ত করলেন। ভাণ্ডারকর আসার পরে রাখালবাবু রইলেন বটে তবে তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না।

ছোট হলেও আমাদের দলটি ছিল বেশ জমাট। সকলের মধ্যেই বেশ একটি সৌহার্দের ভাব ছিল। এই সময় পাটনায় একটা কি ঐতিহাসিক অধিবেশন হয়। উপরে যাঁদের নাম করেছি তাঁরা সকলেই সেখানে যাবেন স্থির করলেন। জয়সোয়াল তখন পাটনায় ব্যারিস্টার। ভাণ্ডারকর ছাড়া আমরা আর সকলে তাঁর বাড়িতে থাকব এই ব্যবস্থা হল। একই ট্রেনে আমরা রওনা হলাম। সন্ধ্যার পর ট্রেন ছাড়ল, পরদিন সকালেই পাটনায় পেঁৗছনর কথা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, এ সত্ত্বেও রাখালবাবু একটি বড় ডেকচিতে তিন-চার সের রান্না মাংস ও লুচি নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বললেন, পথে বেরলেই আমার ক্ষিধে পায়। পেঁৗছতে তো সকাল বেলা আটটা। ভোরে এই লুচি-মাংসয় আমাদের সকলেরই ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাবে। একটি কামরায় আমরা পাঁচজন একসঙ্গে ছিলাম; দু-তিনজন পাশের কামরায়। ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় হঠাৎ রাখালবাবু ধাক্কা দিয়ে তুলে বললেন, ঘুমিয়ে রয়েছ আর এদিকে ওরা সব শেষ করে ফেলল।' তখন রাত্রি দেড়টা কিম্বা দুটো। রাখালবাবু ও আমি—এ দুজন ছাড়া দেখি বাকী সকলেই ডেক্‌চি খুলে খাওয়া শুরু করেছে। আমরাও সে দলে যোগ দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ডেকচি একেবারে শূন্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভালো খেতে পারতেন। কে কী খেতে ভালোবাসেন তা আমরা জানতাম। যতীন রায় একসঙ্গে পনেরো কুড়িটি ডিম খেত, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এক হাঁড়ি দৈ খেতে পারতেন। তখন আমাদের শরীরও ভালো ছিল এবং খাওয়ার জিনিসও সস্তা ছিল।

পাটনায় পেঁৗছে জয়সোয়ালের বাড়ি যাওয়ার পথেই রাখালবাবু স্থির করলেন যে জয়সোয়ালকে জব্দ করতে হবে। জয়সোয়াল আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ভালোই করেছিলেন। কিন্তু খেতে বসে এঁরা সবাই এত বেশি খেতে শুরু করলেন যে অল্প সময়েই ভাত ফুরিয়ে গেল। তারপর এল রুটি। রুটিও সব শেষ হল— তবুও যেন এঁদের ক্ষুধা মেটে না। জয়সোয়াল তো খুবই অপ্রস্তুত; বিকেলে তিনি প্রায় ডবল আয়োজন করলেন। আড়ালে তাঁকে আমি বলেছিলাম যে তাঁর লজ্জার কোনো কারণ নেই। এ সবই তাঁকে বিপদে ফেলার জন্য পূর্ব থেকে স্থির করা হয়েছে। এখনকার সঙ্গে সেদিনের যে কত তফাত, সেকথাটি বলার জন্যই এ ঘটনার উল্লেখ করলাম।

পাটনায় সভা শেষ হলে কালিদাস নাগ, ননীগোপাল মজুমদার ও আমি রাজগীর, নালন্দা প্রভৃতি বিহারের কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখি। সকালে টাঙ্গা নিয়ে বেরতাম, পথে সুবিধামত ছাতু বা চিঁড়ে খাওয়া এবং রাত্রে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলে আহার সেরে ধর্মশালায় শুধু খাটের উপর শোওয়া—এভাবে প্রায় সাত-আট দিন ঘুরেছি। তখন বয়স ছিল কম। কোনো কষ্টই হত না।

রাজগীরে দেখলাম একটি মূর্তির গায়ে কি-সব লেখা আছে। তেল সিঁদুরে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সন্দেহ হল প্রাচীন লেখা নিশ্চয়ই। পাণ্ডারা কিছুতেই মূর্তি ছুঁতে দেবে না। আমাদেরও জিদ চাপল যেভাবেই হোক এই লেখার একটি ছাপ তুলতেই হবে। রাখালবাবুর সঙ্গে কাজ করে ছাপ তোলার পদ্ধতি আমার জানা ছিল। কিন্তু সমস্যা হল জল বা সাবান দিয়ে তেল-সিঁদুর না তুললে ছাপ নেব কি করে। ভেবেচিন্তে এক উপায় বার করা হল। কপালে চন্দন, গলায় উপবীত এবং খালি গায়ে আমি সামনে চলেছি। পিছনে কালিদাস ও ননীগোপাল। ওরা পাণ্ডাদের বলল যে উনি একজন বড় সাধু, স্বপ্ন দর্শন হয়েছে ঐ মন্দিরে দেবতাকে পুজো দিতে হবে। এই বলে ওরা পাণ্ডাদের হাতে দু-একটি টাকাও গুঁজে দিল। মন্দিরে ঢুকতে আর কোনো বাধা নেই। আমরা ভিতরে ঢুকে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। জল দিয়ে তাড়াতাড়ি মূর্তিটি পরিষ্কার করে দেখি পুরনো লিপি উৎকীর্ণ করা আছে। তার ছাপ তুলে নিলাম। আবার যথারীতি মূর্তির গায়ে সিঁদুর লেপে বেরিয়ে এলাম। দুঃখের বিষয় ছাপটি পথেই হারিয়ে গেল।

রাখালবাবুর সঙ্গে ভাণ্ডারকরের বিরোধ ক্রমেই খুব তীব্র হয়ে ওঠে। কিজন্য এমন হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানি না। শুনেছি রাখালবাবু যখন মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার করেন তখন ভাণ্ডারকর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তাদের বলেছিলেন যে সেটি এমন কিছু নয়। তার ফলে রাখালবাবু পুণায় গিয়ে সেখানে অনেক লোক লাগিয়ে ভাণ্ডারকরের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কুৎসার কথা বার করেন এবং তা বলে বেড়াতেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানি না এবং আর বলবার ইচ্ছেও নেই। সামান্য কারণে বিশিষ্ট পণ্ডিত মানুষেরা যে নিজেদের মধ্যে অশোভন আচরণ করতে পারেন—এ তারই একটি দৃষ্টান্ত। যতদূর জানি রাখালবাবুর সঙ্গে ভাণ্ডারকরের এবং ভাণ্ডারকরের সঙ্গে জয়-সোয়ালের বিরোধ কখনও মেটে নি। জয়সোয়াল যখন কলকাতার যাদুঘরের দুটি মূর্তিকে শিশুনাগবংশীয় রাজার মূর্তি বলে প্রচার করেন তখন ভাণ্ডারকর ঐ মূর্তির পিছনে যে উৎকীর্ণ-লিপি আছে তা আমাকে দেখান। তার মধ্যে শিশুনাগ বা অজাতশত্রুর কোনো কথাই নেই। সে কথা আমি একটি প্রবন্ধেও লিখলাম। জয়সোয়ালের প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ কিছু ছিল না। ঐতিহাসিক সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যই আমি এ প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

আরো অনেকবার জয়সোয়ালের মতামতের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার উপকরণ ভাণ্ডারকর আমাকে দিয়েছেন। জয়সোয়াল যখন হাতিগুম্ফা ও খারবেল লিপি পাঠ করে নূতন আবিষ্কারের দাবি করেন তার অধিকাংশই যে কাল্পনিক এবং সে কথা যে সত্যসত্যই সেই লিপিতে লেখা নেই— এ কথা আমি ভাণ্ডারকরের দেওয়া ছাপ থেকেই প্রমাণ করি। পরে এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়। জয়সোয়ালদের এরকম অনেক মতই ক্রমে বাতিল হয়ে যায়। এজন্য অবশ্য জয়সোয়ালের সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো অসদ্ভাব সৃষ্টি হয় নি। ভাণ্ডারকরের কাছ থেকেই আমি এ-সব প্রবন্ধ লেখার প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছি— এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে ঐতিহাসিক সত্যসন্ধানের প্রতিই আমার লক্ষ্য ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা প্রায় সাত বছর পূর্ণ হবে, এমন সময় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হল। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় বটে কিন্তু পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের মধ্যে একটি আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার এই বলে তাদের আশ্বাস দিলেন যে, পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। মুসলমানেরা এতে খুবই খুশি হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণতঃ যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তাঁরাও এবার এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন রাসবিহারী ঘোষ এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের প্রধান যুক্তি হল এই যে, প্রশাসনক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে এখন সাংস্কৃতিক বিভাগ করা হচ্ছে। ফলে, এতে আরো গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমেই এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের এমন আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কারণ ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার ক্ষমতা এবং অধিকার ঢাকা শহরের দশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই সংকীর্ণ পরিধির বাইরে সমগ্র পূর্ব বাংলা পূর্বের মতোই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে। এরপর এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই সময় থেকে ভারত সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ বা তারও কিছু বেশি টাকা আলাদা করে রেখে দিতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরো কয়েকটি কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে অনেক দেরি হয়। এ সম্বন্ধে স্যার আশুতোষের কাছে একটি খবর শুনেছিলাম, যা এখনও সাধারণের অজানা। সে কথাটি তাই এখানে লিখে রাখছি। একদিন বিকালে সেনেট হাউস থেকে বাইরে আসছি, দেখি স্যার আশুতোষ তাঁর গাড়িতে উঠছেন। আমাকে ডেকে বললেন; 'চলো, আমার সঙ্গে।' আমি তখন ভবানীপুরে থাকি। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। পথে স্যার আশুতোষ অনেক বিষয়ে অনেক কথা বললেন; এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে খবরটি আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। স্যার

আশুতোষের কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই সংক্ষেপে বলছি : "একদিন হাইকোর্টে গেছি, এমন সময় বড়লাটের বাড়ি থেকে জরুরী মার্কা এক চিঠি পেলাম। খুলে দেখি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি লিখেছেন যে, হাইকোর্ট থেকে ফেরার পথে আমি যেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে যাই। চিঠিতে যে সময় লেখা ছিল, ঠিক তখনই আমি গেলাম। যাওয়া মাত্রই প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাকে একেবারে সোজা বড়লাটের কামরায় নিয়ে গিয়ে এবং সেখানে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। বড়লাট ঘরে ঢুকে দু'এক কথার পরেই আমাকে বললেন, 'দেখো, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তোমরা খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করছ। এ বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করবই। কিন্তু আমি গোলমাল ভালোবাসি না। এই বিরোধী দলের মধ্যে যে তুমি একজন প্রধান তা আমি জানি এবং তোমার প্রতিবাদকে আমি ভয় করি। তুমি তো জান আমি কূটনীতি বিভাগে ছিলাম। কার্য উদ্ধারের রীতি আমার ভালোই জানা আছে। তোমাকে আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করছি— তোমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি পেলে তুমি এই প্রতিবাদ বন্ধ করতে রাজী আছ? আমি এর জন্য যথোচিত মূল্য দেব।' হঠাৎ এই প্রস্তাব শুনে আমি প্রথমে কিছুই স্থির করতে পারলাম না। কিন্তু বড়লাট চাইলেন যে আমি যেন তখনই এর একটা জবাব দিই; বাইরে গেলে অন্য লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে হয়তো আমার মতিগতি বদলে যেতে পারে। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলাম— কী বলি। তখন তিনি আবার বললেন যে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হবেই। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করে নিতে পারো। তখন আমি বললাম, আচ্ছা, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব না যদি ভারত সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। বড়লাট তখনই এতে রাজী হলেন। বললেন, তাই হবে। তোমার সঙ্গে আমার এই যে কথাবার্তা হল এটি আমার দপ্তরে ঢাকা প্যাক্ট বলে লেখা থাকবে।' এই কাহিনী শেষ করে স্যার আশুতোষ বললেন যে এভাবে আমি চারটি অধ্যাপকের পদ পেলাম। যতদূর মনে পড়ে এই চারটি পদ হল—Carmichael Professor of Ancient Indian History and Culture, Minto Professor of Economics, George V Professor of Philosophy এবং আর একটি বোধ হয় Hardinge Professor of Mathematics।

এই চারটি অধ্যাপক-পদ এখনও আছে। সব শুনে আমি স্যার আশুতোষকে বললাম, 'এ ঘটনার কথা বাইরের কেউ জানে না; জানবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। আপনি যদি কোনো স্মৃতিকথা লেখেন তবেই এ সব খবর এবং এ ধরনের সাধারণের অজানা আরও কোনো কোনো খবর লোকে জানতে পারবে। ইতিহাসের দিক থেকে এটা খুবই প্রয়োজনীয় মনে করি।' স্যার আশুতোষ একটু হেসে বললেন, "আমার তো এখন নিজে লেখার সময় নেই। তবে ছেলেরা এবং

জামাই (প্রমথ) বড় হয়েছে। ভাবছি আমি মুখে মুখে বলে যাব, ওরা লিখে নেবে।”

সাধারণের অজানা এরকম আর একটি কথা তাঁর কাছে শুনেছিলাম। বড়লাটের একিজকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথম ভারতীয় সভ্য নিয়োগের কথা উঠলে স্যার আশুতোষের নামই প্রথমে বিবেচিত হয়; কিন্তু পরে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ঐ পদে নিযুক্ত হন। স্যার আশুতোষ অবশ্য তাঁর স্মৃতিকথা লেখার বাসনা আর কাজে পরিণত করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে এ দু'টি ঘটনার কথাই তাঁরা জানেন, তবে বাইরে এর প্রকাশ নেই। এরও অনেকদিন পরে কোনো একটি বইয়ে স্যার আশুতোষকে যে এক সময় বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে আইন-সদস্য করার প্রস্তাব হয়েছিল, এ কথা পড়েছি। সে বইটির নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

পূর্বেই বলেছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব কাজে পরিণত হতে অনেক দিন লেগেছিল। ১৯২১ সনের জুন মাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। এর কয়েক মাস পূর্বে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক রেজিস্ট্রার ফিলিপ হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। এদেশে এসেই তাঁর প্রথম কাজ হল— এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এবং নিয়মকানুন প্রণয়ন করা। অধ্যাপক পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। বেতনের হার ছিল এরূপ: প্রোফেসার (Professor) ১০০০৲-১৮০০৲; রীডার (Reader) ৬০০৲-১২০০৲। বলা বাহুল্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার এবং এমন-কি অধ্যাপকের বেতনের চেয়ে এই বেতনহার ছিল অনেক বেশী। সুতরাং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই ঢাকায় চাকুরির জন্য আবেদন করেন। আমি একদিন স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললাম যে আমার বাড়ির সকলের ইচ্ছা ঢাকায় চাকুরির জন্য আমিও দরখাস্ত করি। তবে আপনার মতামত না নিয়ে নিজে কিছুই করব না স্থির করেছি। স্যার আশুতোষ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখো, ঢাকায় অনেকেই দরখাস্ত করেছে এবং চাকরিও পাবে। আমি তাতে বাধা দিতে চাই না। কারণ তোমরা যদি অনেকে ঢাকায় গিয়ে অধ্যাপনা করো, তা হলে আমি বলতে পারব যে Calcutta University is the Grandmother of Indian Universities। কিন্তু তুমি যদি দরখাস্ত করো তা হলে প্রোফেসারের জন্যই করতে হবে, রীডারের জন্য করলে রাজী নই।' তখনকার দিনে আঠারশো টাকা বেতনের পদ আমাকে কেউ দেবেন, এমন আশা আমার ছিল না। বললাম, 'আপনি যদি নির্দেশ দেন, তাই করব। তবে এ চাকরি পাওয়ার আশা কম।' স্যার আশুতোষ বললেন, 'তুমি দরখাস্ত লিখে আমায় দিয়ে যাবে।' তাই করলাম। স্যার আশুতোষ বললেন যে, তিনিই সেটি পাঠিয়ে দেবেন। সাধারণ

নিয়ম হল যেখানে কাজ করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মারফতই এ-ধরনের দরখাস্ত পাঠাতে হয়। সুতরাং আমি তাঁর হাতেই দরখাস্তটি দিয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম যে, কেউ কেউ তাঁকে না জানিয়ে দরখাস্ত করেছে এবং তাতে তিনি খুবই রুষ্ট হয়েছেন।

কয়েকদিন পরে রেজিস্ট্রারের কাছে খোঁজ নিলাম আমার দরখাস্তটি পাঠানো হয়েছে কি না। এসব দরখাস্ত রেজিস্ট্রারের অফিস থেকেই যায়, এই নিয়ম। রেজিস্ট্রার বললেন যে, কর্তা আপনার দরখাস্ত নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন; অফিসে তা দেখাননি। আমার ঔৎসুক্য হল যে উনি আমার দরখাস্তর উপর কি লিখেছেন তা জানতে পারা যায় কি না। বহু চেষ্টা করেও তা জানতে পারলাম না। এর ষোলো-সতেরো বছর পরে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছি, তখন খোঁজ করে জানলাম যে এই-সব দরখাস্ত একটি গোপনীয় ফাইলে এক লোহার সিন্দুকে থাকে এবং তার চাবি ভাইস-চ্যান্সেলারের নিজের কাছেই থাকে। আমার পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার যাবার সময় আমাকে দু-তিনটি এরকম চাবি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে আমি আমার দরখাস্তটি বার করতে পেরেছিলাম। পড়ে দেখি স্যার আশুতোষ নিজের হাতে দরখাস্তর উপরে আমার সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করে প্রোফেসার পদের জন্য জোর সুপারিশ করেছেন। স্যার আশুতোষ তখন অমরলোকে। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের এই অজ্ঞাত নিদর্শন দেখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। অনেক পুরনো স্মৃতি আমার মনে জেগে ওঠে। এ কথা এখনও ভুলি নি।

ঢাকায় দরখাস্ত করার কিছুদিন পরে একটি চিঠি পেলাম যে কলকাতার ক্যালকাটা ক্লাবে হার্টগ সাহেবের সঙ্গে আমি যেন দেখা করি। নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে গেলাম। হার্টগ সাহেব আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা ধরনের কথা বললেন। চাকুরি সম্বন্ধে কোনো কথা কিন্তু স্পষ্ট করে বললেন না। এর প্রায় দুমাস পরে একটি চিঠি পেয়ে জানলাম যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছি। ইতিহাস বিভাগে দুটি অধ্যাপকের পদ ছিল; একটি ইউরোপের ইতিহাসের, অন্যটি ভারতীয় ইতিহাসের। ইউরোপের ইতিহাসের অধ্যাপকই বিভাগীয় প্রধান হবেন, এ কথা বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল। যদিও দুই অধ্যাপক পদেরই বেতন এক, তবে বিভাগীয় প্রধানের একটি আলাদা অ্যালাউন্স ছিল; সেটি আমার পাওয়ার কথা নয়। বলা বাহুল্য চারশো টাকা থেকে একেবারে আঠারোশো টাকার গ্রেডে চাকুরি পেয়ে খুবই আনন্দ হল। স্যার আশুতোষকে খবরটি জানাতে গেলাম। তিনি বললেন, 'আমি জানি। তুমি এবং আরো কয়েকজন ঢাকায় নিযুক্ত হয়েছ, সে কথা হার্টগ নিজেই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। তুমি চলে যাচ্ছ, এতে আমি দুঃখিত বটে তবে তোমার উন্নতিতে খুশি হয়েছি। একটি কথা বলে দিচ্ছি, সেখানে

সর্বদা মাথা উঁচু করে কাজ করবে, ভয় করবে না। কখনও নতি স্বীকার করবে না। তোমায় এই আশ্বাস দিচ্ছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তোমার জন্য চিরদিনই খোলা থাকবে। ওখানে যদি কোনো কারণে তোমার থাকা সম্ভব না হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার ঠাঁই হবে— এটা সর্বদা মনে রাখবে।'

স্যার আশুতোষ আমায় অনুগ্রহ দেখালেও, ঢাকায় যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কয়েকটি ব্যাপার ঘটে যাতে আমি খুবই বেদনা অনুভব করি। প্রথমটি হল—এই সময় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর তাঁর নির্ধারিত বার্ষিক চারটি বক্তৃতা দেন। শেষ বক্তৃতার দিন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করে বললেন, 'সম্প্রতি আমি একটি বৃহৎ শিলালিপি (বা তাম্রশাসন) আবিষ্কার করেছি, তাতে অনেক নূতন কথা আছে। আমার বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও সেই শিলালিপি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।' স্যার আশুতোষ এবং আরো কয়েকজন অধ্যাপক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম। ভাণ্ডারকর একটি লুপ্ত পুরাণের ভবিষ্যৎ উক্তি উদ্ধৃত করে যা বললেন তার সারমর্ম হল এই যে, কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা নদীর তীরে হরতগ নামে এক অসুর জন্মগ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি ঋষি এবং তাঁদের শিষ্যদের বাস। এই অসুর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্য নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রয়ে নিয়ে যাবে। যাঁরা অর্থলোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে এই অসুরের আকর্ষণে বৃদ্ধগঙ্গার তীরে যাবেন তাঁরাও ক্রমে অসুরত্ব প্রাপ্ত হবেন। তাঁদের দুর্দশারও অনেক বর্ণনা তিনি করলেন। এ কথা অনেকেরই জানা যে, ঢাকা শহর বুড়ী-গঙ্গার তীরে অবস্থিত। সুতরাং ভাণ্ডারকর যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করেই এই কাহিনীর অবতারণা করেছেন তাতে কারুর মনে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হার্টগকে অসুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা সেখানে যাবেন তাঁরাও অসুরত্ব প্রাপ্ত হবেন এবং তাঁদের অশেষ দুর্গতি সম্বন্ধে যা তিনি বললেন তা শুনে সকলেই তাঁর রুচির খুব নিন্দা করতে লাগলেন। স্যার আশুতোষ গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। তিনি ভাণ্ডারকরকে পরে কিছু বলেছিলেন কিনা জানি না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল: স্যার আশুতোষের ডি. এল. উপাধিপ্রাপ্তির ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু-তিন খণ্ডের এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই তাতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমিও প্রায় এক বছর পূর্বে এই গ্রন্থের জন্য একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলাম। আমার ঢাকায় যাওয়ার পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আমার প্রবন্ধটি এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এর মধ্যে যে ভাণ্ডারকরের হাত ছিল

সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ তিনিই ছিলেন এই খণ্ডের সম্পাদক। স্যার আশুতোষের নামের সঙ্গে যুক্ত এই গ্রন্থখানিতে আমার প্রবন্ধটি না থাকায় খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। এবং সেই দুঃখের আবেগে স্যার আশুতোষকে একটি চিঠিতে ব্যাপারটি জানাই। দু-চার দিনের মধ্যেই জবাব এল। স্যার আশুতোষ নিজের হাতে উত্তরে লিখেছিলেন যে এই ঘটনায় তিনি খুব দুঃখিত এবং বিস্মিত হয়েছেন এবং কেন আমার প্রবন্ধ ছাপা হয় নি তার অনুসন্ধান করছেন। আমার এই প্রবন্ধটি যাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *Journal of the Department of Letters* নামক পত্রিকায় পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়, সে রকম হুকুম তিনি দিয়েছেন। বাস্তবিকই এই পত্রিকার পরের সংখ্যায় (Vol. X) আমার সেই প্রবন্ধ "The Gurjara-Pratiharas" ছাপা হয়।

এবার শেষ ঘটনাটির কথা বলছি। আমার পি. এইচ.ডি-র থিসিস "*Corporate Life in Ancient India*" নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ঢাকায় যাওয়ার পরেই আমি একটি চিঠি পেলাম যে, যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এখন আমার আর কোনো সংযোগ নেই, সেজন্য এই বইয়ের ছাপা খরচ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে আমি যেন বইয়ের সমস্ত কপি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমার পক্ষে তখন ছাপার খরচ বাবদ প্রায় দুহাজার টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ কাজ যে যুক্তিযুক্ত, তা মনে হল না। স্যার আশুতোষের মত নিয়ে এ চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিনা জানি না; তবে আমি এ ব্যাপারটি আর তাঁর কর্ণগোচর করি নি। পুণার ওরিয়েন্টাল এজেন্সির কাছে সামান্য রয়্যালটি নিয়ে এ বইগুলি আমি বিক্রি করে দিই এবং সেই টাকাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপার খরচ শোধ করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার অনেক মধুর স্মৃতি জড়িত ছিল; এবং এখনও আছে। কিন্তু এরূপ কয়েকটি ঘটনা সে সময় আমার পক্ষে খুবই মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষকদের মনোবৃত্তি যেমনই হউক-না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল। আমার পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের পর ছাত্ররা সভা করে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। একটি ক্যাসকেটের মধ্যে সিল্কের উপরে এই অভিনন্দন-পত্র তারা দিয়েছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল। সে-ই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। আমার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল; পরেও তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কাশিমবাজারে একবার তার বাড়িতে অতিথি হয়ে বিপুল রাজসমাদর পেয়েছি।

ঢাকায় যাওয়ার সময় ছাত্ররা আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায়। এর অনেক বছর পরে আমার সম্পর্কে ছাত্রদের মনোভাব কি রকম ছিল, সে কথা একটি

বইয়ে পড়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হই। বইটির নাম *The Autobiography of an Unknown Indian*; লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। এই ছাত্রটির নাম আমার মনে ছিল না। সে লিখেছে যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়বার সময় যাঁকে তারা শ্রেষ্ঠ মনে করত, তিনি ঢাকায় চলে গেলেন এবং আমার নামও সে উল্লেখ করেছে। আমার এই অজ্ঞাত ছাত্রটির পরিচয় পরে জানতে পারি। নীরদ এখন খ্যাতিমান পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট লেখকরূপে পরিচিত। তার সঙ্গে অবশ্য এখন আমার কোনো যোগাযোগ নেই।

এই রকম অপরিচিত ছাত্রের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পাওয়া শিক্ষকমাত্রেরই কাম্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রদের মনে আমার সম্পর্কে এমন মনোভাবের পরিচয় এক অপরিচিত ছাত্রের লেখায় রয়ে গেছে, এ কথা ভেবেও এখন আনন্দ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

১৯২১ সালের পয়লা জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। তার ২।৩ মাস পূর্বেই ফিলিপ হার্টগকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হয়েছিল, কারণ অধ্যাপক নিয়োগ, নিয়মপ্রণালী-প্রণয়ন এবং অন্যান্য অনেক ব্যবস্থা আগে থাকতে না করলে পয়লা জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্ভব হত না। হার্টগ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক রেজিস্ট্রার ছিলেন। তাঁকে মাসিক চার হাজার টাকা বেতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে নিয়োগ করা হল। পাঁচ বৎসর কার্য শেষে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয়। স্যার ফিলিপ হার্টগ অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমাবধিই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চিন্তা ও পরিশ্রম করতেন। তিনি যে-সব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তী কালে তারই ফলে ঢাকা বিশ্বিদ্যালয়ের অনেক রকম উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। সাধারণত এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব দোষ ত্রুটি দেখা যায় তার অনেকগুলি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেনি তার জন্য হার্টগের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। এদেশে এসে প্রথমেই তিনি নিজেই কয়েকজন প্রফেসার বা অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। মোটামুটি প্রধান প্রধান কয়েকজন অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি মে মাসে তাঁদের ঢাকায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন-কানুন তৈরি করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোটি সাধারণভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ও তার সঙ্গে যে প্রথম স্ট্যাটিউট বিধিবদ্ধ হয় তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু ঐ অ্যাক্ট ও স্ট্যাটিউটেই নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ের জন্য অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশন তৈরি করার ব্যবস্থা ছিল। হার্টগ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকদের নিয়ে এই সব তৈরি করার জন্যই মে মাসে ঢাকায় আমাদের আমন্ত্রণ করেন। পাঠ্যসূচী নির্ণয়, লেকচারার নিয়োগ, পরীক্ষার নিয়মপ্রণালী, বিদায় ও অবসর গ্রহণের নিয়ম, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় এই কমিটিতে আলোচিত হয় এবং প্রথমে সেই অনুসারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। তারপর বহুবার নির্ধারিত প্রণালী অনুসারে এই অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

এই মিটিং শেষ করে আমি আবার কলকাতায় ফিরে আসি। তারপর জুন মাসের শেষে আবার ঢাকা যাত্রা করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন

শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই একসঙ্গে নতুন কর্মস্থলে যাত্রা করেন। আমাদের দলে সত্যেন বসু, নলিনী বসু, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন। আমাদের যাওয়ার কিছুদিন পরে জ্ঞান ঘোষ বিলেত থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পূর্বে ঢাকা শহরে ঢাকা কলেজ নামে একটি সরকারী কলেজ ছিল; সেখানে এম. এ. পর্যন্ত পড়ান হ'ত। আর একটি বেসরকারী কলেজ ছিল—জগন্নাথ কলেজ। সেখানে বি. এ. পর্যন্ত পড়ান হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই দুই কলেজে মাত্র ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস রইল; বি.এ., এম.এ. ক্লাস উঠে গেল। কারণ একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দুই ক্লাসের শিক্ষা ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে ঐ দুই কলেজের শিক্ষকদের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করা নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সরকারী কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয়। তাঁদের বেতন ও চাকুরির অন্যান্য সুবিধা পূর্বের মতোই অব্যাহত থাকে। জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন শিক্ষককেও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দুইটি পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। একদল সরকারী চাকরে; এঁদের মধ্যে দু'জন আই. ই. এস. এবং বাকী কয়েকজন প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক। এঁরা ছাড়া আর সকল শিক্ষকই হলেন সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাঁদের বেতন, বিদায় ও অবসরগ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে হত। পুরনো ঢাকা কলেজের শিক্ষকরা নবাগতদের ভাল চোখে দেখতেন না; বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় তাঁদের পদমর্যাদা অনেকটা কমে গেছে—এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে এই দুই দলের মধ্যে কোনদিনই একেবারে সম্পূর্ণ মিলন হয়নি। তবে সরকারী শিক্ষকদের সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষকদের দল সংখ্যায় এত বেশি হয়ে পড়ে যে এই দু'টি পৃথক শ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল সেটি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়।

ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে রমনার মাঠ নামে একটি বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগ এবং ঢাকা শহর পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হওয়ায় এই রমনার মাঠে নতুন শহর পত্তন করে বড় বড় সরকারী দপ্তর এবং কর্মচারীদের বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর অনেক বাড়ি তৈরি হয়। প্রত্যেক বাড়িতেই বড় বড় কম্পাউন্ড, বাড়িগুলিও ফাঁকা ফাঁকা; প্রশস্ত এবং সুপরিকল্পিত রাস্তা। বঙ্গবিভাগ রহিতের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহর আর রাজধানী রইল না। পরে নতুন তৈরি সেক্রেটারিয়েট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও আর্টস বিভাগ স্থাপিত হয় এবং সরকারী কর্মচারীদের বাসভবনের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বসবাসের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিলেন। অবশ্য জজ,

ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী রমনার পাঁচ সাতটি বাড়ি দখল করে রইলেন। তাঁদের ইচ্ছে ছিল বাকী বাড়িগুলিতেও ইংরেজ অধ্যাপকরা থাকবেন। কিন্তু যে কয়েকজন ইংরেজ অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন, তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করার পরেও অনেক বাড়ি ফাঁকা পড়ে ছিল। কলকাতা থেকে গিয়ে আমরা সেগুলিতে থাকার জন্য দাবি করলাম এবং অনেক গোলমালের পর আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে এই সব বাড়ি দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে ঢাকায় গিয়ে এরকম সুন্দর বাড়িতে থাকায় যে খুবই আরাম এবং আনন্দ লাভ করেছিলাম তা বলা বাহুল্য। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কিছুদিন পরে গভর্নরের তিনজন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারের জন্য তিনটি বড় বাড়ি তৈরি হয়। সদস্যদের নামানুসারে এই বাড়ি তিনটির নাম ছিল বর্ধমান হাউস (বর্ধমানের মহারাজার থাকার জন্য), সামসুল হুদা হাউস এবং হুইলার হাউস। বর্ধমান হাউসের দোতলাটি আমাকে দেওয়া হয়। এর মধ্যে সাতটি ঘর—একটি তো প্রকাণ্ড হল; বাকী ঘরগুলিও বেশ বড় বড়। বাড়িতে ফুলের বাগান, শাকসব্জী লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। এ ধরনের বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম।

প্রথমেই এক দুর্দৈব ঘটল। ১৯১৯ সনের নতুন আইন অনুসারে বাংলা দেশের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয় একজন এ-দেশীয় মন্ত্রীর উপর। প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হলেন প্রভাসচন্দ্র মিত্র। তিনি মন্ত্রী হয়েই আদেশ দিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যে বেতনে নিযুক্ত করা হয়েছে বাংলা সরকার তা বহন করতে অক্ষম। সুতরাং এ বেতন কমিয়ে দেওয়া হোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হওয়ার পর থেকে ভারত সরকার প্রতি বছর এর জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রাখতেন। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় দেখা গেল যে এর রিজার্ভ ফাণ্ডে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা জমেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই টাকার দাবি করা হয়। বাংলা সরকার বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে যে-সব বাড়ি দেওয়া হয়েছে, সে ঐ পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার বিনিময়ে। হার্টগ সাহেব ভারত সরকারকে এ বিষয়ে জানালেন। কারণ ভারত সরকারের অনুমতি নিয়েই শিক্ষকদের বেতনের হার স্থির করা হয়েছিল। ভারত সরকার জানালেন যে, এ বিষয়ে তাঁরা নিরুপায়। নূতন শাসনবিধি অনুসারে বাংলা সরকারকে তাঁরা কোন রকম আদেশ দিতে পারেন না। এর পর বাংলা সরকার বললেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এবং তার মধ্যেই সব খরচ চালাতে হবে। এর ফলে শিক্ষকদের বেতনের হার কমিয়ে দিতে হল। অধ্যাপকদের (Professor) বেতন ছিল ১০০০৲—১৮০০৲। সেটি কমিয়ে করা হল ১০০০৲। এভাবে সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন অনেক কমে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাতে ইতিহাস বিভাগের জন্য দুজন অধ্যাপকের কথা ছিল—একজন ইউরোপের ইতিহাসের, অন্যজন ভারতীয় ইতিহাসের। আমি ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলাম। স্থির

ছিল ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপকই ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ হবেন। এই পদে একজন ইংরেজ নিযুক্ত হবেন, এমন ধারণা ছিল। এ কারণে বিভাগীয় অধ্যক্ষের জন্য দু'শ পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত ভাতা নির্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপকের মাইনে কমে ১০০০৲ স্থির হওয়ায় ইংরেজ অধ্যাপক আসার আর কোন সম্ভাবনা রইল না। সুতরাং আমিই একমাত্র অধ্যাপক হওয়ায় ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ হলাম। তখন আমি অধ্যক্ষের জন্য নির্দিষ্ট অতিরিক্ত ভাতা দাবি করি। কিছুদিন গোলযোগের পর তা আমাকে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরে প্রত্যেক ফ্যাকাল্টির জন্য একজন 'ডীন' (Dean) নির্বাচনের কথা ওঠে। আর্টস বিভাগে দর্শন-শাস্ত্রের একজন ইংরেজ অধ্যাপক এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—এ'দের দুজনের মধ্যে একজন ডীন হবেন এমন কথা উঠল। নবনিযুক্ত অধ্যাপকদের অনেকেরই বয়স খুব কম। ইংরেজ অধ্যাপককে এই পদে বসাতে তাঁরা রাজী নন। শাস্ত্রী মহাশয় অতি বৃদ্ধ। তিনি ইংরেজ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে পারবেন না, এই ভেবে এই তরুণ অধ্যাপকেরা আমাকে এই পদে মনোনীত করলেন। তিনজনেই প্রার্থী ; কাজেই শেষ পর্যন্ত ভোট নিতে হল। ভোটে জয়লাভ করে আমিই ডীন নির্বাচিত হলাম, তখন আমার বয়স মাত্র তেত্রিশ। নির্বাচনের পর শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে বললাম যে, তিনি যেন এই নির্বাচনকে তাঁর প্রতি আমার কোনরূপ অশ্রদ্ধা বলে না মনে করেন। আরও অনেকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু তিনি আমার উপর খুবই বিরূপ হয়েছিলেন। ইংরেজ অধ্যাপক ল্যাঙ্গলিও মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই নির্বাচনের অল্প দিন পরে আমি কলকাতায় আসি। সে-সময় কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাকে দেখেই তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, 'করেছ কি! তোমার ডীন নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এদিকে তো হুলস্থুল।' আমি বললাম, 'ব্যাপার কি? তার সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কি?' তিনি বললেন, 'সিণ্ডিকেটের সভা কেবল আরম্ভ হয়েছে এমন সময় একজন এসে খবর দিল যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে হারিয়ে তুমি ডীন নির্বাচিত হয়েছ। শুনেই কর্তা (অর্থাৎ স্যার আশুতোষ) তো একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। খুব খুশী। সবাইকে বললেন, শাস্ত্রী আমার সঙ্গে লাগতে আসে ; আমার এক ছোকরা শিষ্যের কাছেই সে নিজে হেরে গেল। এ নিয়ে আরও অনেক কথা তিনি বলতে থাকেন। সেদিন সিণ্ডিকেটের সভা আর ভাল করে হলই না।'

স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে এই নির্বাচনে আমার জয়লাভের জন্য তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করে আমায় উপদেশ দিলেন যে, কখনও ভয় করবে না, যা উচিত মনে করবে তাই করবে। সব শেষে আবার স্মরণ করিয়ে

দিলেন যে ওখানে কোন গোলমাল হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা চিরদিনই আমার জন্য খোলা থাকবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন সেনেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল তেমনি কোর্ট; আর সিণ্ডিকেটের বদলে ছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। তবে সেনেটের চেয়ে কোর্টের ক্ষমতা ছিল অনেকটা কম এবং সিণ্ডিকেটের মতো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অতটা কোর্টের অধীন ছিল না। বছরে দু'বার কোর্টের অধিবেশন হত; সভ্যদের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন মুসলমান এবং অর্ধেক হিন্দু। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসারেরা পদানুরোধে কোর্টের সভ্য ছিলেন। বার লাইব্রেরীর অনেক উকিল রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এর সভ্য হয়েছিলেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যে হিন্দুরা ভাল চোখে দেখেননি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল বঙ্গবিভাগ রহিত করায় মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে অনেকটা তা পূরণ করার জন্যই এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে হিন্দু শিক্ষকেরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন তথাপি কোর্টের হিন্দু সভ্যরা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রীতির চোখে দেখেননি। বাইরে এই বিষয়ে যে আলোচনা হত কোর্টের সভায় হিন্দু সভ্যদের বক্তৃতায় তা প্রতিধ্বনিত হত। রমনার যেসব বড় বড় বাড়ি দখল করে আমরা শিক্ষকেরা বাস করছিলাম এটাতেই তাদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। একবার তাঁদের একজনকে বলেছিলাম যে আমরা না এলে এ বাড়ি তো আপনাদের দিত না। সুতরাং হিংসা করেন কেন? কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। কোর্টের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক প্রস্তাব ও বক্তৃতা হত। হার্টগ সাহেব সভাপতি থাকতেন। আমাদের কয়েকজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ সমর্থন করার জন্য বাক্‌যুদ্ধে নামতে হত। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই এ বিষয়ে তেমন দক্ষতা ছিল না। প্রধানতঃ তিন বিভাগের 'ডীনকে'ই—বিজ্ঞানের জেঙ্কিন্স সাহেব, আইনের ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আর্টসের আমি—কোর্টের অন্য সদস্যদের বক্তৃতার জবাব দিতে হত। অবশ্য ভোটের সময় জয়লাভের ব্যাপারে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কারণ মুসলমান সভ্যেরা আমাদের পক্ষেই থাকতেন। মুসলমান এবং শিক্ষক সদস্যরা একত্রে সংখ্যায় হিন্দু সভ্যদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আশংকা করেছিলেন যে, হিন্দু মুসলমান শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে হয়তো একটি সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের হাতে। এর সভ্য ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলার, (সভাপতি), কোষাধ্যক্ষ, ডিভিশনাল কমিশনার, তিন জন ডীন, তিন জন প্রোভোস্ট এবং মনোনীত আরও ৮।১০ জন ব্যক্তি। কিন্তু এমন নিয়ম ছিল যে, ভাইস-চ্যান্সেলার, কোষাধ্যক্ষ এবং কমিশনারকে বাদ দিয়ে বাকী সভ্যদের অর্ধেক

হবেন হিন্দু এবং অর্ধেক মুসলমান। অর্থাৎ ডীন ও প্রোভোস্টদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি হিন্দু হলে মুসলমান সভ্য মনোনয়নের দ্বারা সংখ্যা সমান করা হবে। সমানসংখ্যক হলেও যে তিনজন ইংরেজ সভ্য ছিলেন তাঁরা মুসলমানদের পক্ষে হবেন, এটাই সকলে ধরে নিতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মাত্র বিষয় ছাড়া এ রকম বিরোধ বড় একটা দেখা দেয়নি। এই বিরোধের বিষয়টি হল শিক্ষকনিয়োগ। অনেক সময় দেখা যেত যে, অধিকতর উপযুক্ত হিন্দু প্রার্থী থাকাসত্ত্বেও মুসলমানকে নিযুক্ত করার জন্য মুসলমান সভ্যরা চেষ্টা করছেন এবং অনেক সময় তাঁরা সে কাজে সফলও হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি। বলেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উৎকর্ষ নির্ভর করে তার শিক্ষকমণ্ডলীর উপরে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ মুসলমান ছাত্রদের কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং যোগ্য শিক্ষক যদি নিযুক্ত না হয় তাহলে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষেই তা পরিণামে অনিষ্টের কারণ হবে। এর উত্তরে তাঁরা যা বলতেন সেটিও খুবই বিচার বিবেচনা করে দেখার মতো। তাঁদের মতে প্রধান প্রধান অধ্যাপক (Professor, Reader) নিয়োগের বেলায় সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্নই তোলা উচিত নয়। গুণানুসারে যাতে যোগ্যতম ব্যক্তিই নিযুক্ত হন তা তাঁরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেলায় কতকাংশে নিকৃষ্ট হলেও তাঁরা একমাত্র মুসলমানকেই নিযুক্ত করতে চান। তার কারণ এই যে, বাংলা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, মুসলমানদের অবনতির একটি প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অভাব। তাঁদের মধ্যে কিছু জমিদার আছেন; বাকী সবই কৃষক। হিন্দুদের মধ্যে যেমন শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যবিত্ত লোকেরাই সমাজের শীর্ষস্থানে রয়েছেন তাঁরাও তাই নিজেদের সমাজে করতে চান। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষক দিয়েই তা আরম্ভ করতে হবে। এ যুক্তি একেবারে অসার নয়। তবে এ কতটা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের মনোভাব এবং মতামত জানা প্রয়োজন বলেই এ-কথা লিখলাম।

শিক্ষক এবং কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা গেলেও অন্য কোন বিষয়ে মুসলমান সদস্যেরা কোন প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির অন্তরায় হতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরীক্ষার ব্যাপারটি উল্লেখ করা যায়। পরীক্ষার ব্যাপারে মুসলমান ছাত্রদের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাবার চেষ্টা তাঁরা করেননি। প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ঢাকার নবাব বংশের নাজিমুদ্দীনের ভ্রাতা সাহাবুদ্দিনের পুত্র ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল; অল্প কয়েক নম্বরের জন্য সে অনার্স পায়নি। তখন হিন্দু ও মুসলমান অনেক শিক্ষক এবং এমনকি বাইরের লোকও বলেছিলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপার অসম্ভব হত। বাস্তবিকই পরীক্ষার বিষয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই সুনাম ছিল এবং আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আদর্শ এবং উচ্চ মান স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তা বিরল। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য বা নম্বর বাড়ানোর জন্য কেউ কোনদিন দরবার করেছে— এ দৃষ্টান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

পরীক্ষা-বিষয়ে ঢাকায় হার্টগ সাহেবের নির্দেশে কয়েকটি নিয়ম চালু করা হয়। যেমন, অনার্স ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রত্যেক পেপার দু'জন পরীক্ষক দেখতেন। উত্তরপত্রে কোন নম্বর দেওয়া হত না। পরীক্ষকেরা উত্তরপত্রের প্রত্যেক প্রশ্নের নম্বর আলাদা কাগজে লিখে বিভাগীয় প্রধানের কাছে পাঠাতেন। দু'জন পরীক্ষকের দেওয়া নম্ববের মধ্যে শতকরা দশের বেশি পার্থক্য দেখা গেলে সেই উত্তরপত্রটি তৃতীয় আর একজন পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হত। তাছাড়া মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। যারা অল্প নম্বরের জন্য পাশ করতে পারেনি কিম্বা উচ্চতর বিভাগে যেতে পারেনি এই মৌখিক পরীক্ষার ফলের দ্বারা সেইসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফল নির্ধারিণ করা হত। এছাড়া সারা বছর টিউটোরিয়াল ক্লাস হত। তার ফলাফলও বিবেচিত হত। মৌখিক পরীক্ষার পর পরীক্ষার ফল চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিণের সময় বাইরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক উপস্থিত থাকতেন। এই সব কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণের প্রণালী ও আদর্শ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটা ভিন্ন ধরনের হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরাও পরীক্ষাসম্পর্কে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সততাসম্বন্ধে বরাবরই উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

পরীক্ষার ন্যায় পাঠ্যসূচী-বিষয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু নূতন প্রণালী অনুসরণ করা হয়। প্রথমতঃ, এম. এ.-র পাঠ্যতালিকায় অতি আধুনিক অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালেব ইতিহাস বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি যখন এটি প্রথম প্রস্তাব করি তখন অনেকেই এর বিপক্ষে ছিলেন। তাঁদের মত ছিল এই যে, এত নিকটবর্তী কালের কোন ঘটনাসম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আমি এর প্রতিবাদে বরাবর বলেছি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রাবস্থা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসের ১৮৭৮ সালের পরবর্তী ঘটনা ছাত্রেরা কিছু পড়েনি বা জানে না এবং আমেরিকার মতো এত বড় দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাদের নেই। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলে বর্তমান জগতে বাসের জন্য আমাদের জ্ঞানের পরিধি যতটা বিস্তৃত হওয়া নিতান্ত দরকার তার অন্ততঃ কিছু পরিমাণ শিক্ষা হবে। যতদূর জানি, এর অনেক বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ.-র পাঠ্যসূচীতে এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও অবশ্য প্রথমে এর খুবই বিরোধী ছিলেন।

ইতিহাস বিভাগে আর একটি নূতন নিয়মপ্রণালী আমি প্রবর্তন করি। যেসব ছাত্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ত তাদের কিছু কিছু প্রাচীন ভারতের মুদ্রা ও লিপির পরিচয় জানতে হত। এম. এ.-র মৌখিক পরীক্ষার সময় এই ধরনের লিপি ও মুদ্রা পরীক্ষার্থীদের সামনে রেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করা হত। যতদূর মনে পড়ে এর জন্য কিছু নম্বরও নির্দিষ্ট ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটি একটি আবাসিক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয়। সমস্ত ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে হত। কারণ এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিকার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি তিনটি ছাত্রাবাস ছিল। পুরনো ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের নামানুসারে দুটি ছাত্রাবাসের নাম হয়—ঢাকা হল (Dacca Hall) এবং জগন্নাথ হল (Jagannath Hall)। জগন্নাথ হলে দুশ এবং ঢাকা হলে প্রায় দেড়শ' হিন্দু ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয় ছাত্রাবাস মুসলিম হলে প্রায় তিনশ' ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পুরনো ঢাকা কলেজের হোস্টেলে 'ঢাকা হল' হয়। আর দুটি হলের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব ছাত্র এই তিনটি ছাত্রাবাসে থাকত না, তাদের প্রত্যেককে হিন্দু হলে ঢাকা কিম্বা জগন্নাথ হলে, আর মুসলমান হলে মুসলিম হলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হত। অর্থাৎ প্রত্যেক হলে যে সব অনুষ্ঠান হত, তাতে যে কেবল তাদের যোগ দেবার অধিকার ছিল তা নয়, এটা তাদের অবশ্য-কর্তব্য বলে গণ্য হত। প্রত্যেক হলের জন্য একজন প্রোভোস্ট (Provost) এবং তাঁর অধীনে দু'জন হাউস টিউটর (House Tutor) ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককেই কোনো না কোনো হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। এঁদের কর্তব্য ছিল প্রত্যেক হলের ছাত্রদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা, তাদের নানা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের সব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। হলে যেসব ছাত্র থাকত তাদের সম্বন্ধে সকল রকম ব্যবস্থা করাই ছিল হাউস টিউটরদের প্রধান কাজ। এঁরা ছাত্রদের খাওয়া দাওয়া তদারক করতেন, রাত্রে নাম ডেকে দেখতেন সকলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে হলে ফিরেছে কিনা। কাউকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত দেখলে তার নামে রিপোর্ট করতেন। প্রোভোস্টদের কর্তব্য ছিল কলেজের অধ্যক্ষের অনুরূপ। তবে লেকচার প্রভৃতি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটোরিয়াল ক্লাসের কথা পূর্বেই বলেছি। প্রথম প্রথম এই ক্লাসগুলি হলেই নেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাতে নানা অসুবিধা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়েই টিউটোরিয়াল ক্লাস নেওয়া হত। প্রত্যেক হলে একটি বড় সভাকক্ষ (lecture hall) ছিল এবং এই কক্ষে একটি উচ্চ মঞ্চও ছিল। এই কক্ষে ছাত্রদের নানারকম সভা এবং নাট্যাভিনয় হত। হলগুলি ছিল খুব বড়; তাতে প্রায় ছ'সাতশ' লোকের বসবার জায়গা হত।

স্বাধীনতালাভের পর জগন্নাথ হলের এই সভাকক্ষেই পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার অধিবেশন হত।

জগন্নাথ হলের সভাকক্ষের দু'পাশে অনেকগুলি ছোট বড় ঘর ছিল। সেগুলি প্রোভোস্টের বসবার ঘর, অফিস এবং লাইব্রেরীর জন্য ব্যবহার হত। যেসব শিক্ষক একটি হলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতেন তাদের প্রত্যেককে এক একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক ছাত্রদলের তত্ত্বাবধান করতে হত। সভাকক্ষের পাশের কতকগুলি ছোট ঘরে শিক্ষক ও ছাত্রদের বসবার ব্যবস্থা ছিল; কয়েকটি ঘর আবার অসুস্থ ছাত্রদের থাকার জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বেতনভোগী বড় ডাক্তার ছিলেন। তিনি প্রত্যেক দিন তিনটি হল ঘুরে অসুস্থ ছাত্রর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্বই একটি ঔষধালয়ও ছিল। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ছাত্রেরা সেখানে বিনামূল্যে ঔষধ পেত। প্রত্যেক হলে একটি বড় খাওয়ার ঘর ছিল। জগন্নাথ হলে দুটি পৃথক বাড়ি থাকায় প্রত্যেক বাড়িতে আলাদা খাওয়ার ঘর ছিল। নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই এই ঘরে গিয়ে খেতে হবে। কিন্তু এ নিয়ে দুটি হিন্দু হলে প্রথমে কিছু গোলমাল আরম্ভ হয়। কয়েকটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাত্র অন্য জাতির ছাত্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে খেতে রাজী হল না। জগন্নাথ হলে এই গোলমাল এড়াবার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ছাড়া অন্য সকল জাতির ছাত্রকে দুটি বাড়ির মধ্যে একটিতে জায়গা দেওয়া হত, যাতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা অন্য বাড়িতে পৃথক ভাবে থাকতে পারে। কিন্তু ক্রমে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্য জাতির ছাত্রেরা আন্দোলন শুরু করে এবং একবার সরস্বতী পূজার সময় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ঢাকা ও জগন্নাথ—দুটি হলেই খুব ধুমধামের সঙ্গে সরস্বতী পূজা হত। এই উপলক্ষে যাত্রা ও গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানও হত। পূজায় গোঁড়া ছাত্রেরা আলাদা অঞ্জলি দিত। কিন্তু একবার অন্য ছাত্রেরা আপত্তি জানিয়ে বলল যে, তারা কাউকে পৃথক অঞ্জলি দিতে দেবে না; সকলকে একসঙ্গে অঞ্জলি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার ঘরের কথাও উঠল। তখন আমি ছিলাম জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট এবং ঢাকা হলের প্রোভোস্ট ছিলেন ডঃ (পরে স্যার) জ্ঞান ঘোষ। আমরা দু'জনে পরামর্শ করে আর কোন উপায় না দেখে ছাত্রদের ডেকে বললাম যে, তোমাদের কারুর কোন ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কারে আমরা আঘাত দিতে চাই না। কিন্তু যেহেতু আমরা হলের প্রোভোস্ট এবং সকল ছাত্রই আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, এই অবস্থায় যদি সকল ছাত্র একসঙ্গে অঞ্জলি না দেয় তাহলে আমরাও প্রচলিত প্রথামত ছাত্রদের সঙ্গে একত্র হয়ে অঞ্জলি দেব না। কারণ একদল ছাত্রের সঙ্গে মিলে আমরা অঞ্জলি দেব, আর এক দল তাতে যোগ দেবে না—এটা খুবই বিসদৃশ দেখাবে। আর আমরা তোমাদের সরস্বতী পূজার কোন অনুষ্ঠানে বা ভোজে যোগ দেব না। কিছুক্ষণ এই নিয়ে খুব হৈ চৈ চলল। তারপর ছাত্ররা একসঙ্গে অঞ্জলি দিতে এবং খাওয়ার ঘরে

একসঙ্গে বসে খেতে রাজী হল। তবে প্রথম কয়েক বছর চার পাঁচ জন খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাত্রের জন্য আমরা তাদের থাকবার ঘরে বসেই খাওয়ার ব্যবস্থা করি। পরে এ প্রথা উঠে যায়। ব্রাহ্মণ থেকে নমঃশূদ্র পর্যন্ত সকল জাতির ছাত্র একই ঘরে বসে খেত। এই একত্রে খাওয়ার ব্যাপারটি একটি খুব বড় রকমের সংস্কার বলে আমরা মনে করতাম। কারণ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা একবার ঢাকায় গিয়ে এই ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন যে, তিনি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁকে কোন পাত্রে পানীয় জল দেওয়া হত না। কারণ অন্য ছাত্রেরা তাতে আপত্তি করত। পানীয় জল বন্ধ করা থেকে একেবারে একসঙ্গে বসে আহার করা—পনর কুড়ি বছরের মধ্যে এরকম একটি গুরুতর পরিবর্তন দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন।

প্রত্যেক হলে ছাত্ররা নানারকম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত। এজন্য কয়েকটি আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। যেমনঃ ১। ক্রীড়া (ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, টেনিস) ২। সাহিত্য ও পত্রিকা ৩। বিতর্ক সভা ৪। নাট্যাভিনয় ৫। সমাজ সেবা। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন সেক্রেটারী এবং একটি ছোট কর্মসমিতি প্রতি বছর নির্বাচিত হত। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এবং সাধারণভাবে হলের ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর অতিরিক্ত কর্মসূচী স্থির করার জন্য হল-ইউনিয়ন ও তার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হতেন। প্রোভোস্ট এই হল-ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হতেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। তখন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও আইন ব্যবসায়ী ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ। তিনি জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট নিযুক্ত হন। আমিও জগন্নাথ হলের সঙ্গে শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলাম। তিন বৎসর পরে ১৯২৪ সালে যখন নরেশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ছেড়ে আবার কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেন, তখন আমি জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট পদে নিযুক্ত হলাম। সেই থেকে তের বৎসরকাল অর্থাৎ ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়া পর্যন্ত আমি এই জগন্নাথ হলের প্রোভোস্টের কাজ করেছি। এই কয়েক বৎসর আমার জীবনের একটি স্মরণীয় যুগ বলে মনে করি। কারণ প্রোভোস্ট হিসেবে প্রতি বছর প্রায় দু'তিনশ' নূতন ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটত। ছাত্রদের অনেককেই আমি ভালভাবে জানতাম। তাদের প্রতিটি কর্মসূচীতে সাধ্যমত যোগ দিতাম এবং সাহায্য করতাম। জগন্নাথ হলের সাহিত্য বিভাগের খুব নাম ছিল। জগন্নাথ হল থেকে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তার নাম ছিল 'বাসন্তিকা'। হলের ছাত্র এবং সংযুক্ত শিক্ষকেরা এই পত্রিকায় লিখতেন। সে সময়ে কয়েকজন ছাত্রের রচনা পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হই। আমার এই বিচারশক্তি যে খুব ভ্রান্ত ছিল না, তার প্রমাণ এদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তী কালে সাহিত্যজগতে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের একজন মন্মথ রায়। এর একাঙ্ক নাটক জগন্নাথ হলে অভিনীত হয়েছে। আজ একাঙ্ক নাটক লেখকদের মধ্যে মন্মথ রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত। আর একজন বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্যজগতে আজ বিশেষভাবে পরিচিত। বুদ্ধদেবের কয়েকখানি ছোট নাটক হলে অভিনীত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক। জগন্নাথ হলে থাকতেই সে তার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দেয়। অজিত দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

নাট্যাভিনয়ে জগন্নাথ হলের খুব খ্যাতি ছিল। হলের কয়েকজন ছাত্র পরবর্তী কালে সাধারণ নাট্যশালায় যোগ দিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। সুসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন এবং মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে নিজে অভিনয় করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' এবং আরও কয়েকখানি নাটক তিনি পরিচালনা করেন, আর তাতে নিজেও অংশ গ্রহণ করেন। এগুলি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। জগন্নাথ হলের আর একজন ছাত্র প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে প্রবোধ জগন্নাথ হলের অভিনয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছে। পরবর্তী কালে প্রবোধ কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হয়েছিল।

অভিনেতা হিসেবে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য—সে হল সুদেব বসু। একবার ভারত সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লেখেন যে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জন্য তারা যেন দু'জনকে মনোনীত করেন। আমি এই কাজের জন্য সুদেবকে মনোনীত করেছিলাম এবং সে-ই এই চাকুরি পায়। সুদেব পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ডিরেক্টর হয়েছিল এবং আকাশ বাণীর দিল্লী অফিসে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিল। ঢাকা শহরে জগন্নাথ হলের নাটকের এমনই সুনাম হয়েছিল যে, অভিনয়ের সময় টিকিট প্রার্থীদের মধ্যে অনেককেই বিমুখ করতে হত।

জগন্নাথ হলের সমাজসেবা-বিভাগও খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হত। কয়েকজন সমাজসেবী ছাত্র নানাদিক থেকে এই বিভাগটির যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেছিল। জগন্নাথ হল থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি গ্রামে নিম্ন শ্রেণীর ছেলেদের জন্য এরা একটি নৈশ বিদ্যালয় চালাত। পালাক্রমে দু'জন ছাত্র প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে পড়াত। সমাজ সেবা বিভাগের এ কাজের জন্যই ঐ বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র পরবর্তী কালে ভাল চাকুরী পেয়েছে। এদের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর এক ছাত্র এখন বড় সরকারী চাকুরী করে। আমার সঙ্গে আজও সে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে।

একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল শিক্ষকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকার ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রথম

প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নিয়ম ছিল যে শতকরা সওয়া আট (৮¼%) টাকা শিক্ষকদের মাইনে থেকে কাটা যাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে মোট টাকাটা প্রতিমাসে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকবে এবং এর সুদও প্রতি বছর মূল টাকার সঙ্গে যোগ করা হবে। প্রতি শিক্ষককে অবসর গ্রহণের সময় এই সঞ্চিত টাকা দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়ার পাঁচ ছ' বছর পরে অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষ উভয়েরই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে টাকা দেবার হার কমিয়ে শতকরা সওয়া ছয় করলেন।

যে-সব শিক্ষকেরা আগের নিয়ম চালু থাকার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা দাবী করলেন যে, তাঁরা পূর্বের হারেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে টাকা দেবেন এবং কর্তৃপক্ষকেও সেই হারেই টাকা দিতে হবে; কারণ এটা তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তির একটা শর্ত। পরবর্তী কালে সেটা বদলাবার কোন ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এই নিয়ে ঘোর তর্ক বিতর্ক হয়। ঢাকার গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার শ্রীশশাঙ্ককুমার ঘোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ছিলেন। তিনি বললেন যে এরকম পরিবর্তন করার আইনতঃ অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন ডঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ অনেক পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যে নতুন হারে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা পাবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনিও এই মত প্রকাশ করলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ পরিবর্তনের অধিকার আছে এবং এই নিয়ম হওয়ার পূর্বে যে-সব শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন তাঁরাও এই নিয়ম মানতে বাধ্য। পূর্বে যোগ-দেওয়া শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আমি এ-বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করি এবং এমন মতও প্রকাশ করি যে, প্রয়োজন হলে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াবে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের দু'তিনটি অধিবেশনে এবং অধিবেশনের বাইরেও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক, আলোচনা হয়, কিন্তু আপোষ বা মীমাংসায় কোন পক্ষই সম্মত হননি। তখন নাজিমুদ্দিন সাহেব—যিনি পরে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন—এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি বললেন যে, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে আদালতে মামলা হলে ব্যাপারটা বড়ই দৃষ্টিকটু হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামও নষ্ট হবে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করলেন যে, কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট জেনারেলকে সালিশ মানা হোক এবং আপত্তিকারী শিক্ষকদের একজন এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি তাঁর কাছে দুই পক্ষের বক্তব্য নিবেদন করবেন—এ্যাডভোকেট জেনারেল যে মত দেবেন দুই পক্ষই নির্বিচারে সেটা মেনে নেবেন। এটা হল ১৯২৭-২৮ সালের কথা। আমি তখন জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট। আপত্তিকারী শিক্ষকদল আমাকে

প্রতিনিধি মনোনীত করলেন ; আর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নির্বাচিত করলেন আইন বিভাগের ডীন ডঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এ., ডি. এল-কে।

তখন এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন স্যার.বি. এল. মিত্র। দুই পক্ষের বক্তব্য এবং যুক্তিতর্ক তাঁর কাছে লিখে পাঠান হল। তিনি যে তারিখ ঠিক করে দিলেন সেই তারিখে নগেনবাবু ও আমি কলকাতায় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। স্যার বি: এল. মিত্রকে প্রথমেই আমি বললাম যে, আমি একজন শিক্ষক মাত্র, উকিল নই ; কাজেই আইনের মার প্যাঁচ কিছু বুঝি না এবং তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণও করতে পারব না। তবে সাধারণ যুক্তিহিসাবে শিক্ষকেরা যে কারণে তাঁদের দাবী পেশ করেছেন সেই সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা আপনার কাছে নিবেদন করব। আমাদের বিপক্ষ দলের প্রতিনিধি একজন মস্ত বড় উকিল এবং আইনে বিশেষ পারদর্শী। সুতরাং আইনের টেকনিক্যাল কোন প্রশ্নের জবাব আমি হয়তো দিতে পারব না ; সেটা আপনি আমাদের তরফ থেকে পরীক্ষা করে দেখবেন। আর সাধারণভাবে কিছু জানবার থাকলে আমি যথাসাধ্য আপনার ও নগেনবাবুর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব। এই বলে আমি পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে সংক্ষেপে আমাদের দাবী ও তার কারণ ব্যাখ্যা করলাম। স্যার বি. এল. মিত্র খুব ধীরভাবে শুনলেন। তারপরে নগেনবাবুকে তার জবাব দিতে বললেন। তিনি প্রায় আধঘণ্টার উপর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের আইনতঃ কি কি অধিকার আছে তার ব্যাখ্যা করলেন এবং পরে বললেন যে এই অধিকারের বলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইনেব পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। আমি তার উত্তরে শুধু একটি যুক্তি পুনরায় নিবেদন করলাম। সেটি হল এই যে, একজনের সঙ্গে যদি কোন চুক্তি হয় এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী যদি সে চাকরি আরম্ভ করে, তখন পরবর্তী ঘটনার দোহাই দিয়ে সে নিয়ম লঙ্ঘন করা চলে কি না, সে বিষয়ে আইনগত ও নীতিগত কোন বিধি আছে কি না সেটাই এখানে বিচার্য। আমার মতে এটা সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ এবং এ রকম নীতিবিরুদ্ধ কোন আইন স্পষ্টতঃ কোথাও লেখা না থাকলে সেরূপ আইনের প্রয়োগ যে যুক্তিসঙ্গত—এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন ; এবং আমার বিশ্বাস যা নীতিবিরুদ্ধ তা এই রকম আইনের মারপ্যাঁচে এড়ান যায় না। তারপরে স্যার বি. এল. মিত্র আমাদের দু'জনকেই নানা প্রশ্ন করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা এইভাবে কাটল। তারপর তিনি আমাদের জলযোগে আপ্যায়ন করলেন। প্রচুর খাবারের আয়োজন ছিল। চা পান করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে তিনি আমাদের বললেন যে, তাঁর মতামত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাবেন।

ফিরে এসে সব কথা বলাতে শিক্ষকগণ খুব খুশী হলেন। বললেন আমাদের পক্ষে যা বলবার তা আমি বেশ ভালভাবেই বলেছি। নগেনবাবু কিন্তু এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সদস্যদের বললেন যে, স্যার বি. এল. মিত্রের কথাবার্তায়

তিনি তেমন সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কেননা তিনি আইনঘটিত তর্ক বিতর্ককে বেশি আমল না দিয়ে আমার সাধারণভাবের যুক্তি তর্ক বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। প্রায় পনের কুড়ি দিন পরে স্যার বি. এল. মিত্র তাঁর মতামত জানালেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে আমাদের পক্ষেই রায় দিলেন।

এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহলে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আমিও শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক সাধুবাদ ও প্রশংসা পেলাম। এমন কি পাবলিক প্রসিকিউটার শশাংকবাবু এই প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, 'ভাগ্যে আপনি উকিল হননি, নইলে আমাদের অন্ন মারা যেত। আপনি বড় উকিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে অতবড় আইনজীবীর কাছে জিতে এলেন। এখন আমাদের আপত্তির কিছু নেই। যা চেয়েছেন তাই পাবেন। আশা করি এই দ্বন্দ্বের কথা আপনারা কেউ মনে রাখবেন না।' আমি তাতে সানন্দে সম্মতি দিলাম। এভাবে এই অপ্রীতিকর গৃহবিরোধের মীমাংসা হল।

গবেষণা বিদেশযাত্রা ও দেশভ্রমণ

ঢাকায় গিয়ে আমি ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা পুনরায় আরম্ভ করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার অল্প কিছুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আমার প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১৯১৪ সাল)। এই সময় আমি এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলাম এবং এর কিছুদিন পরেই যে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় আমি সোসাইটির কাউন্সিলের সভ্য হই তা পূর্বেই বলেছি।

আমার মতো এত অল্প বয়সে কাউন্সিলের সভ্য বড় কেউ হননি। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ছাড়াও আমি *Journal of Indian History, Indian Historical Quarterly, Journal as the Bihar and Orissa Research Society*তে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, ঢাকায় যাওয়ার পূর্বে আমার পি. এইচ. ডি-র থিসিস *Corporate Life in Ancient India* নামে ছাপা হয়।

ঢাকায় যাওয়ার পর হার্টগ সাহেব বললেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে একটি গবেষণা-কেন্দ্র হয়ে ওঠে সেজন্য আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে পথপ্রদর্শকরূপে কিছু বই লিখতে হবে। এর ফলে ১৯২৪ সালে *Early History of Bengal* নামে ছোট একখানি পুস্তিকা আমি প্রকাশ করি। হার্টগ সাহেব নিজে এর প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন। এর প্রায় কুড়ি বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সম্পাদনায় যে *History of Bengal, Vol. I* প্রকাশিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিকে তার সূচনা বলা চলে। ১৯২৭ সালে আমার আর একখানি বই—*Outline of Ancient Indian History and Civilisation* প্রকাশিত হয়। এই বইখানি পরবর্তী কালে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে *Ancient India* নামে বাহির হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এর ছয়টি সংস্করণ হয়ে গেছে এবং পাঠকসমাজে এখনও বইটির চাহিদা আছে।

এই সময় আমার মনে হয় যে গতানুগতিকভাবে এ রকম গবেষণা না করে একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ে গবেষণা করা দরকার। অনেক দিন নানা বিষয়ে চিন্তা করে স্থির করি যে প্রাচীন যুগে ভারতের বাইরে ভারতবাসীরা যে-সব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লেখা খুবই প্রয়োজন এবং এই বিষয়টিই আমি গবেষণার জন্য নির্বাচন করি। একাজে প্রথম বাধা হল যে, যে-সব দেশে ভারতীয় উপনিবেশগুলি ছিল, মালয়, শ্যাম, কাম্বোডিয়া,

আনাম, জাভা, সুমাত্রা—এদের সম্বন্ধে যা কিছু আকর-গ্রন্থ সবগুলিই ফরাসী অথবা ডাচ ভাষায় লেখা। সুতরাং এই দুটি ভাষাই আমি শিখতে আরম্ভ করি। ঢাকায় এ ভাষা শেখবার কোন লোক ছিলেন না। এই দুটি ভাষার ব্যাকরণ ও সহজ সহজ কয়েকটি বই কিনে আমি ভাষা শিখতে শুরু করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমি ছোট ছোট কয়েকটি বই সংগ্রহ করি যার বাঁ দিকের প্রতি পৃষ্ঠায় ফরাসী অথবা ডাচ ভাষায় লেখা এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ ছিল। এই রকম কয়েকটি বই পড়ে এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে আমি সরাসরি ফরাসী ও ডাচ আকর গ্রন্থগুলি পড়তে আরম্ভ করি। প্রায় দু' বছরের চেষ্টায় এই ভাষায় লেখা বই পড়ে বুঝতে পারতাম, কিন্তু উচ্চারণ না জানায় কথা বলতে পারতাম না। কলকাতাতেও এ সময় এই ভাষায় বই বা পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য ছিল। এ সকল বাধা সত্ত্বেও আমি 'চম্পা' নামে (বর্তমান ভিয়েৎনাম রাজ্য) হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড লিখতে আরম্ভ করি এবং ১৯২৭ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ভাগে ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, শিল্পকলা প্রভৃতির আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে যেসব সংস্কৃত লিপি পাওয়া গেছে সেগুলি ইংরেজি অনুবাদসহ প্রকাশ করি। তখন এদেশে এসব বইয়ের কোন আদর ছিল না। লাহোরের মতিলাল বেনারসী দাস এই বই প্রকাশ করার ভার নেন। দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁর দোকান পুড়ে যায়। এই সঙ্গে চম্পা বইটির সমস্ত কপি নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে বহু বৎসর যাবৎ 'চম্পা' আর বাজারে পাওয়া যায় না।

এর পর আমার মনে হল, এ বিষয়ে আরও ভাল করে পড়াশোনা করা দরকার, কিন্তু ভারতের বাইরে না গেলে তা সম্ভব হবে না। হার্টগ সাহেবকে আমার সংকল্পের কথা বলায় তিনি আমাকে প্রথমে ইউরোপে যাওয়ার উপদেশ দিলেন। আমি বললাম যে জীবনে আর হয়তো দ্বিতীয় বার যাওয়া হবে না; সুতরাং ইউরোপ ঘুরে আমি একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাব এবং সেখান থেকে দেশে ফিরব। তিনি আমাকে পুরো বেতনে দশ মাসের ছুটি মঞ্জুর করলেন এবং এই বিষয়ে বিদেশ থেকে বই কেনবার জন্য লাইব্রেরী ফাণ্ড থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দিলেন।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে আমি বিলাত যাত্রা করি। প্রথমে কয়েক মাস লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশোনা করি। সেখান থেকে হল্যাণ্ড যাই; কারণ জাভাসম্বন্ধে সমস্ত বই ও পত্রিকা এবং জাভার পুরাতন জিনিসপত্রের একটি বড় মিউজিয়ামও সেখানে আছে। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে ভোগেল (Vogel) নামে একজন সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন। সম্ভবতঃ হল্যাণ্ড-দেশীয় (আমার ঠিক মনে নেই) তিনি কিছুদিনের জন্য ডিরেক্টর জেনারেলও

হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। তিনি তখন অবসর গ্রহণ করে লাইডেনে (Leiden) ছিলেন। লাইডেনের কার্ন ইনস্টিটিউট (Kern Institute) একটি বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সেখানেই যে-সব বিষয় আমার জানা দরকার তার অনেক উপকরণ আছে। ভোগেলকে চিঠি লিখে আমার ইচ্ছা জানালে তিনি সাদরে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন এবং লাইডেনে একটি ডাচ পরিবারে আমার থাকার ব্যবস্থাও করে দিলেন। এতে আমার ডাচ শেখারও বেশ সুবিধা হল।

কয়েক মাস আমি লাইডেনে ছিলাম। একজন যুবক তখন সেখানে গবেষণা করতেন; তার নাম C. L. Fabri. তখন তিনি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেছেন এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও সামান্য আলোচনা করতেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে 'গম্' ধাতুর অতীত কাল 'গগাম' না হয়ে 'জগাম' হয় কেন? পরবর্তী কালে তিনি ভারতে এসে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার মনে তখনও সন্দেহ ছিল এবং এখনও আছে। পণ্ডিত নেহরুর কৃপায় দিল্লীতে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন। তাঁর সঙ্গে হল্যাণ্ডে আমার সে সময় বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। এদেশেও দেখা সাক্ষাৎ হত। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কার্ন ইনস্টিটিউট থেকে আমি আমার গবেষণার বিষয়ে অনেক নোট করি। সেখান থেকে আবার লণ্ডনে এসে কিছুদিন থেকে আমি প্যারিস যাই। প্যারিসে একটি বড় লাইব্রেরী আছে। দু' একদিন সেখানে গিয়েই ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ফরাসীদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মধ্যে প্রভেদ বেশ বুঝতে পারলাম এবং এই দুই জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কিছু পরিচয় এ থেকে পেলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমি একটি ছোট এ্যাটাচি কেস সঙ্গে নিয়ে যেতাম। তার মধ্যে আমার খাতাপত্র ও অভিধান থাকত। কিন্তু আমার আসা বা যাওয়ার সময় কেউ তা খুলে দেখত না। প্যারিসের লাইব্রেরীতে ঢোকা এবং ফেরার সময় অ্যাটাচি কেস খুলে কি আছে না আছে সব পরীক্ষা করা হত। এ দেখে আমার মনে হল লণ্ডনের লোকেরা সাধারণতঃ সৎ এবং বই চুরি করে না। প্যারিসে চুরি হয়। কেবল প্যারিসের কথা বলি কেন, আমি নিশ্চিত জানি আমাদের দেশে লণ্ডনের মত ব্যবস্থা থাকলে লাইব্রেরীর বহু বই-ই অদৃশ্য হয়ে যেত। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর অবস্থা দেখেছি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কথা শুনেছি। বহু কড়াকড়ি করা সত্ত্বেও প্রতি বছর অনেক বই চুরি যায়। বইয়ের মাঝের অনেক পৃষ্ঠা ছুরি বা সূক্ষ্ম ব্লেড দিয়ে বেমালুম কেটে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যে বিনা পরীক্ষায় এ্যাটাচি কেস নিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাতে বোঝা যায় যে সে-দেশে এভাবে বই চুরি যায় না।

এর আর একটি প্রমাণ পেয়েছি অক্সফোর্ডে। সেখানে এক কলেজ লাইব্রেরীতে

গিয়ে দেখি যে ছাত্রেরা নিজেরাই বই নিয়ে যাচ্ছে; কেবল একটি খাতায় নিজের নাম ও বইয়ের নাম লিখে রাখছে। কে কি বই নিল বা রাখল তা দেখবার জন্য কোন কর্মচারী নেই। আমার তখনই মনে হল ঢাকায় এ রকম ব্যবস্থা থাকলে বছরে অন্ততঃ হাজার দু'হাজার বই যে চুরি যেত তাতে কোন সন্দেহই নেই। এর আর একটি দিকের কথাও মনে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য প্রথম প্রথম বছরে মোট ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এই টাকার একটি প্রধান অংশ (আমার ঠিক মনে নেই—অন্ততঃ দশ পনের হাজার টাকা) দারোয়ান, বেয়ারা ও কর্মচারী নিয়োগ করে বই চুরি বন্ধ করার জন্যই ব্যয় হত। এই টাকাটা যদি বই কেনার জন্য খরচ হত তাহলে লাইব্রেরীতে অনেক নতুন বই আসত। আমাদের দেশে শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এই ধরণের নীতিজ্ঞানের বড়ই অভাব।

লণ্ডনে এই রকম আর একটি দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম। তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। একবার লণ্ডন টাওয়ার দেখতে যাওয়ার সময় পা পিছলে পড়ে যাই। ফলে আমার ডান হাতটি কাঁধের কাছে মচকে যায়। সেটি সারানর জন্য হাসপাতালে যেতে হয়। যে হাসপাতালে যেতাম সেখানকার কয়েকজন ভারতীয় মেডিক্যাল ছাত্র আমার হোটেলে ছিল। তারা আমাকে উপদেশ দিল—'দেখুন, এই হাসপাতালের কোন বাঁধা ধরা ফি নেই। যার যেমন আয় সেই অনুপাতে এরা ফি দাবী করে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে দেশে কত মাইনে পান। আপনি যা পান তার অর্ধেক বলবেন।' হাসপাতালের প্রচলিত ব্যবস্থাটি এমন যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল যে তাদের এই পরামর্শ আমার কাছে আদৌ সমীচীন মনে হয়নি। আমাকে মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করতে ঠিক ঠিকই উত্তর দিলাম যে, এক হাজার টাকা মাইনে পাই; এছাড়া প্রোভোস্টের আড়াইশ' টাকা ভাতা আছে। হিসেব করে ওরা বলল ফি বাবদ আমাকে দু' শিলিং দিতে হবে। তখনকার দু' শিলিং-এর মূল্য ছিল দেড় টাকা বা তার কিছু বেশী। এর জন্য মিথ্যা বলা যে কতদূর অসঙ্গত তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ যখন ভেবে দেখি যে এই ব্যবস্থায় প্রকৃত গরীব লোকের কত সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ডাক্তারী ছাত্রদেরও এ বিষয়ে নীতির কোন বালাই ছিল না।

প্যারিসের কথায় আবার ফিরে আসি। সেখানে আমার পুরাতন বন্ধু মহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে দেখা হল। তিনি অনেকদিন প্যারিসে ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন। বিদেশে গিয়েও কয়েকটি ভারতীয় প্রথা তিনি মেনে চলতেন।

প্রথমতঃ দেখতাম যে, তিনি সর্বদাই একটি 'বদনা' (জলের.পাত্র) সঙ্গে নিয়ে যেতেন। প্যারিসের বাইরে যেতে হলেও বদনাটি সঙ্গে নিতেন। দ্বিতীয়তঃ, মুরগীকে জবাই করা হত না বলে তিনি তার মাংস খেতেন না। শহীদুল্লাহ খুব অমায়িক এবং সাদাসিধা ধরনের মানুষ। ওদেশী ছাত্রেরা তাঁকে খুব পছন্দ করত।

পরে বহুবার আমি প্যারিস গেছি এবং এর কাছাকাছি অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। এই স্মৃতিকথায় তার উল্লেখ করতে চাই না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভার্সাই এবং নেপলিয়নের স্মৃতি-বিজড়িত অনেক স্থান আমি দেখেছি। লুভ্রের বিখ্যাত মিউজিয়াম এবং Palace de la' concorde-এর কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্যারিসের নাটক ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও কিছু কিছু দেখেছি এবং এতে মনুষ্যচরিত্রের সম্বন্ধে অনেক নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদি কখনও সময় পাই প্যারিস ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ লেখার ইচ্ছে আছে।

প্যারিস থেকে ইটালি, জার্মানী, বেলজিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ঘুরে হল্যাণ্ডে আসি এবং সেখান থেকে জাহাজে যবদ্বীপে (জাভায়) পেঁছিই। যবদ্বীপ খুব ছোট জায়গা। দেখতে ঠিক বাংলা দেশের মতো—সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। এখানকার বিখ্যাত বরোবদুর স্তূপ, শৈব লারা জোং রং মন্দির এবং আবও অনেক মন্দির দেখলে এখনও প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির শিল্পকলার নিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যবদ্বীপ থেকে বলিদ্বীপে যাই। এখানে এখনও হিন্দুধর্ম প্রচলিত আছে (অন্ততঃ সে সময়ে ছিল)। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে গিয়ে দেখেছি নৈবেদ্যর থালা মাথায় করে মেয়েরা মন্দিরে আসছে, ধূপ-ধুনা জেবলে পুরোহিত আরতি করছেন। ভারতবর্ষ থেকে আসছি শুনে পুরোহিত (পদন্ড) আমাকে খুব আপ্যায়ন করলেন। কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকও তিনি আওড়ালেন। মন্ত্রগুলি সুপরিচিত; তবে তাঁর উচ্চারণপদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরণের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র বলিদ্বীপেই হিন্দুধর্ম প্রচলিত আছে। তার অনেক নিদর্শন দেখে খুবই ভাল লাগল। অন্য সব জায়গাতে হিন্দুধর্মের নিদর্শন আছে বটে কিন্তু বর্তমানে সেখানে হিন্দুধর্মের কোন প্রতিষ্ঠা নেই।

বলিদ্বীপ থেকে জাভায় ফিরে এসে প্রথমে আনামে যাই। এইখানেই ছিল প্রাচীন হিন্দু চম্পা রাজ্য। এর উত্তরে অবস্থিত আনামের অধিবাসীরা হিন্দুদের পরাজিত করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দেশ অধিকার করে। তখন এর নাম হয় আনাম। বর্তমান কালে এই দেশের উত্তর অংশ ভিয়েৎকং এবং দক্ষিণ অংশ ভিয়েৎনাম বলে পরিচিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় মুসলমান হয়ে গেছে। কয়েক হাজার হিন্দু অবশ্য এখনও আছে।

একদিন এক দুর্গম স্থানে রিক্‌শা করে মন্দির দেখতে চলেছি। পথে আর একটি রিক্‌শার সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমার রিক্‌শাটি উল্টে যায়। আমি গাড়ির নীচে পড়ে যাই। দুই রিক্‌শাওয়ালা তখন ঝগড়ায় মত্ত; আমাকে উদ্ধার করার কথা কারুর মনে হয়নি। অল্প দূরে একটি যুবক দাঁড়িয়ে ছিল; সে এসে আমাকে তুলল এবং জল এনে ময়লা ধুয়ে দিল। আমি যে বিদেশী—তা বুঝতে পেরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'দেশ কোথায়?' বললাম, 'ভারতবর্ষ।' শুনেই

মাথায় হাত ঠেকিয়ে সে বলল, 'La Patrie de Gandhi'—অর্থাৎ গান্ধীর দেশ। ওদেশে তখন ফরাসীদের আধিপত্য থাকায় শিক্ষিত লোকেরা ফরাসী বলত।

আনাম থেকে আমি পার্শ্ববর্তী রাজ্য কাম্বোডিয়ায় যাই। প্রাচীন যুগে আংকোরথোম ছিল প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজাদের রাজধানী। এর পাশে অনেক বড় বড় শহর ও মন্দির তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল আঙ্কোর-ভাট (মন্দির) এবং বেয়নের মন্দির। প্রায় দশ পনের মাইল জুড়ে বিশাল বিশাল মন্দির ও প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে স্থানটি জনহীন প্রান্তর। অধিকাংশ মন্দির জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ফরাসী সরকার সেখানে একটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করেছেন। এর এক অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, এই সব মন্দিরে ঘোরাফেরা করা খুব বিপজ্জনক; কারণ জঙ্গলে খুব সাপ আছে। তিনি যে রবারের বুট পরেছেন দেখালেন—তা দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। ফরাসী সরকার অনেকগুলি মন্দির খুব ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এই সব মন্দির ও শহরের বিস্তৃত বিবরণ সুবর্ণদ্বীপ, কম্বুজদেশ প্রভৃতি আমার কয়েকখানি বই-এ লিখেছি। বড় বই ছাড়া *Hindu Colonies in the Far East* নামে আমার লেখা ছোট একটি গ্রন্থে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এদের মোটামুটি বিবরণ জানতে পারবেন।

কাম্বোডিয়া থেকে মোটরে আমি শ্যামদেশে আসি। শ্যামদেশের বর্তমান নাম থাইল্যান্ড। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। পৌঁছতে তিনদিন লাগল। সকালে বেরিয়ে খাবার পাওয়া যায় এমন জায়গায় দুপুরে গাড়ি থামত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার যাত্রা এবং সন্ধ্যায় খাওয়া এবং রাত্রে থাকার ব্যবস্থা আছে এমন কোন জায়গায় আশ্রয় নেওয়া যেত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম অরণ্য প্রাথাৎ—সংস্কৃত অরণ্য প্রদেশের অপভ্রংশ। বিস্তীর্ণ এই অরণ্যভূমি কাম্বোজ ও শ্যামদেশ—এই দুটি দেশকে পৃথক করে রেখেছে। এ-সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। বহুদিন শ্যাম কাম্বোজের অধীন ছিল। সে সময় কাম্বোজ সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর থেকে চীন সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কাম্বোডিয়া থেকে মলয় উপদ্বীপ হয়ে আমি সিঙ্গাপুরে আসি। সিঙ্গাপুরে একটি প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ছিল। যবদ্বীপ থেকে পলাতক একজন হিন্দু রাজা এই নগরী জয় করে এর নাম রাখেন সিংহপুর। বর্তমানে হিন্দু নিদর্শন এখানে কিছু নেই। তবে এটি একটি খুব বড় শহর এবং এখানে নানাজাতীয় লোকের বাস। সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজে রেঙ্গুনে আসি। কয়েকদিন সেখানেও কাছাকাছি কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখে জাহাজে ভারতে ফিরে আসি। এপ্রিল মাসের শেষে আমি বিলাত যাত্রা করেছিলাম। প্রায় ন' মাস পরে ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরে এলাম।

১৯২৯ সালের প্রথমে ঢাকায় ফিরে এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড (সুবর্ণদ্বীপ) লিখতে আরম্ভ করি।

বিদেশ থেকে এই বিষয়ে লাইব্রেরীর জন্য বই কেনা বাবদ হার্টগ সাহেব যে টাকা দিয়েছিলেন তা দিয়ে আমি প্যারিসে অনেক বই কিনেছিলাম। আমার ফিরে আসার অল্প দিন পরেই সে বইগুলি এখানে এসে পেঁছয়। এই বইগুলির সাহায্য নিয়ে আমিও সুবর্ণদ্বীপ লিখতে আরম্ভ করলাম। বইটি শেষ করতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল। ইচ্ছা ছিল এই প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস-বিষয়ে ঢাকায় একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলব। কেননা যেসব বই আমি বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম তা এদেশে খুবই দুর্লভ। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে এর প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে যখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এই বিষয়টির পঠন-পাঠন আরম্ভ করি তখন বইয়ের অভাব বিশেষ করে অনুভব করেছিলাম। তখন দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে আর কোন চর্চা হত না। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মর্মে একটি চিঠি লেখালাম যে, ঐ বইগুলি কিনতে যা খরচ হয়েছিল আমরা তার দ্বিগুণ দাম দিতে প্রস্তুত আছি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন সেগুলি বিক্রি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তাতে রাজী হননি। ফলে এখনও সে বইগুলি ঢাকাতেই আছে; কিন্তু সেখানে এগুলির বিশেষ কোন ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে লড়াইয়ের ফলে যে বইগুলির কি অবস্থা হয়েছে জানি না।

ঢাকায় যে গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছিলাম সেটিও কার্যে পরিণত করতে পারিনি। কারণ এ বিষয়ে গবেষণার জন্য মাত্র একজন ছাত্র রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে আমার কাছে কাজ আরম্ভ করেছিল। সেও কিছুদিন পরে অন্য চাকরি পেয়ে ঢাকা থেকে চলে যায়। তবে সে এখনও এ বিষয়ে চর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং কয়েকটি বইও লিখেছে। তার নাম হিমাংশুভূষণ সরকার— বহুদিন খড়্গপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিল। এখন অবসর নিয়েছে। আর কোন ছাত্র এ বিষয়ে গবেষণার জন্য আগ্রহী না হওয়ার কারণ হল যে এর জন্য প্রথমেই ফরাসী ও ডাচ ভাষা শেখা দরকার এবং প্রধানত এ কারণেই অনেকে পিছিয়ে যেত। সুতরাং আমার মনে হল যে এ কাজটি প্রায় আমার ব্যক্তিগত হয়েই দাঁড়িয়েছে এবং এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য অন্য কয়েকটি বিষয় স্থির করা প্রয়োজন। এই সূত্রে বাংলার ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা আমার মনে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

বাংলার ইতিহাস রচনা

১৯২৪ সালে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটি ছোট বই (*Early History of Bengal*) আমি লিখেছিলাম, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখন কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে একখানি পূর্ণাঙ্গ বাংলার ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। তার মধ্যে দুটি কারণ আপাততঃ উল্লেখ করছি। প্রথমটি হল—সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত নামে একখানি গ্রন্থের পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে এনেছিলেন। এই গ্রন্থখানি ছোট হলেও এর মধ্যে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ আছে, যা এর পূর্বে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু বইখানি কবিতায় লেখা এবং প্রত্যেক শ্লোকের দুই রকম অর্থ হয়। এক রকম অর্থ ধরলে রামায়ণের রামচন্দ্রের কাহিনী। আর এক অর্থে পালবংশীয় রাজা রাম পালের কাহিনী। রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা উদ্ধার এবং রামপাল কর্তৃক পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার—এই দুটি ঘটনা অবলম্বন করেই এই দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকগুলি রচিত হয়েছে।

পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কিভাবে সামন্তচক্রের বিদ্রোহের ফলে নিহত হন ও তাঁর ভ্রাতা রামপাল পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রভূমি থেকে বিতাড়িত হন এবং আবার অনেক সামন্তের সহায়তায় তা পুনরুদ্ধার করেন—এই ঘটনাটি নিয়েই রামচরিত লেখা হয়েছে। শ্লোকের মধ্যে এই বিদ্রোহ ও রাজ্য পুনরুদ্ধারের কথা অস্পষ্টভাবে—অনেকটা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের একখানি টীকায় সেটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় মূল কাব্যখানি পুরোপুরি পাওয়া গেলেও ঐ টীকার এক অংশ মাত্র শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই অংশটুকুর মধ্যেও তিনি এমন অনেক অর্থ বার করেন যা আদৌ মূল গ্রন্থ থেকে অনুমান করা যায় না। তিনি এই বইয়ের ভূমিকায় লেখেন যে রাজা মহীপাল খুব অত্যাচারী হওয়ায় জনগণ তাঁকে বিতাড়িত করে কৈবর্তজাতীয় দিব্য বা দিব্যোক নামে একজনকে রাজা নির্বাচিত করে। স্বদেশী যুগে এই বই নিয়ে খুব আন্দোলন চলতে থাকে। এবং দিব্য একজন মহাপুরুষে পরিণত হন। এমন কি প্রতি বৎসর দিব্যস্মৃতি উৎসব নামে একটি অনুষ্ঠান হত। সেখানে এই দেশপ্রেমিক দিব্যের নামে শ্রদ্ধাঞ্জলিও অর্পণ করা হত। শ্রদ্ধাস্পদ যদুনাথ সরকার ও উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। কিন্তু রামচরিত পুঁথিতে এর কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

বাংলার ইতিহাসের এই অপব্যাখ্যা এবং জনগণের মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হলে রামচরিতের একটি নূতন সংস্করণ সর্বাগ্রে প্রকাশ করা দরকার মনে করে আমি সেই কাজে হাত দিই। তখন ঢাকায় পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহকারী ছিলেন এবং রামচরিত গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। তিনি আমাকেও সাহায্য করতে রাজী হলেন। আমি মূল গ্রন্থখানি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ঢাকায় নিয়ে এলাম এবং পণ্ডিত ননীগোপালের সঙ্গে একত্রে বসে পুনরায় এই গ্রন্থ পাঠ করলাম। ফলে অনেক নূতন তথ্য বেরুল। একটি দৃষ্টান্ত দিই। এই গ্রন্থের টীকায় ছিল যে রামপাল কৈবর্তরাজকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী ধ্বংস করেন। মূল শব্দ কয়েকটি শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করেছিলেন 'ডমরমুপপুরমলাবীৎ' এবং এর অর্থ করেছিলেন যে কৈবর্তরাজের রাজধানী ডমর নামক নগরী রামপাল ধ্বংস করেন। আমি যখন এই অংশটি পাঠ করি তখন দেখি যে, শব্দ কয়েকটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে—'ডমরমুপপ্লবমলাবীৎ'; অর্থাৎ ডমর বা বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। সুতরাং এখানে রাজধানী ডমরপুরের কোন কথাই নেই। অথচ শাস্ত্রী মহাশয়ের বই প্রকাশিত হবার পর কিছুদিনের মধ্যে মালদহ জেলায় ডমরপুর আবিষ্কৃত হয়ে গেল। পণ্ডিত ননীগোপালও স্বীকার করলেন যে শাস্ত্রী মহাশযের পাঠে কিছু ভুল ছিল।

এই রকম ভুল দেখে আমি তাড়াতাড়ি এই বইটির একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হলাম। যখন আমাদের কাজটি অনেকদূর এগিয়েছে তখন খবর পেলাম যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকও রামচরিতের একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করছেন। রাধাগোবিন্দবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি তাঁকে 'ডমরম' দেখালাম। এবং তিনিও আমার পাঠ স্বীকার করলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম যে দুটি আলাদা সংস্করণ না করে যদি তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তাহলে আমরা তিনজনে একটি বই বার করতে পারি। বিশেষতঃ আমি অনেক কষ্টে পুঁথিখানি এশিয়াটিক সোসাইটির মত করিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলাম। রাধাগোবিন্দবাবুর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনিও এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বলল যে এই বইটি তাদের সমিতি থেকেই প্রকাশ করা হবে। আমি অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করব বলেই এ কাজে হাত দিই। অযথা দুটি সংস্করণে শক্তি ও সময় ক্ষেপ না করে তিনজনে মিলে করলে কাজটি অনেক সহজ হবে—এই ভেবে এই প্রস্তাবে আমি সম্মত হই।

এর কিছুদিন পরে রাধাগোবিন্দবাবু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হয়ে চলে গেলেন। সুতরাং বই বার করতে অনেক দেরী হল।

কারণ যে অংশের টীকা ছিল না সেই অংশের প্রায় প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে রাধাগোবিন্দবাবুর সঙ্গে ননীগোপালবাবুর মতভেদ হতে লাগল। যাই হোক, প্রায় সাত বছর পরিশ্রমের পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থ পড়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠের যে অংশ আমরা তিনজনে মিলে ভুল মনে করি সেগুলি এই সংস্করণে দেখান হয়েছে। আর যে অংশের টীকা ছিল না সে অংশের টীকাও যোগ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা ইংরেজী ভূমিকা আমার লেখা। তাতে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের বিভিন্ন মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। মনে হয় এই কারণেই এর পরে দিব্য স্মৃতি উৎসব বন্ধ হয়ে যায়।

ঠিক এইরূপ আর একটি ব্যাপার ঘটল বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ সম্বন্ধে। আচার্য যদুনাথ সরকার প্যারিসে বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী নামে একটি পুঁথির সন্ধান পান এবং তার বিবরণ প্রকাশ করেন। এতে জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলা দেশ জয়ের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় লেখা আছে। যশোহরের প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল সৈন্যবাহিনী যিনি পরিচালনা করেছিলেন এতে তিনি বিস্তৃত ভাবে সেই অভিযানের পুরো বিবরণ দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের শৌর্য ও বীরত্ব সম্বন্ধে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে তার বাস্তবিকই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এ সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *A History of Mughal North-East Frontier Policy* বইটি লেখার জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্যারিসের পুঁথিখানি ফটোগ্রাফ করে নিয়ে আসি এবং কিছুদিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক এই গ্রন্থের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই বইটিতে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়।

এই সব কারণে বাংলাদেশের একখানি সর্বাঙ্গীন ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি এবং এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার সুযোগ পাই। যতদূর জানি ভারতের আর কোন প্রদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস পৃথক ভাবে এর পূর্বে লেখা হয় নি। কিন্তু এই বাংলার ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথা বলা প্রয়োজন। ১৯১২ সালে বাংলা দেশের প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে একখানি বাংলার ইতিহাস লিখবার প্রস্তাব করেন এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এর জন্য একটি পরিকল্পনা করতে বলেন। কলকাতার লাটভবনে এ সম্বন্ধে কয়েকটি সভার অধিবেশনও হয়; কিন্তু কি কারণে জানি না এ সম্বন্ধে কোন কাজই হয় নি।

কয়েক বৎসর পরে কলকাতার রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন যে যদি তিনি এই রকম কোন গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে সেই গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। আরও কয়েকজন ঐতিহাসিকের সঙ্গে পরামর্শ করে এই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা

তৈরী করে সেটি তাঁকে দেবার জন্য তিনি রাখালবাবুকে অনুরোধ করেন। আমিও এই প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু আমাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা কয়েকজন এই প্রস্তাবটি পুনরুজ্জীবিত করি। তখন ইতিহাসের এম. এ. পরীক্ষার জন্য আমরা মাঝে মাঝে আচার্য যদুনাথকে বাহিরের পরীক্ষক হিসাবে ঢাকায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতাম। এই রকম এক উপলক্ষ্যে ১৯৩৩ সালে তিনি ঢাকায় এলে তাঁকে এই প্রস্তাবের কথা বলি এবং তিনিও এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতায় তিনি এরূপ একখানি ইতিহাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যদি প্রয়োজন হয় তিনি যথাসাধ্য আমাদের সাহায্য করবেন।

এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আমার সহযোগী ছিলেন এ. এফ. রহমান। তিনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে তিনি রীডারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মুসলিম হলের প্রোভোস্টও ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বেই আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁর প্রথম কনভোকেশন বক্তৃতাতেও এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর অনুরোধে আমি প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস লেখার কাজ আপাততঃ বন্ধ করে বাংলার ইতিহাস লেখার কাজে বেশী সময় দেব বলে তাঁকে আশ্বাস দিলাম। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই সময় কালিকারঞ্জন কানুনগো ছিলেন ইতিহাস বিভাগের একজন রীডার। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথা পূর্বেই বলেছি। আর একজন ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ছিলেন। এঁদের সহায়তায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশমত বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা তৈরী করি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেটি গ্রহণ করেন। আমার পরিকল্পনা ছিল—তিন খণ্ডে এই ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডে হিন্দু যুগ, দ্বিতীয় খণ্ডে মোগল যুগের পূর্ব পর্যন্ত (১২০০-১৫৭৬) এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল যুগের (১৫৭৬-১৭৫৭) ইতিহাস। আমি প্রথম খণ্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হই এবং স্থির হয় যে আচার্য যদুনাথ দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনা করবেন। এই কাজের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় আমি তার সভাপতি ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যাপারে ব্যয় বহনের আশ্বাস দিলেও এ কাজের জন্য চাঁদা গ্রহণের প্রস্তাব হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক হাজার টাকা এবং বাংলা সরকার এক হাজার টাকা চাঁদা দেন। এইভাবে বাংলার ইতিহাস লেখা শুরু হয়।

বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা শুরু করতে সম্পাদক হিসেবে আমাকে প্রথম

প্রথম বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। এ সব কথা সবিস্তারে লিখলে ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় মন্তব্য করতে হয়; সেজন্য একটু আভাসমাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হব। আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে যখন আচার্য যদুনাথ সরকারকে দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক রূপে নিযুক্ত করা হল তখন এ সম্বন্ধে যে কিছু প্রতিবাদ আসতে পারে, আমি তা ধারণাও করতে পারিনি। কারণ যদুনাথ তখন মুসলমান যুগের প্রধান ঐতিহাসিক বলে দেশে বিদেশে সর্বত্র স্বীকৃত। কিছু দিনের মধ্যেই ঢাকায় এ নিয়ে একটু মৃদু গুঞ্জন শুরু হল। সে সময় আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু পূর্বোক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলেও এর কিছুদিন পূর্বে বাংলার মুসলমান যুগের কতকগুলি মুদ্রা আলোচনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে বাংলার এই যুগের ইতিহাসে অনেক নূতন আলোকপাত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে মুসলমানদের লেখা বাংলার ইতিহাসে এই যুগে রাজা গণেশের উল্লেখ আছে এবং কতকগুলি মুদ্রাতে রাজা দনুজমর্দনের নাম পাওয়া যায়। ভট্টশালী সর্বপ্রথমে এই মুদ্রাগুলির সঠিক তারিখ নির্ণয় করে প্রতিপন্ন করেন যে, রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন একই ব্যক্তি। এই মত আজকাল প্রায় সকল ঐতিহাসিক গ্রহণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসেও (দ্বিতীয় খণ্ড) এই মত গৃহীত হয়েছে। ভট্টশালী মুদ্রা পরীক্ষা করে বাংলার ঐ যুগের কয়েকজন স্বাধীন সুলতানের সঠিক তারিখও নির্ণয় করেন। ভট্টশালীর এই সব গবেষণার জন্য আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তৃতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করার জন্য কোন কলেজে শিক্ষকতার পদ তিনি পাননি বটে, আমি কিন্তু তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের পড়াবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম। এবং এজন্য কিছু পারিশ্রমিকও তাঁকে দেওয়া হত। কিন্তু আচার্য যদুনাথের পরিবর্তে ভট্টশালীকে বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক নিযুক্ত করার প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি নি। তবে এই ইতিহাস লেখার জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল আমি তাতে ভট্টশালীকে সদস্য নিযুক্ত করেছিলাম এবং প্রাক্ মুঘল যুগের বাংলার ইতিহাস লেখার জন্য তাঁর নামই স্থির হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম সমিতিতে গৃহীত না হওয়ায় ভট্টশালী ঐ সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করলেন। এমন কি ইতিহাসের জন্য কিছু লিখতেও তিনি সম্মত হলেন না। এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। ভট্টশালী যে আমার উপর বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন, তা বুঝতে পারি। বহু চেষ্টা করেও তাঁর মতের কোন পরিবর্তন আমি ঘটাতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে ভট্টশালীর সঙ্গে এই বিচ্ছেদের স্মৃতি আজও আমার মনে বেদনার উদ্রেক করে। ভট্টশালী আজ জীবিত নেই বলেই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা আমি বললাম।

আরও দু'একজন লেখকের অধ্যায়গুলি নির্মমভাবে কাটছাঁট করে নিজে পুনরায় তার অধিকাংশ ভাগ লেখার জন্য তাঁরাও আমার প্রতি খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। এঁরাও আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; তাঁদের এমন মনোভাবও আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক হয়েছিল। পরবর্তী কালে আমার জীবনে এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত ঘটেছে যেখানে কর্তব্যের খাতিরে বন্ধুজনের অসন্তোষ জন্মাবে জেনেও বাধ্য হয়ে আমাকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। তার জন্য গভীর দুঃখ পেলেও মনকে চিরকালই এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি এবং এখনও দিই যে বন্ধুপ্রীতির জন্য কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বাংলার ইতিহাস প্রকাশিত হবার পর কয়েকজন অবাঙ্গালী ঐতিহাসিক এরূপ অভিযোগ করেন যে কেবলমাত্র বাঙ্গালী লেখকের দ্বারাই এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য বহু প্রদেশ ও অঞ্চলেরও ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত অবাঙ্গালী ঐতিহাসিক বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন—এমন কথা আমার জানা ছিল না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাংলার শিল্প ও পুরাতত্ত্ব বিষয়টি। ডঃ কাশীনাথ দীক্ষিত বাংলাদেশের শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পাহাড়পুর সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থও তখন প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন শিল্প অধ্যায়টি লেখার জন্য তাঁকে আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি এই ভার গ্রহণ করতে রাজী হননি।

শিল্প অধ্যায়টি পরে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ননীগোপাল মজুমদার লিখতে সম্মত হন। শুনেছি তিনি অনেকটা লিখেও ছিলেন। কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খনন কার্যে নিযুক্ত থাকার সময় আততায়ীর হাতে তাঁর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর পর বহু অনুসন্ধান করেও সে লেখা পাওয়া গেল না। তখন আমি দু'জন তরুণ লেখককে এই অধ্যায়টি লেখার জন্য মনোনীত করি। এঁরা দু'জনেই সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিন মাত্র অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন ; ঐতিহাসিক বা লেখক হিসাবে তাঁদের তেমন কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাঁদের যে অল্প কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তা পড়ে তাঁদের সম্বন্ধে আমার খুব ভাল ধারণা হয়। তখন পরলোকগত স্যার আশুতোষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি এই দুই তরুণকে শিল্প অধ্যায়টি লেখার জন্য আহ্বান করি। তাঁরাও লিখতে রাজী হন। এঁদের নাম সরসীকুমার সরস্বতী ও নীহাররঞ্জন রায়। বাংলার ইতিহাসে শিল্প সম্বন্ধে এই অধ্যায়টি লিখেই তাঁরা সুনাম অর্জন করেন, পণ্ডিত মহলে পরিচিত হন। পরবর্তী কালে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনাক্ষেত্রে তাঁরা যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তা দেখে আমার লেখক নির্বাচন যে সম্পূর্ণ সঙ্গতই হয়েছিল তা ভেবে আমি খুবই আনন্দ পাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে এর বহুকাল পরে এবং এমন কি বর্তমান সময়েও ইতিহাস গ্রন্থে ভারতের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা

করার মতো যোগ্য লেখক বড় বেশী খুঁজে পাওয়া না। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত *History and Culture of the Indian People* গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এদেশে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনায় সকল বিষয়েই লেখার একাধিক উপযুক্ত লোক আছে, কেবল দুটি বিষয়ে ব্যতিক্রম—শিল্প ও ধর্ম। এই দুই বিষয়ে উপযুক্ত লোক খুঁজে বার করতে আমাকে বরাবরই বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের জন্য যে সরসীকুমার সরস্বতীকে নির্বাচিত করেছিলাম ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত ইতিহাসে এবং ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস-পরিকল্পিত ইতিহাসে শিল্প সম্বন্ধে অধ্যায়টি তাঁকেই লিখতে হচ্ছে। এ বিষয়ে আর কোন উপযুক্ত লেখকের সন্ধান আজও আমি পাইনি।

এই সব কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেও কিছুদিন পর্যন্ত আমি একাজে ব্যস্ত ছিলাম। ১৯৪৩ সালে বাংলার ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা অসঙ্গত ; কারণ আমিই এর সম্পাদক ছিলাম। তবে সাধারণভাবে বলতে পারি, প্রকাশ হওয়া মাত্রই বইখানি খুব সমাদৃত হয়, অনেকেই এর প্রশংসা করেন। প্রকাশিত হওয়ার পর তিন চার বছরের মধ্যেই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। এখনও পাঠক সমাজে এই বইয়ের চাহিদা আছে। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের কাছে শুনেছি যে একশ আশী টাকা দিয়ে তিনি এই বইএর একটি পুরনো কপি সংগ্রহ করেছিলেন। এই বই প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের অন্তর্গত হয় এবং আমার অনেক অনুরোধসত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় এই বই ছাপতে রাজী হননি। একবার তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন গ্রন্থটি যেমন আছে ঠিক সেইভাবেই এর পুনর্মুদ্রণ হোক। তাতে আমি আপত্তি জানাই। কারণ প্রথম প্রকাশের পর ২৫/৩০ বছর পার হয়েছে ; এর মধ্যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানা গেছে। সুতরাং বইটির সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যই দরকার। এই প্রস্তাবে তাঁরা সম্মত হননি। কয়েক বছর আগে শুনেছিলাম যে আমেরিকা থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে যথাযথ পুনর্মুদ্রণ করেছে। ঢাকায় পত্র লিখে জানলাম যে খবরটি সত্য ; অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের একখণ্ড আমাকে পাঠানো তারা আবশ্যক মনে করেননি। এই পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থও এখন ভারতে পাওয়া যায় না। তবে আমি একজন আমেরিকানের সাহায্যে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেছিলাম এবং ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে *History of Ancient Bengal* নামে ইহার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করি। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরেশচন্দ্র দাস নামে একটি ছাত্র ছিল—অতি দরিদ্র কিন্তু খুব মেধাবী। পরবর্তী জীবনে

নানা চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে সে একটি প্রেসের মালিক হয়। তাকে সাহায্য করার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাগুলি তার প্রেসে ছাপানর ব্যবস্থা করি। আস্তে আস্তে এই প্রেসটি বেশ বড় হয়ে ওঠে—এর নাম হয় জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। এই প্রেসেই বাংলার ইতিহাস ছাপা হয়। সুরেশ নিজে যত্ন নিয়ে ছাপার যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করায় বইটির ছাপা খুব ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। সুরেশের এই প্রেস এখন খুবই বড় হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে সুরেশকে অন্যতম বলে মনে করি।

যখন আমি বাংলার ইতিহাস সম্পাদনায় ব্যস্ত তখনও ঢাকায় ইতিহাসে গবেষণার কাজ বেশ ভালভাবে চলতে থাকে। যে কয়জন ছাত্র আমার কাছে রিসার্চ আরম্ভ করেছিল তাদের মধ্যে ধীরেন গাঙ্গুলী, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী ও শশিভূষণ চৌধুরী পরবর্তী জীবনে খ্যাতি লাভ করেছে। ধীরেন ও পৃথ্বীশ আজ লোকান্তরিত। আর একজন—হিমাংশুভূষণ সরকার—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করে এবং যবদ্বীপের কবি ভাষা আয়ত্ত করে যবদ্বীপের ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একখানি ভাল বইও লেখে। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র চাকরি গ্রহণ করার পর অনেকদিন পর্যন্ত সে আর গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারেনি। কিন্তু দশ বারো বছর হল সে আবার এ বিষয়ে চর্চা শুরু করেছে। কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও লিখেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার অনেক কথা এতক্ষণ বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনযাত্রার যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কথা দীর্ঘকাল পরে আজও আমার মনে অম্লান হয়ে জেগে আছে, এবার তারই কথা বলছি। প্রথমেই মনে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলনের কথা। পূর্বেই বলেছি যে, ঢাকা শহরে ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ নামে দুটি পুরনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দুই কলেজে বি. এ. পড়ান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের পুরনো স্মৃতি বজায় রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখানর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন তৈরী দুটি হোস্টেলের নাম রাখা হয় ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল। এই হলের কথা পূর্বেই বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রকে এর যে কোন একটি হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। এই দুই হল থেকে জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জগন্নাথ হলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র এবং পুরাতন জগন্নাথ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে এমন সব ছাত্র মিলে জগন্নাথ হল ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ঢাকা হলেও অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট হিসেবে আমাকে জগন্নাথ হল ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন গড়ে তোলার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করতে হয়। বহু পুরাতন ছাত্রের—

যারা তখন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—অকুণ্ঠ সাহায্যেই এ কাজ সম্ভব এবং সার্থক হয়েছিল।

প্রতি বৎসর একবার এই সম্মেলন হত। সভাপতিত্ব করতেন জগন্নাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সন্ধ্যার সময় একটি সভা হত। সেখানে সভাপতি জগন্নাথ কলেজে তাঁর ছাত্র-জীবনের স্মৃতিকথা মনোরম ভাষায় ব্যক্ত করতেন। তার পর ঐ কলেজের পুরনো ছাত্রদের মধ্যে ৫।৬ জন তাঁদের নিজেদের ছাত্র-জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। ঢাকা জগন্নাথ হলের প্রাক্তন ছাত্ররা সময়বিচারে তখনও তেমন পুরনো না হলেও, নিজেদের কথা তারাও কিছু নিবেদন করত।

বক্তৃতার পর অমোদ প্রমোদ এবং নাটক অভিনয় এবং সবশেষে হলের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে প্রায় সাত আটশ' প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রের একসঙ্গে বিরাট ভোজের আয়োজন হত। সে সময় ঢাকায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল কম। কিন্তু একসঙ্গে এত লোকের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এই কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রতি বৎসরই তাঁদের উপর এ কাজের ভার দেওয়া হত। নিমন্ত্রণ পত্রে আসনের নম্বর দেওয়া থাকত; কাজেই বসবার কোন অসুবিধা হত না। জগন্নাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, জগন্নাথ হলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং শহরের কয়েকজন ধনী ব্যক্তির চাঁদার সাহায্যে এই বিরাট ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হত। প্রতি বৎসরই পুরাতন ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম জনপ্রিয় সম্মেলন বোধ হয় আর কিছু ছিল না এবং কখনও হয়নি। প্রতি বৎসর একটি দিনের প্রীতি-সম্মেলনে সকলেই আনন্দে যোগ দিতেন। এই অনুষ্ঠানের কথা আজও আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। ঢাকা হলেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হত।

আর যে-কথাটি আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে তা হল ইতিহাস বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে নানা ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ। প্রায় দশ বারো বার আমি নিজেই ছাত্রদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিছু অর্থ সাহায্য করতেন; ছাত্ররাও কিছু ব্যয় বহন করত। উত্তর ভারতের বহু ঐতিহাসিক স্থানে আমি ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে বেড়িয়েছি। একবার রাজগীর গিয়েছিলাম। সেখানে থাকার তেমন ভাল ব্যবস্থা ছিল না; এক পাণ্ডার বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম। সারা দিন ঘুরে বেড়ান এবং বড় ফরাস পেতে রাত্রে নিদ্রার ব্যবস্থা। একদিন একটি জঙ্গলা জায়গায় গিয়ে পথ খুঁজে পাইনে। তখন দ্বিপ্রহর বারোটা কিম্বা একটা। কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছি, পথ মিলছে না। বেশ চিন্তায় পড়েছি। এমন সময় চোখে পড়ল নালা বা খালের মতো একটি পথ ডাইনে বাঁয় এঁকে বেঁকে চলে গেছে। মনে হল দুর্গের চারপাশে একটি পরিখা

ছিল। এ ধরে এগিয়ে গেলে দুর্গের যে তোরণদ্বার সেখানে আমরা পেঁছিতে পারব। তোরণদ্বারটি খুবই পরিচিত; আমাদের থাকার জায়গার কাছেই। সত্য সত্যই নালা ধরে এগোতে এগোতে আমরা তোরণদ্বারে এসে পেঁছিলাম। বেলা তখন দুটো কিম্বা আড়াইটে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের জ্ঞান থাকলে যে অনেক বিপদে উদ্ধার পাওয়া যায়—অনেকটা একারণে এই ঘটনাটির কথা আমার মনে আছে।

দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া ইত্যাদি বহু স্থান ছাত্রদের নিয়ে ঘুরেছি। এই উপলক্ষ্যে তাদের সঙ্গে যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হত তা আমার জীবনে আজও আনন্দের স্মৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে এমন মেলামেশা, একসঙ্গে এতদিন কাটান সম্ভব ছিল না। এই সব যুবকদের সাহচর্যে আমারও যেন যৌবনকাল ফিরে আসত।

ঢাকার আর একটি বিশেষ স্মৃতি লাঙ্গলবন্ধের স্নান। অনেকে জানেন এখানে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের পুরনো খাতে সামান্য জল থাকে। কিন্তু বিশেষ কয়েকটি দিনে এখানে স্নান মহাপুণ্য বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। এই স্থানটি নারায়ণগঞ্জ থেকে কয়েক মাইল দূরে। যাত্রীদের দেখাশোনা এবং নিজেদের স্নানের জন্য হলের অনেক ছাত্র সেখানে যেত। আমিও কয়েকবার ছাত্রদের নিয়ে গেছি। সেখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল না; গাছের নীচে দিন কাটাতে হত। বয়স্ক বা শিশু স্নানার্থীদের সুখ সুবিধা, কেউ হারিয়ে গেলে খোঁজ করা, খবরাখবর দেওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছাত্ররা লক্ষ্য রাখত। এ ছাড়া নিজেদের স্নান করা তো ছিলই।

একবার স্নান সেরে সন্ধ্যার পর আমরা ঢাকায় ফিরছি। শহরে পেঁছেই টের পেলাম যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে; শহরে খুনোখুনি হচ্ছে। সমস্ত ছাত্রদের একত্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক একজন ইউরেশিয়ান সার্জেণ্টকে নায়ক করে আমরা অগ্রসর হলাম। নবাবপুরে পেঁছে দেখি ভীষণ গণ্ডগোল। সার্জেণ্ট বন্দুক হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। অক্ষত দেহে আমরা বাড়ি পেঁছিলাম। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তবে এই শেষ নয়। সেকথা পরে বলব।

ঢাকায় আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান জন্মাষ্টমীর মিছিল। এটি একটি বিরাট ব্যাপার। এ দেখবার জন্য বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে লোকে ঢাকায় আসত। মিছিলে নানা জিনিসের সমাবেশ—গাড়ি ঘোড়া, সোনারুপোর জল-চৌকী, কাঠ ও বাঁশের তৈরী নানা রকম মঞ্চের উপর অভিনয়। বছরে দু'দিন এই মিছিল বেরত—একদিন বার করতেন নবাবপুরের বসাকরা; আর একদিন ইসলামপুরের বসাকরা। কোন্ মিছিলটি ভাল হয়—এ নিয়ে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পূর্বে যে মঞ্চের উপর অভিনয়ের কথা বলেছি, তার মধ্যে এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিগত এক বৎসরের নানা নিন্দা বা কুৎসার ঘটনা নানাভাবে

দেখাত। অনেক সময় দেশের হালচাল সম্বন্ধে অনেক ছড়া, অনেক সামাজিক কুপ্রথাও অভিনয় বা গানের মধ্যে দেখান হত। সত্য বলতে মিছিলের মধ্যে এই অভিনয়ের ব্যাপারটি ছিল খুবই উপভোগ্য। বয়োবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি তাঁরা বাল্যকালে এই মিছিল দেখেছেন এবং তাঁদের বাপ ঠাকুরদাদার কাছেও মিছিলের কথা শুনেছেন। এ মিছিল যে একশ দেড়শ বছরের পুরনো তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকার এই জন্মাষ্টমীর মিছিল বন্ধ হয়ে গেছে।

ছাত্র ও নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি মিছিল দেখতে যেতাম। অসম্ভব ভীড়, গাড়ি নিয়ে কাছে যাওয়া যেত না। যে রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবে তার দু'পাশের বাড়ির ছাদ ও বারান্দা সব ভাড়া করা হত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখাও সম্ভব ছিল না। অনেক দোকানী এ সময় বেশ আয় করত।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল ও ঝুলনের সময় নাচ গান খুবই প্রসিদ্ধ। বসাকেরা বৈষ্ণব ছিলেন; সেকারণে এই দুটি এমন জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। বাংলা দেশের আর কোন জায়গায় যে এই দুটি পাল-পার্বণে এমন জাঁকজমক হয় তা আমার জানা নেই। ঢাকার স্মৃতির সঙ্গে এই দুটি উৎসবের স্মৃতি আমার মনে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরেই সেখানকার কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীর সঙ্গে আমাকে মেলামেশা করতে হয়। ভাইস্-চ্যান্সেলার হার্টগ সাহেব মাঝে মাঝে আমাদের অর্থাৎ প্রধানতঃ প্রফেসারদের তাঁর বাড়িতে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতেন। অনেক সময় সেখানকার কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতিও নিমন্ত্রিত হতেন। এই উপলক্ষেই প্রধানতঃ তাঁদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। কমিশনার সাহেব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন; সুতরাং তাঁর সঙ্গে নানা কারণে মাঝে মাঝে দেখা হত। ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। কারণ কলকাতায় থাকতে এরকম কোন সুযোগ হয়নি। এঁদের সঙ্গে মেলামেশার এমন কতকগুলি নিয়ম কানুন আছে যার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। তখন এই সব নিয়ম কানুন মেনে চলারই প্রথা ছিল। এর একটি দৃষ্টান্তের কথা আজও আমার মনে আছে। হার্টগ সাহেব প্রথম যেদিন আমাকে চিঠি লিখে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন, আমি সে চিঠির কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। দু'এক দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্টগ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর স্ত্রী যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে চিঠি লিখেছিলেন সেটি আমি পেয়েছি কিনা। আমি বললাম যে, পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই যাব। তখন হার্টগ সাহেব বললেন, দেখো, তোমার বয়স কম; কিছু মনে করো না। ভবিষ্যতে তোমাকে অনেক রাজকর্মচারীর সঙ্গে মিশতে হবে। সেজন্যেই বলছি যে, এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হল এই রকম নিমন্ত্রণ চিঠি পেলেই যদি কোন কারণে তোমার যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সেই কারণ উল্লেখ করে তৎক্ষণাৎ সেই চিঠির

জবাব দিতে হবে। আর যদি তোমার যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে দু'এক দিনের মধ্যে তোমার সম্মতি জানিয়ে এবং নিমন্ত্রণকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখা উচিত। এই বলে সেই রকম চিঠির একটি নমুনা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। সেই অবধি আজীবন আমি এই নিয়ম পালন করেছি। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন যে, কোনও বিশেষ formal উপলক্ষ্য হলে ডিনারে যাওয়ার একরকম বিশেষ পোশাক আছে। তুমি সেই রকম একটি পোশাক তৈরী করে রেখ। তাঁর কথা অনুসারে আমি একটি ডিনার স্যুট তৈরী করেছিলাম এবং ঢাকায় থাকতে সেই স্যুটের খুবই ব্যবহার হত। টেবিলে বসে খাওয়ার নিয়ম সম্বন্ধেও দু'চারটি কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। তার মধ্যে একটি আমার মনে আছে—তা হল খাওয়ার মাঝে বা পরে মদ খাওয়ার কথা। শুনে বললাম যে আমি তো মদ খাই না এবং খাবও না। তিনি বললেন তাতে দোষ নেই। তোমার বাঁ পাশে যে বসবে সে মদ ঢেলে নিয়ে বোতলটি তোমায় দিলেই তুমি সেটি তোমার ডান পাশের মানুষকে দিয়ে দেবে। যতদূর মনে পড়ে একটি বিশেষ রকমের মদ আছে যেটি বাঁদিক দিয়ে ওভাবে চালান করে দিতে হয়। এইরকম খুঁটিনাটি অনেক নিয়ম তখন মেনে চলতে হত ; কিন্তু এখন তা লোপ পেয়েছে। হার্টগ সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি কখনও বিলেত যাইনি এবং ইংরাজসমাজে মিশিনি তা তিনি জানতেন। সেজন্য এ বিষয়ে আমাকে ওয়াকিবহাল করার জন্য উপদেশ দিতেন ; তবে তা খুব ভদ্রভাবে। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমার এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। এবং সত্যের খাতিরে একথাও বলব যে, সেই ভারতীয় ইংরেজবিদ্বেষের যুগেও ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার এবং পুলিশ সাহেবও সামাজিক ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে খুবই হৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনেক প্রধান অধ্যাপকের বাড়ি ঢাকার বাইরে শহরতলী রমনায় প্রায় পাশাপাশি ছিল। এই সব শিক্ষকদের মধ্যে এমন একটি মধুর সম্পর্ক ও সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল যে মনে হত আমরা যেন সকলেই এক পরিবারভুক্ত। সেই সব দিনের কথা এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় এবং আমার ঢাকায় থাকার একুশ বৎসর কালের এই রকম যে কত সুখস্মৃতি আছে তা বলে শেষ করা যায় না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আমার চেয়ে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন। সত্যেন বসুও তাই। অন্য শিক্ষকদের মধ্যে নলিনী বসু, হরিদাস ভট্টাচার্যও ছিলেন আমার চেয়ে বয়সে ছোট। সুশীল দে বরাবর আমার সহপাঠী ছিল। এঁদের এবং আরও যাঁরা রমনায় ছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখাশোনা তো হতই; এ ছাড়া মাঝে মাঝে পরস্পরের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণে এই সৌহার্দের ভাবটি আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। আমাদের মধ্যে আপনাআপনি ভাবটি এত বেশী ছিল যে আহারের ব্যাপারে অনেক সময় নিমন্ত্রণের অপেক্ষাও থাকত না। জ্ঞান ঘোষের বাড়িতে তাঁর

বন্ধ্যা মা থাকায় তিনি মুরগী খেতে পারতেন না। একদিন হঠাৎ আমার বাড়িতে কি একটা কাজে এসে দেখলেন যে মুরগী রান্না হয়েছে এবং আমরা খেতে বসবার আয়োজন করছি। এমন সময় জ্ঞান বললেন, 'বৌদি, আর একটি আসন পাত। বাড়িতে তো মুরগী খাওয়া যায় না। এখানেই খাব।' এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। জ্ঞান ঘোষ ঢাকায় চাকুরি পাওয়ার পর বিবাহ করেন এবং স্ত্রীকে নিয়ে এসে প্রথমে আমার বাড়িতে ওঠেন। কারুর বাড়িতে কোন অসুখ করলে এঁরা সকলে ঠিক আপনার জনের মতো তাঁর বাড়িতে এসে সব রকম ব্যবস্থা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ঢাকায় একটি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল। তার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন অপূর্ব চন্দ। তিনিও আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই আজ পরলোকে। এঁদের সাহচর্যে একুশ বছর যে কি সুখে কাটিয়েছি তা ভাবতেও এখন অনেক আনন্দ পাই।

জগন্নাথ হলের দু'জন হাউস টিউটর, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও প্রফুল্লকুমার গুহর সঙ্গে খুবই আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল। প্রফুল্লবাবু জীবিত নাই।



ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের সাথে (১৯২৬) মধ্যে শ্রা এ. কে চংদ

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

ঢাকায় থাকার সময় দেশের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। এর মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য ও অবিস্মরণীয় ঘটনা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি ঢাকায় আসতে সম্মত হয়ে জানালেন কে কে তাঁর সঙ্গে আসবেন। ভাইস-চ্যান্সেলার আমাদের সঙ্গে বসে ঠিক করলেন কার কার বাড়িতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হবে। ঠিক হল কবিগুরু থাকবেন আমার বাড়িতে; তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ এবং আরও কয়েকজন অপূর্ব চন্দ ও অন্যান্য শিক্ষকদের বাড়িতে থাকবেন। এবং কবির সঙ্গী দুজন বিদেশী—একজনের নাম টুচি (Tuchi), যিনি পরে বিখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন—থাকবেন ভাইস-চ্যান্সেলার ল্যাংলী-সাহেবের বাড়িতে। এই ব্যবস্থামত আমি রবীন্দ্রনাথকে আমার বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখলাম। তিনিও তা গ্রহণ করে সম্মতি জানালেন। কিন্তু এই ব্যাপারে জানাজানি হওয়ার পর ঢাকায় কবিগুরুর কয়েকজন ভক্ত এ বিষয়ে খুব আপত্তি ও আন্দোলন করতে শুরু করেন। আপত্তির কারণ হল—রবীন্দ্রনাথ সাধারণের অতিথি না হয়ে একজন ব্যক্তিবিশেষের অতিথি কেন হবেন? তাঁদের বলা হল যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকায় আসছেন, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়েরই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা কর্তব্য এবং অধিকার। কিন্তু আপত্তির প্রকৃত কারণ ছিল এই যে রবীন্দ্রভক্ত কারুর বাড়িতে না থেকে আমার মতো একজন অসাহিত্যিকের কাছে কেন কবি থাকবেন। এজন্য তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন এবং তাঁর কাছে লোকও পাঠান। রবীন্দ্রনাথ এই সব গোলোযোগের ব্যাপার দেখে বিশ্বভারতীর একজন অধ্যাপককে ঢাকায় পাঠালেন। তিনি সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ করে ফিরে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন যে, তিনি আমার বাড়িতেই থাকবেন। আমার জীবনে এটি একটি বিশেষ ঘটনা ও সৌভাগ্য—এই কারণে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীর জীবনের ছোটখাট বিবরণও লিখে রাখা কর্তব্য এই বিবেচনায় আমি তাঁর ঢাকায় ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু লিখে রাখছি।

বিপুল সংবর্ধনাসহকারে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার স্টেশন থেকে গাড়ি করে রবীন্দ্রনাথকে ঢাকায় আমার বাড়িতে নিয়ে আসা হল। সেখানকার বড় বড় জমিদার, বিশেষতঃ ভাওয়ালের রাজকুমার এবং ঢাকার নবাব, আমায় বলে

পাঠালেন যে রবীন্দ্রনাথের জন্য কোন গাড়ি দরকার হলে আমি যেন তাঁদের জানাতে দ্বিধা না করি। রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষ্যে ঢাকায় বিপুল উদ্দীপনা ; রাস্তায় বহু লোক তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। আমি তখন জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট এবং প্রোভোস্টের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা এবং অধ্যাপকদের স্ত্রী—এঁরা সবাই আমার বাড়িতে এসে কবিগুরুর অভ্যর্থনা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর আসার দিন আমার গৃহদ্বারে, সিঁড়িতে, উপরের বারান্দায় এবং ঘরে নানারকম আলপনা দেওয়া হয়, দরজার সামনে মঙ্গলকলস এবং আম্রপল্লব। কয়েকজন ছাত্র এবং শিক্ষককে নিয়ে আমি নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিলাম কবিগুরুকে অভ্যর্থনা করার জন্য। কবি এসে পেঁছিনমাত্রই তাঁর উপর ফুলবর্ষণ শুরু হল। মেয়েরা শঙ্খধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানালেন। মঙ্গলকলসের মাঝে পথ দিয়ে আমরা বাড়িতে প্রবেশ করলাম। শহরের বহু ভদ্রলোক এবং মহিলা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এসব কথা সবিস্তারে বলা নিষ্প্রয়োজন। ঢাকার মতো জায়গায় তাঁর আগমনে যে কি রকম উদ্দীপনা এবং আনন্দের সঞ্চার হতে পারে, তা সহজেই সকলে অনুমান করতে পারবেন। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে এই ঘটনার অনেক অসত্য বিবরণ রবীন্দ্রভক্তেরা সেই সময়কার সংবাদপত্রে প্রচার করেন। সম্প্রতি এই সমুদয় মিথ্যা প্রচারের বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমি, পরিশিষ্টে এই বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

আমার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি বিশিষ্ট ধারণা জন্মে। সে কথাই এবার বলছি। তিনি যে কবি এটা কেবল তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নয়, তাঁর প্রত্যেক কথায় এবং আচরণে ফুটে উঠত। এই বৈশিষ্ট্যটাই প্রথমে আমি অনুভব করি এবং সেকথা আজও আমার মনে খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি সাধারণভাবে কথাবার্তা বলতে পারেন না। যা বলেন তাই কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি, যাতে তাঁর জীবনী-লেখকদের কাজে লাগতে পারে। আমার ছেলের নাম অশোক, ডাক নাম রবি। তার বয়স তখন নয় দশ বছর হবে। আমরা সকলকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যতদিন রবীন্দ্রনাথ আমার বাড়িতে আছেন তাকে যেন কেউ 'রবি' বলে না ডাকে। ছেলেকেও সেকথা বলা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনেই আমার ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি ?' সে, বলে বসল 'রবি।' তখন তিনি গম্ভীরভাবে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো লোক ভাল নও।' আমরা তো কিছু বুঝতে না পেরে ভয়ানক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। 'কি ব্যাপার ?' তিনি বললেন, 'আমি আসার আগেই আমার নামটা তোমরা চুরি করেছ। সুতরাং এরপর আরও অন্য জিনিস চুরি করতে পার।' আমরা হেসে উঠলাম।

দোতলার যে ঘরে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তার ঠিক সামনে একটি আমগাছ ছিল। তখন গাছটি মুকুলে ভরে গেছে। সকালে চা পানের পর রবীন্দ্রনাথ ঐ ঘরের বারান্দায় একটি ইজি-চেয়ারে বসে থাকতেন। বলতেন, এভাবে বসে থাকতে ভারী ভাল লাগে। আমার বাড়ির বাগানে আরও অনেক গাছ ছিল। সমস্ত বাগানে তখন ফুলের শোভা। বাগানে একটি পুষ্করিণীও ছিল। সব মিলিয়ে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করতেন।

উনি কবি মানুষ; সকালবেলায় ওঁর কাছে গেলে হয়তো ওঁর চিন্তা বা কল্পনার ব্যাঘাত হবে এবং উনি বিরক্ত হবেন—এই ভেবে বাড়ির লোকদের বারণ করে দিয়েছিলাম এই সময় তারা যেন কেউ বারান্দায় না আসে। দু'তিন দিন নিরাপদে কাটল। আমার বড় মেয়ের বয়স তখন বারো তেরো বছর। একদিন হঠাৎ সে রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নাকি খুব বড় কবি? আপনি নাকি অনেক কবিতা লিখেছেন।' রবীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, এই দুর্নাম আমার আছে।' অমনি একটি ছোট খাতা বার করে সে বলল, 'আমায় নামে একটি কবিতা লিখে দিন না।' রবীন্দ্রনাথ তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল নাম ও ডাক নাম। এবং তৎক্ষণাৎ তার সেই ছোট খাতায় তারই কলমে একটি কবিতা লিখে দিলেন—তার মধ্যে তার দু'টি নামই আছে। আমার এই মেয়ের বিবাহের সময় এই কবিতাটি প্রতিলিপিসহ ছাপিয়েছিলাম। পরে রবীন্দ্রনাথের 'স্ফুলিঙ্গ' নামক ছোট একখানি পুস্তিকায় ও রচনাবলীতে এটি ছাপা হয়েছে। তবে তাতে ঘটনাটির কোন উল্লেখ নেই। আমার মেয়ে বড় হয়ে অবশ্য বুঝতে পেরেছিল যে এটি তার জীবনের কত বড় মূল্যবান সম্পদ। দুঃখের বিষয় সে আজ আর ইহজগতে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক হলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানান হয়েছিল। একটি হলে কবিগুরুর বসবার আসনের ঠিক উপরে বৈদ্যুতিক পাখায় অনেকগুলি বড় বড় গাঁদাফুল এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, কবি যেই আসনে বসেছেন অমনি পাখা খুলে দেওয়ায় সেই ফুল তাঁর মাথায় পড়তে থাকে। এই ব্যাপারটি একটু নূতন রকমের; তাই চারদিক থেকেই খুব করতালিধ্বনি হল। আমি রবীন্দ্রনাথের পাশে বসেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখো, সাহিত্যের একটি বড় রহস্য আজ সমাধান হয়ে গেল।' কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, 'কি?' তিনি বললেন, 'কালিদাসের রঘুবংশে পড়েছিলাম যে মহারাজা অজের রাণী ইন্দুমতী তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলছেন, এমন সময় উপর থেকে তাঁর মাথায় ও গায়ে ফুল পড়ায় তিনি মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েন এবং তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। আমি বরাবরই ভাবতাম ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা বা মৃত্যু, এটা কবির কল্পনামাত্র। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি ফুলের ঘায়েও মৃত্যু হতে পারে।'

আর একদিন তাঁকে ঢাকার পুরানো শহর দেখাতে নিয়ে গেছি। ঢাকা শহর

অতি নোংরা, শহরের রাস্তাগুলি অত্যন্ত সরু। আমরা নতুন শহর রমনায় থাকতাম। তার চারদিকেই মুক্ত প্রান্তর, প্রত্যেক বাড়িতেই অনেকখানি ফাঁকা জমি। কাজেই নূতন পুরাতনের তফাৎটা খুবই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বেড়িয়ে ফিরেই বললেন, 'তোমাদের এই পাড়ার নামটা বদলান উচিত।' বললাম, 'কেন?' উনি বললেন, শহরের ঐ অংশের নাম সার্থক—"ঢাকা"। এই রমনার নাম হওয়া উচিত "খোলা'।"

এই রকম সাধারণ অনেক কথাবার্তার মধ্যে তাঁর কবিচিত্তের অনেক পরিচয় পেয়েছি। এই রকম আর একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অপূর্ব চন্দের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। সেখানে একজন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করবেন, এমন কথা ছিল। চা-পর্ব শেষ হতেই সেই আবৃত্তি আরম্ভ হল—বই খুলে পড়ে পড়ে আবৃত্তি। দু'চার মিনিট শোনার পরেই রবীন্দ্রনাথ এমন রেগে গেলেন যে তাকে স্পষ্ট বললেন, 'তোমার কিছুই হচ্ছে না। বই আমাকে দাও।' বলেই তার হাত থেকে বইটি নিয়ে নিজেই পড়তে আরম্ভ করলেন। কবির বয়স তখন পঁয়ষট্টি। সেই বয়সেও তাঁর সেই আবৃত্তি আর স্বর আমাদের একেবারে মুগ্ধ করে দিল। সভা ভেঙ্গে গেলে সেই প্রথম আবৃত্তিকারকে অনেকে অনুযোগ দিতে লাগল। আমি তাকে বললাম যে আমি কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমার জন্যেই কবিগুরুর নিজের মুখে তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি শোনার এমন দুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের হল।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বললেন যে তাঁর শরীরটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছে। শোনামাত্রই সিভিল সার্জন ও ঢাকার অন্যান্য বড় বড় ডাক্তাররা সকলেই আমার বাড়িতে হাজির হলেন। তাঁরা দেখে বললেন যে অসুখের কোন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ শুনে বললেন যে অসুখ তেমন কিছু নয়। তবে বহুদিন পরে পূর্ব বাংলায় এসেছি ; মনে হয় জলে একটু থাকতে পারলে ভাল হত। ডাক্তাররাও বললেন, ভাল কথা। ঢাকার নবাবের একটি দোতলা বড় নৌকা ছিল—স্টিম লঞ্চ সেটি টেনে নিয়ে যেত। নবাব বললেন, তাঁর সেই নৌকায় কবিকে নিয়ে চলো। নৌকার এক তলায় দু'তিনটি ঘর এবং উপরের তলায় একটি বড় হল ছিল। ঢাকা শহরের পাশেই বুড়ীগঙ্গা নদী ; সেই নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা হল। কবিগুরু সেই নৌকায় এসে উঠলেন। জগন্নাথ হলের প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র কবির পরিচর্যার জন্য সেখানে রইল। সব ছাত্রই যেতে উৎসুক ; সুতরাং পরিচর্যার কোন অসুবিধা ছিল না। আমার বাড়ি থেকে নদীর ঘাট প্রায় তিন মাইল দূরে। কবির খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য আমি ও আমার স্ত্রী সারাদিনই সেখানে থাকতাম, রাত্রে বাড়ি ফিরে আসতাম। শহরের অনেক লোকও সেখানে থাকেতন এবং অনেকেই নিজের বাড়ি থেকে ভাল ভাল খাবার তৈরী করে পাঠাতেন। জ্ঞান ঘোষ ও সত্যেন বোস বললেন, তোমরা তো বাড়িতে থাক না ; তোমার ছেলেমেয়েরা আমাদের বাড়িতে

থাকবে। এভাবে সকলেই কবিগুরুর সংবর্ধনা ও পরিচর্যার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন এবং আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেটি পরে ছাপা হয়েছিল। যাওয়ার দিনেও কবিকে বিপুল সংবর্ধনা সহকারে বিদায় দেওয়া হয়। পথের এক জায়গা থেকেই তিনি আমার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন যে আমাদের আদর অভ্যর্থনায় তিনি খুবই অভিভূত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তাঁর সম্বন্ধে দু'টি নূতন বিষয় জানতে পারি। প্রথমতঃ, চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও তিনি বেশ ভোজনপটু ছিলেন। ঢাকায় খুব বড় 'কই' মাছ পাওয়া যেত। প্রতিদিন তাঁকে একটি বড় 'কই' মাছ দেওয়া হত। অন্যান্য তরকারির সঙ্গে তিনি পুরো মাছটিও খেতেন। খেয়ে তিনি খুব খুশী হতেন—বলতেন, 'পূর্ব বাংলার মতো মাছ রান্না আমাদের ওদিকে করতে পারে না।'

আর একটি জিনিস হল তাঁর স্নানের পারিপাট্য। ঢাকায় আসার পূর্বে চিঠি লিখে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর জন্য যেন একটি বাথটবের ব্যবস্থা করা হয়। আমার বাড়িতে বাথটব ছিল না ; অন্য জায়গা থেকে একটির ব্যবস্থা করেছিলাম। স্নানের ঘরে দেখতাম নানারকম ছোট ছোট অনেকগুলি শিশি তিনি রেখে দিয়েছেন। অন্ততঃ এক ঘণ্টা ধরে তিনি স্নান করতেন। স্নান সেরে প্রতিদিনই তিনি একটি নূতন আলখাল্লার মতো পোষাক পরতেন। আমার স্ত্রীকে বলতেন, 'দেখো তো, পোষাকটা ঠিক হয়েছে কিনা।'

স্নানের এমন পরিপাট্যের সঙ্গে তুলনায় আর একটি বিষয়ে কিন্তু আমাদের খুব আশ্চর্য মনে হতো। নিজের সঙ্গে তিনি একটি চাকর এনেছিলেন। খাটের উপর সে কবির জন্য যে বিছানা করেছিল আমার স্ত্রী তা দেখে অবাক হলেন। কারণ বিছানাটি বেশ ময়লা, তোষক এবং বালিশও ছেঁড়া। তখন সেই বিছানা বদল করে তিনি কবির জন্য নূতন বিছানার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবির দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ন। ঘরে এসেই তিনি তফাৎটা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'এ সবই তোমাদের ব্যবস্থা দেখছি।' চাকরের নাম করে বললেন যে এটা তার পাতা বিছানা নয়।

স্নান বা পোশাক সম্বন্ধে যিনি এমন সৌখীন এবং যাঁর দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ন, শয্যা সম্বন্ধে তাঁর এমন ঔদাসীন্যের জন্যই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

আর একটি ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ঢাকায় এসেই আমার স্ত্রীকে তাঁর শ্বশুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'উনি বড় খামখেয়ালী। সময়ে অসময়ে আপনাদের নানাভাবে বিরক্ত করবেন। সেজন্য বড় সংকোচ বোধ করছি।' আমরা বলেছিলাম, 'সেজন্য কোন ভাবনা নেই। ওঁর কোন সেবা শুশ্রূষা করা আমরা পরম ভাগ্য বলেই মনে করব।' তবে তাঁর অসঙ্গত খামখেয়ালের পরিচয় বিশেষ কিছু পেয়েছি বলে মনে নেই। যখন তিনি নৌকায় ছিলেন, তখনকার

একটি কথা কেবল মনে আছে। সে সময় দলে দলে লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। তিনি তাদের জন্য আমার স্ত্রীকে চা ও মিষ্টির ব্যবস্থা করতে বলতেন। বারে বারে দোকানে লোক পাঠিয়ে মিষ্টি আনতে হত, চায়ের ব্যবস্থাও হত। তবে নৌকায় এরকম ব্যবস্থা করতে বেশ একটু অসুবিধা হয়েছিল।

আর একটি বিষয়েও কবির এ রকম খেয়ালের পরিচয় পেয়েছিলাম। আমার স্ত্রী আটপৌরে শাড়ী পরে তাঁর সামনে গেলে তিনি বলতেন, 'মেয়েদের এই আটপৌরে শাড়ী পরা—এটা বড় খারাপ লাগে। তোমরা বেশ সেজেগুজে আমার সামনে আসবে; ভাল শাড়ী ভাল জামা।' একদিন কথায় কথায় বললেন, 'আমাদের ছেলেবেলায় গুরুজনের সামনে পান খাওয়া দোষের ছিল।' আমার স্ত্রীর পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল—সুতরাং খানিক পরে ভাল করে মুখ ধুয়ে কবির কাছে যেতেই তিনি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন—পান খাওনি বুঝি।' স্ত্রী বললেন—'আপনি তো বলেছেন গুরুজনের সামনে পান খাওয়া দোষের।' কবি হো হো করে হেসে উঠে বললেন—'আরে সে তো আমাদের ছেলেবেলার কথা—যাও পান খেয়ে এস।'

এই প্রসঙ্গ উপসংহার করবার আগে একটি সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, রবীন্দ্রনাথের ঢাকা যাওয়া সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে "দেশ" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখতে ইচ্ছা করেন এবং এ বিষয়ে আমার কাছে যে সকল সংবাদ এবং অন্য উপকরণ আছে তাঁকে দিলে তিনি বিশেষ অনুগৃহীত হবেন। তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের যেসব চিঠিপত্র এবং ঢাকায় থাকার কয়দিন তাঁর দৈনন্দিন কার্যের যে একটি মুদ্রিত প্রোগ্রাম ছিল সে সবই আমি গোপালবাবুকে দিলাম। এমন কি নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছনর পর থেকে কবির ঢাকায় ক'দিনের অবস্থানের সমগ্র কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলাম। এই সব নিয়ে তিনি 'দেশ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা-ভ্রমণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁর এই লেখাটি আমার মতে তথ্য বিচারে যথাযথ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যেতে পারে। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" নামে গোপাল-চন্দ্র রায়ের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বই-এ তিনি এমন কতকগুলি কথা লিখেছেন যা সম্পূর্ণ অসত্য; এবং তিনি নিজে পূর্বে যা লিখেছিলেন তার সঙ্গেও কোন সঙ্গতি নেই।

তিনি লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছনমাত্রই ঢাকার জনসাধারণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে বুড়ীগঙ্গার নদীতে তুরাগ নামে ঢাকার নবাবের একটি বোটে নিয়ে যান; ঢাকায় অবস্থানের দিনগুলি কবি ঐ বোটেই ছিলেন কেবল ফিরবার আগে দু-এক দিন আমার বাড়ীতে ছিলেন। এই বিবরণটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি

পূর্বেই লিখেছি নারায়ণগঞ্জ স্টেশন থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমি মোটরে করে রমনায় আমার বাড়িতে নিয়ে আসি। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং নদীর ধারে কোথাও জলের উপর থাকলে শরীর ভাল থাকবে, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সিভিল সার্জন ও অন্যান্য ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসারে এবং ঢাকার নবাবের সানন্দ আনুকূল্যে তাঁর দোতলা বোটে কবির থাকার ব্যবস্থা হয়। আমারই তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ এই বোটে দুদিন ছিলেন। গোপালবাবুর বই পড়ে তাঁকে বললাম, এমন অলীক বিবরণ কোথায় পেলেন? যে-কথা পূর্বে লিখেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের আর একটি কাহিনীর অবতারণা কেন করলেন? তিনি বললেন যে সেই সময়কার আনন্দবাজার পত্রিকায় ঢাকা থেকে প্রেরিত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি তারই অনুসরণ করেছেন। আমি তাঁকে বললাম, ঢাকায় আমার সেই সময়কার ছাত্র শ্রীমন্মথ রায়, যিনি আমার নির্দেশে জগন্নাথ হলের একদল ছাত্রের সহযোগিতায় তুরাগ বোটে রবীন্দ্রনাথর তত্ত্বাবধান করতেন এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ যিনি এখনও জীবিত আছেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার বিবরণের সত্যাসত্য নির্ণয় করুন। সাক্ষাৎ করে এসে তিনি আমায় বললেন যে তাঁরা দুজনেই আমি যে-কথা বলেছি তাই সমর্থন করেছেন।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আমার বাড়িতে থাকার প্রস্তাবে যে কবির কয়েকজন ভক্তের আপত্তি ছিল এবং এ নিয়ে যে কিছুদিন একটা গোলযোগ চলেছিল তার আভাস পূর্বেই দিয়েছি। গোপালবাবুকে সে কথা জানিয়ে বললাম যে এই বিক্ষুব্ধ ভক্তদের মধ্যে কেউ যে আনন্দবাজার পত্রিকায় এমন মিথ্যা সংবাদ পাঠিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনার বই-এ এরূপ বিবরণ থাকলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনী সত্য, না এই বই-এর বিবরণ সত্য! সুতরাং এর সংশোধিনী হিসাবে একটি বিবরণী মুদ্রিত করে এই বইএ সংযোজন করুন। নইলে আমাকে বাধ্য হয়ে সংবাদপত্রের মারফৎ জনসাধারণকে জানাতে হবে যে আপনার এই বিবরণ ভ্রান্ত। গোপালবাবু বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বললেন, আপনি এখন কোথাও এ নিয়ে লিখবেন না। ভুল সংশোধন করে একটি পৃষ্ঠা ঐ বইএ আমি যোগ করে দেব।

এরপর পাঁচ-ছয় বছর সময় পার হয়েছে। কিন্তু গোপালবাবু আজও সে ভুল সংশোধন করেন নি। সেজন্য আমাকে এ কথার অবতারণা করতে হল। এ ঘটনাটি লেখবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেশে সংবাদপত্রে মফঃস্বল থেকে রিপোর্টাররা যেসব সংবাদ পাঠান তার উপর নির্ভর করা কত অসঙ্গত। দ্বিতীয়ত, গোপালবাবু আমার নিকট বিবরণ শুনে 'দেশ' পত্রিকায় এক কথা লিখেছিলেন, পরে আমাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই বইএ বিপরীত কাহিনীর অবতারণা করেছেন। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর

সাহিত্যিকের কোন ঘটনার সত্যাসত্য বিচারের ঐতিহাসিক প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয়ই এতে পরিস্ফুট হয়েছে। এই শ্রেণীর লেখকদের বর্ণনা থেকে কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ সম্বন্ধে আমি ১৩৮০ সালের পূজা সংখ্যা 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি তা পরিশিষ্টে পুনঃমুদ্রিত হল।

রবীন্দ্রনাথের আসার কয়েক বৎসর পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে আমি স্যার যদুনাথ সরকার ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলাম। শরৎবাবুকে ডিগ্রী দেওয়া নিয়ে একটু আপত্তি হয়েছিল সে কথা পরে বলব। তবে শেষে সর্বসম্মতিক্রমে দুই সভায়ই আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হল। স্যার যদুনাথ ও শরৎচন্দ্র একসঙ্গে এলেন। যদুনাথ পূর্বেও আমার বাড়িতে এসেছিলেন; এবারেও এসে রইলেন। ওঁদের আসার কিছুদিন পূর্বে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে আমি ইতিহাস শাখার সভাপতি হয়েছিলাম এবং শরৎচন্দ্র ছিলেন সাহিত্য শাখার সভাপতি। সেখানে আমাদের দু'জনকে একটি বড় ঘরে একসঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়। শরৎবাবুর সঙ্গে তখন আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সম্মেলনের পরে আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি আমার সঙ্গে ঢাকায় আসেন এবং আমার বাড়িতে থাকেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ঢাকায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শরৎবাবুর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সেকারণে তাঁর বাড়িতে না ওঠায় চারুবাবু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। সেজন্য এবার শরৎবাবু চারুবাবুর বাড়িতে উঠেছিলেন। কিন্তু দিনের বেশীর ভাগ এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত তিনি আমাদের বাড়িতে থাকতেন।

দিনের বেলা অনেকে তাঁর কাছে আসত। রাত্রে খাওয়ার পর আমরা—আমি, আমার স্ত্রী ও শরৎবাবু—আমাদের বাড়ির পুকুরের ধারে সিমেণ্ট-বাঁধান বেঞ্চের উপর বসতাম। শরৎবাবুর বহু কাহিনী সেই সময় আমরা তাঁর মুখে শুনেছি। শরৎবাবু খুব বৈঠকী লোক ছিলেন। এমন চমৎকার কথাবার্তা তিনি বলতেন যে শুনে সকলেই মুগ্ধ হত। যে কদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন এই রকম অনেক কাহিনী এবং তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি। সে-সব যতদূর আমার স্মরণে ছিল তাঁর মৃত্যুর পর একটি স্মরণিকা গ্রন্থে লিখেছি। এখানে আর তা বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলি—শরৎচন্দ্র আদৌ ভোজনপটু ছিলেন না। তাঁর আহার ছিল খুব সামান্য। কিন্তু যদুনাথের স্বভাব ছিল বিপরীত; তিনি বেশ ভালই খেতে পারতেন। তাতে শরৎচন্দ্র রেগে যেতেন। একদিন আমাকে বললেন, 'দেখো, বুড়ো খাচ্ছে কি রকম।' আমি বললাম, 'এটা আপনার রাগের কথা। আপনি একটি ব্যতিক্রম। আপনার সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে ছিলেন। তিনিও বেশ খেতে পারতেন।' শুনে শরৎবাবু অবাক হয়ে গেলেন।

ভাইস-চ্যান্সেলারের পদলাভ

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ এ. এফ. রহমান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। তাঁর স্থানে নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার কে হবেন—এ প্রসঙ্গ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন ইংরেজ। রহমান সাহেব যখন সেখানে প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার হন, তখনই এ রকম একটা কথা হয়েছিল যে এরপর থেকে পালাক্রমে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু ভাইস-চ্যান্সেলার হবেন। এজন্য রহমান সাহেবের ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার সময় কোন আপত্তি ওঠেনি। মুসলমানদের আশা ছিল যে অন্তত পাঁচ বছর তিনি ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ অলংকৃত করবেন। তাদের আশা পূর্ণ হল না। তাঁর কার্যকাল এক বছরের বেশি হল না। সুতরাং পরবর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার একজন হিন্দু হবেন, কি কোন মুসলমান হবেন—এ নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে ওখানকার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল একাধিক নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার গভর্ণরের কাছে পাঠান; তার মধ্য থেকে তিনি একজনকে নির্বাচিত করেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আমার নাম প্রস্তাব হবে শুনে সেদিন সভায় আমি যোগ দিইনি। সুতরাং আলোচনা কিভাবে হয়েছিল সঠিক জানি না। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল চ্যান্সেলারের কাছে দুটি নাম পাঠান—আমার নাম এবং শহীদ সোহরাবর্দী, যিনি পরে অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন—তাঁর নাম। কিছুদিন পরে গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী একটি চিঠিতে জানালেন আমি যেন গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর কাছে গেলাম। নানা বিষয়ে তিনি আলোচনা করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন যে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকেই এরপর থেকে ঢাকা বোর্ড অফ ইণ্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশনের চেয়ারম্যানের কাজও করতে হবে এবং তার জন্য আলাদা কোন পারিশ্রামিক থাকবে না। গভর্ণর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি যদি ভাইস-চ্যান্সেলার হই তাহলে ঐ কাজের ভার নিতে আমি রাজী আছি কি না। আমি সম্মতি জানালাম। এই প্রশ্নটি করায় তখনই মনে হল যে বোধ হয় তিনি আমাকেই মনোনীত করবেন। বস্তুতঃ এর কয়েকদিন পরেই আমার মনোনয়নের খবর নিয়ে চিঠি এল।

এ প্রসঙ্গে একটি জ্যোতিষীর কাহিনী উল্লেখ করছি। রহমান সাহেবের পাঁচ

বছরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হবার কয়েক মাস পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমার কাছে এসে বলেন যে তাঁর পরিচিত একজন জ্যোতিষী ঢাকায় এসেছেন। জ্যোতিষীর বিশেষ ইচ্ছা যে তিনি একবার আমার হাত ও কোষ্ঠী গণনা করে দেখবেন। ঐ শিক্ষকটি ভাল করেই জানতেন এই ধরণের ভবিষ্যৎ গণনায় আমার তেমন কোন বিশ্বাস নেই। তবুও একবার জ্যোতিষীকে আমার হাত দেখাতে অনুরোধ করলেন। শিক্ষকটি জগন্নাথ হলেরই ছাত্র ছিলেন। সুতরাং তাঁর অনুরোধ এড়ান গেল না। জ্যোতিষী আমার বাড়িতে এসে আমার হাতটি পরীক্ষা করে দেখলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি আমাকে প্রথমে একটা ফুলের নাম করতে বলেন ; পরে কোষ্ঠীও দেখলেন। দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে বললেন, 'আর কয়েক মাসের মধ্যেই আপনার খুব বড় একটা পদোন্নতি হবে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'অন্য কোথাও কি আমার কোন বড় চাকরী হবে?' তিনি বললেন, 'না, এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পদোন্নতি হবে।' শুনে হেসে বললাম, 'তা সম্ভব নয়। কারণ রহমান সাহেব আরও চার বছরের বেশি ভাইস-চ্যান্সেলার থাকবেন। আমি এখন যে পদে আছি তার- থেকে উন্নতি মানেই ভাইসচ্যান্সেলার হওয়া, অতএব কয়েক মাসের মধ্যে উন্নতির কোন আশাই নেই।' তিনি বললেন, 'যাই বলুন, আপনার হাত দেখে নিশ্চিত বলছি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়েই দু'চার মাসের মধ্যে আপনার পদোন্নতি হবেই।' এ নিয়ে আর কোন কথা হল না। তবে জ্যোতিষীর কথায় আমি কোন আস্থা স্থাপন করিনি, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এর একমাস কি দেড়মাস পরেই রহমান সাহেব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হলেন এবং তার ফলে কিভাবে আমার পদোন্নতি ঘটল সেকথা পূর্বেই বলেছি।

এ কাহিনী পড়ে অনেকেরই হয়তো জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর খুব শ্রদ্ধা হবে। তবে সেটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সে বিচার আমি করতে চাই না। আমার জীবনের এই ঘটনাটির কথা এ জন্যই উল্লেখ করলাম যে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হওয়ার অনেক কাহিনী শোনা যায় ; কিন্তু অনেক সময়েই বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার ক্ষেত্রে যে ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছিল তাতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। তবে এটাও ঠিক যে তাঁর অন্য ভবিষ্যদ্বাণীর কতকটা ফলেছিল কতকটা ফলেনি।

১৯৩৭ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে পাঁচ বছরের জন্য আমি ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হই। পাঁচ বছর পার হয়ে গেলে আমার কার্যকাল আরও ছ'মাস বাড়ান হয়। ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন ঐ পদ থেকে আমি অবসর গ্রহণ করি। এই সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে আমার কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কৃষিবিদ্যা (Agriculture) সম্বন্ধে একটি নূতন বিভাগ আমার আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল

কলেজ স্থাপনের জন্যও আমি চেষ্টা করি। জগমোহন পাল নামে ঢাকার একজন ধনী ব্যক্তি এই কলেজ স্থাপনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন এবং তাঁকে আমি এই আশ্বাস দিয়েছিলাম যে মেডিক্যাল কলেজটি তাঁর নামেই হবে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলও আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে গভর্ণমেণ্টের কাছে এ রকম একটি কলেজ স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। সেই অনুসারে গভর্ণমেণ্ট একটি বড় কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে কলকাতার কয়েকজন বড় ডাক্তারও ছিলেন। তাঁরা সকলেই ঢাকায় এসে এ বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত করেন। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে রমনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ির পাশেই এই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে তার জন্যে হাসপাতাল প্রভৃতি অনেক বাড়ি দরকার, এ জন্য ভবিষ্যতে বিস্তৃত জায়গা লাগবে। শুরুতেই যদি একটা বড় জায়গা কেনা যায় তাহলে পরে বাড়ি তৈরির দরকার হলে কোন অসুবিধে হবে না। এ কারণে প্রস্তাব করি বুড়ীগঙ্গার তীরে যেখানে মেডিক্যাল স্কুল আছে তারই সংলগ্ন জমি যদি গভর্ণমেণ্ট এখনই কিনে রাখেন তাহলে ভবিষ্যতে বেশি দাম দিয়ে আর জমি কিনতে হবে না। কারণ একবার মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হলে পাশের জমির দাম সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে এবং জমিও তখন প্রয়োজনমত পাওয়া যাবে না। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রসারের পথে যে এ রকম বিঘ্ন দেখা দিয়েছে, সে কথাও উল্লেখ করি। অনেক বাদানুবাদের পরে কমিটি শেষ পর্যন্ত এই রকম একটি স্থানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সর্ব-সম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করেন। রিপোর্টটি গভর্ণমেণ্টও অনুমোদন করেন। তবে গভর্ণমেণ্ট বলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ কাজ আরম্ভ করা যাবে না। সুতরাং আমার কার্যকলাপের মধ্যে আর এই কলেজটি স্থাপিত হয়নি। এর পরে অবশ্য ঢাকায় ঐ কলেজ স্থাপিত হয়েছে। তবে বিশেষ দুঃখের বিষয় জগমোহন পালের নাম ঢাকার মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলও তা অনুমোদন করেছিলেন। এ সত্ত্বেও মেডিক্যাল কলেজের নামকরণ যখন জগমোহন পালের নামে হল না তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে এর প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্থান হয়ে গেছে ; এ প্রস্তাব গ্রহণ করার আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও পুঁথিশালা সমৃদ্ধ করার জন্য আমি নানারকম চেষ্টা করেছিলাম। এ বিষয়ে কিছু সফলতাও লাভ করেছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে বাংলাদেশের গভর্ণরের সঙ্গে অনেক বিষয়েই ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ আমার হয়। আমি যখন ভাইস-চ্যান্সেলার হই তখন গভর্ণর ছিলেন এণ্ডারসন সাহেব। খুব জবরদস্ত মানুষ। এককালে কঠোর হস্তে আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এজন্য তাঁর গভর্ণর পদে নিয়োগের খবর প্রকাশ হওয়া

মাত্রই এদেশে খুব আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে তাঁর যে পরিচয় পাই, তাতে তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাই ছিল। এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্ট নামে একটি সভা ছিল —এ অনেকটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অনুরূপ। তার সদস্যদের মধ্যে ৪০ জনকে গভর্ণর মনোনীত করতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে কোর্টের মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কোন সময় কম না হয়। কারণ ডীন, অধ্যাপক প্রভৃতি যে সব শিক্ষক পদাধিকার বলে কোর্টের সদস্য ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই হলেন হিন্দু। গভর্ণরের মনোনয়নের দ্বারা যাতে উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সমতা থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা ছিল।

আমি ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার পর গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী একটি গোপন চিঠি মারফৎ আমার কাছে জানতে চান নবগঠিত কোর্টে সম্প্রদায়গত সদস্যসংখ্যা ঠিক রাখার জন্য কতজন মুসলমান ও কতজন হিন্দু সদস্য মনোনীত করা দরকার। তিনি একথাও লেখেন যে গভর্ণর এ বিষয়ে আমার কাছ থেকে এই সংখ্যা অনুযায়ী একটি নামের তালিকা চেয়েছেন। সেইমত আমি যতজন মুসলমান এবং হিন্দু সদস্য হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি তিন চার জনের নাম দিয়ে একটি তালিকা পাঠিয়ে দিই। পরে দেখলাম যে যে নামগুলি আমি পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে একজন ছাড়া বাকী আর সকলকেই গভর্ণর মনোনীত করেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে মুসলমান রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা সমিতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেটের মতন কোর্টের ১৫ জন মুসলমান সদস্য নির্বাচিত করতে পারেন। ঐ কোর্ট গঠনের সময় ভোটিং পেপার পরীক্ষা করে বেশি ভোট পেয়েছেন এমন ১৫ জনের নাম যখন ঘোষণা করা হল, তখন কয়েকজন ভোটার এই মর্মে গভর্ণরের কাছে অভিযোগ করলেন যে 'এই ভোটিং পেপারের অনেক দাগ কোন রাসায়নিক উপায়ে মুছে ফেলে অন্য প্রার্থীদের নামে দাগ দেওয়া হয়েছে বলে তাঁরা শুনেছেন। অনেক পেপারেই এরকম কৃত্রিম উপাদানে দাগ বদলান হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।' গভর্ণর তখনই একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। তিনি তিনজনকে এই কমিটির সদস্য মনোনীত করেন—ঢাকার কমিশনার, জেলা জজ ও আমি। আমাকে তিনি আবার এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। কমিশনার ও জেলা জজ—এঁরা দুজনেই ছিলেন ইংরেজ। এঁদের বাদ দিয়ে আমাকে সভাপতি করার স্বপক্ষে এই যুক্তি ছিল যে ইতিপূর্বে যখন হার্টগ সাহেব ঢাকার ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন তখন গভর্ণর ঢাকার নাগরিকদের মধ্যে order of precedence হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকেই প্রথম স্থান

দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে কমিশনার ও জজের উপরে আমার নাম হয়। এ নিয়ে সাহেব মহলে অবশ্য বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

কিছুদিন পরে এই ধরনের আরও একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন মুসলিম হল তৈরি হবে। গভর্ণর তার ভিত্তি স্থাপন করবেন, এরূপ স্থির হয়। কথা ছিল গভর্ণর যখন ঢাকায় আসবেন, তখন এই ভিত্তি স্থাপন করা হবে। সে সময় বছরে দু'বার গভর্ণর ঢাকায় আসতেন। তাঁর সঙ্গে কর্মচারী, ভৃত্য মিলিয়ে আরও বহু লোক আসত। সাধারণতঃ ঢাকার নবাবের একটি বড় বাগানবাড়িতে তিনি এসে থাকতেন। ঐ ভিত্তি স্থাপনের সময় কোন একটি বিশেষ কারণে গভর্ণরের পক্ষে সদলে ঢাকায় এসে থাকা সম্ভব হল না। স্থির হল তিনি সকাল দশটার পেনে ঢাকায় আসবেন এবং ঐ হলের ভিত্তি স্থাপন ও লাঞ্চ সেরে বিকেলে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তখন সকলেই ভাবলেন এবং আমারও বিশ্বাস হয়েছিল যে লাঞ্চ হয়তো তিনি কমিশনারের বাড়িতেই খাবেন। কিন্তু গভর্ণরের সেক্রেটারি আমাকে জানালেন যে যেহেতু আমি ঢাকার 'ফার্স্ট সিটিজেন' সেজন্যে গভর্ণরের ইচ্ছা আমার বাড়িতেই লাঞ্চ খাবেন—ইঙ্গিত এই যে আমি যেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করি। সেইমত আমি গভর্ণরকে নিমন্ত্রণ করি এবং তিনিও তা গ্রহণ করেন। এতে ঢাকার অধিবাসীরা সকলেই খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু সাহেব, মেম-সাহেবরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং আমাকেও বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল।

ঢাকায় তখন বিপ্লবীদের খুব কর্মতৎপরতা চলেছে। সে কারণে গভর্ণরের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ থেকে নানা ব্যবস্থা হল। কলকাতা থেকে সি. আই. ডি. পুলিশ এল ঢাকায়। নির্দেশ এল গভর্ণরের নিমন্ত্রণের পূর্ব দিন থেকেই আমার চাকর বামুন কেউই বাড়িতে থাকতে পাবে না। পুলিশের লোকেরাই রান্না ও পরিবেশনের ভার নেবে। একদিন আগে থেকেই পুলিশ বাড়ির চারদিক ঘিরে রইল। কাদের নিমন্ত্রণ করব, সে তালিকাও আগেই পাঠাতে হল। এই ভোজসভায় শুধু আহার্য নয়, পানীয়রও ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। গভর্ণর কি ভালবাসেন সে খবরও সব আমার কাছে এল। পান ভোজনের জন্যে অনেকখরচও হয়েছিল আমার।

ঘটনাচক্রে এই দিনই আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকায় উপস্থিত হয়। আহারপর্ব শুরু হতে তখনও প্রায় একঘণ্টা বাকী। পুলিশ তাকে কোনমতেই আমার বাড়ি এসে খেতে দিল না; কেননা তার নাম নিমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিল না। তার জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা করতে হল।

মোটের উপর গভর্ণরের নিমন্ত্রণ ও আহারপর্বটি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। প্রচলিত আইনের মর্যাদা রাখতে গভর্ণর এক্ষেত্রে ইংরেজ কমিশনারের বদলে আমার বাড়িতেই আহার গ্রহণ করলেন। এই সব দেখে মনে হয়, সে-আমলে ইংরেজ শাসকদের একটি বড় গুণ ছিল এই যে, যে-নিয়ম তাঁরা তৈরি করেছেন তা তাঁরা মেনে চলতেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, যাতে প্রচলিত নিয়ম মেনে চলার দৃষ্টান্তটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নিয়ম অনুসারে গভর্ণরের বাড়িতে কোন ভোজের নিমন্ত্রণ থাকলে গভর্ণরের ঠিক ডানদিকের আসনে ভাইস-চ্যান্সেলারের স্ত্রীর বসবার কথা। প্রথম দুজন ইংরেজ ভাইস-চ্যান্সেলারের আমলে এই নিয়মই চলেছিল। তারপরের ভাইস-চ্যান্সেলার রহমান সাহেবের স্ত্রী পর্দানশীন ছিলেন ; গভর্ণরের ভোজসভায় উপস্থিত থাকতেন না। সুতরাং এ প্রশ্ন উঠেনি। আমি ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার পর শুনলাম এ নিয়ে স্থানীয় সাহেব মহলে বেশ গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আমি অবশ্য এ সব ব্যাপারে একরকম উদাসীনই ছিলাম। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী লাট সাহেবের ঠিক ডানদিকের আসনে আমার স্ত্রীর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

এই সব দৃষ্টান্ত দেবার উদ্দেশ্য এই যে ইংরেজ আমলে যেখানে তাদের স্বার্থের গুরুতর সংঘাত না হত সেখানে তারা শাসন ও সামাজিক ব্যাপারে প্রচলিত নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন এবং এর ফলে কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীরাও কদাচিৎ এই নিয়ম অনুসারে ভারতীয়দের তুলনায় কম সম্মান পেতেন। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। সেখানে মন্ত্রী বা উচ্চ সরকারী কর্মচারীর পদমর্যাদা নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে বলেই মেনে নেওয়া হয়।

আমি যখন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলাম সেই সময়ে মহম্মদ আলি জিন্না একবার ঢাকায় আসেন। জিন্না সাহেব তখন ভারতীয় মুসলমানদের অবিসম্বাদিত নেতা। ঢাকার মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানান হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য একটি সভা আহবান করা হয়। ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে আমি সেই সভার সভাপতি ছিলাম এবং সভাপতির কর্তব্য হিসাবে সভার প্রথমেই জিন্না সাহেবের পরিচয়সূচক কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলেছিলাম। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হল যে তাঁর সম্বর্ধনা সভায় একজন হিন্দু সভাপতি—এটা জিন্না সাহেব পছন্দ করেননি। পরে একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমানের কাছে শুনেছিলাম যে তিনি আমার ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন এবং ভারতীয় হলে যে একজন মুসলমানেরই পদে নিযুক্ত হওয়া উচিত—এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। তবে একথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করব যে স্থানীয় মুসলমানদের মনে এর জন্যে আমার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল বলে প্রমাণ পাইনি।

আমি সাড়ে পাঁচ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলাম। এই সুদীর্ঘকালে আমার নিজের কার্য সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা অনুচিত। তবে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কার্যে আমার সঙ্গে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের

সদস্যদের কখনও বিশেষ মনান্তর হয়নি। ঢাকার ডিভিশনাল কমিশনার এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। আমি বরাবরই তাঁর সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছি। ঢাকার রাজনৈতিক আন্দোলন যখন খুব তীব্র আকার ধারণ করে এবং আমাদের অনেক ছাত্র পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় তখনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি যথাসম্ভব সদয় ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। আমি যখন ইচ্ছা জেলে গিয়ে বন্দী ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে পারব, এই মর্মে তিনি একটি অনুমতিপত্র দিয়েছিলেন। এই রকম একটি আভাসও দিয়েছিলেন যদি ছাত্রেরা মুখে স্বীকার করে যে তারা সরকারের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না তাহলে তখনই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি মাঝে মাঝে জেলখানায় গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ মেধাবী ছাত্র ছিল। তারা যাতে পড়াশোনা করে এবং পরীক্ষা দেয় সেজন্য তাদের কাছে কমিশনারের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলাম। ছাত্ররা বলল, 'স্যার, আমরা এখানে বেশ ভালই আছি। এখানকার খাওয়া-দাওয়া হোস্টেলের চেয়ে খারাপ নয়, বরং ভালই। এখানে নির্বিবাদে পড়াশোনা করছি। সুতরাং পরীক্ষা দেওয়ার আগে পর্যন্ত এখানে থাকাই ভাল।' বস্তুত তাই হল। কমিশনার বললেন, 'আমি চাইনা যে তারা আমার কাছে একটা স্বীকৃতি দেয়। আপনার কাছে মুখে বললেই আমি আমি যথেষ্ট মনে করব।' এই ব্যবস্থায় পরীক্ষার অল্প আগেই আমি তাদের সবাইকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলাম।

আর একটি বিষয়ে তখনকার পুলিশের বড় সাহেবের অনুগ্রহে আমি ছাত্রদের কিছু উপকার করতে পেরেছিলাম। পুলিশের নিয়ম ছিল ছাত্ররা গ্রেপ্তার হলে তাদের পুলিশের জিম্মায় রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত; কখনও কখনও হাতকড়িও দেওয়া হত। এতে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। আমি পুলিশ সাহেবকে অনুরোধ করি যে তিনি যেন বন্দী ছাত্রদের ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যান। তিনি বললেন যে এ গাড়ির খরচ সরকারী নিয়ম অনুসারে দেওয়া যায় না। উত্তরে বললাম যে গাড়িভাড়া যা লাগে আমি নিজেই দেব; কিন্তু তিনি যেন নির্দেশ দেন এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করলে তাদের ঘোড়ার গাড়িতে জানালা বন্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তিনি একদিন আমায় বললেন, 'আজ আপনার চারজন ছাত্রকে গাড়ি করে জেলে নিয়ে গেছি।' আমি তখনই গাড়ী ভাড়া দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন, 'মাত্র চার আনা লেগেছে। ওর জন্য আর হাঙ্গামার দরকার নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। আমার পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলার ফজলুর রহমান সাহেব এ বিষয়ে একজন আদর্শ ছিলেন বললেও চলে। সাম্প্রদায়িক কোন ভাব মনে একেবারেই নেই, এ রকম তাঁর মতো আর দ্বিতীয় কোন মুসলমান আমি দেখিনি। অনেকটা তাঁর প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বেশ ভাল ছিল। আমি যখন

ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলাম সে সময় খুব বড় রকমের একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। সে একটা বিষম পরীক্ষা আমার উপর দিয়ে গেছে। সেই সংকটে ইংরেজ কমিশনারের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম। দাঙ্গার প্রথম দিনে সন্ধ্যার পর থেকে দলে দলে হিন্দু স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হিন্দু ছাত্রাবাসে এসে উপস্থিত হন। ছাত্রেরা সমস্ত ঘর তাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেরা হলঘরে রাত্রি যাপন করতে থাকে। এতগুলি মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের করতে হত। দুটি ছাত্রাবাসে প্রায় ছ' সাতশ হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিশু ও স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশি। তখন দোকান বাজার থেকে জিনিসপত্র কেনা সম্ভব ছিল না। কমিশনার আমাকে চারজন মিলিটারি রক্ষী দিয়েছিলেন। এরা চব্বিশ ঘণ্টা আমার বাড়িতে থাকত এবং আমি বাইরে কোথাও গেলে আমার দুপাশে দু'জন রক্ষী থাকত। এদের দু'জনের সাহায্যে ছাত্ররা দোকান বাজার করত। খবরাখবর নেওয়ার জন্য দু'টি হলে আমাকে যেতে হত। এই সময়ে হলের মধ্যেই একটি স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করেন। রক্ষীদের সাহায্যে তখন কোনমতে ডাক্তার ও ধাত্রী আনতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম।

এর মধ্যে একদিন মুসলিম হলের একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই রাস্তায় নিহত হয়। ফলে মুসলিম হলের ছাত্ররা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রোভোস্ট টেলিফোনে জানালেন যে অবস্থা খুব সঙ্গীন; ছাত্রদের আর শান্ত রাখা যাচ্ছে না। আমি কমিশনারকে ফোন করলাম। তিনি তখনই এলেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে আমি আমার দু'জন মিলিটারী রক্ষী নিয়ে মুসলিম হলে গেলাম। যাওয়ামাত্রই মুসলমান ছাত্রেরা আমাকে ও কমিশনারকে ঘিরে ফেলল। একজন বোধ হয় আমার কাঁধের উপর হাত দিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ একজন রক্ষী তাকে গুলি করতে বন্দুক তুলল। তার হাত ধরে আমি বারণ করলাম। এই রক্ষীটি নিজেও মুসলমান। সে পরে আমায় বলল, 'আমাদের চারজনের উপরেই হুকুম আছে যে আপনাকে রক্ষা করতে হবে এবং আপনার গায়ে কেউ হাত দিলে আমরা গুলি করতে পারব।' এই ঘটনাটি বিশেষ করে মনে আছে এই জন্যে যে, মুসলমান মিলিটারিও সামরিক আইন পালন করার জন্য মুসলমান ছাত্রকে গুলি করতে দ্বিধা করেনি। যাই হোক, অনেক কষ্টে আমরা ছেলেদের শান্ত করলাম। গোলমালটা সেযাত্রা অল্পের উপরেই মিটে গেল।

চারজন রক্ষীর মধ্যে দু'জন ছিল শিখ, আর দু'জন মুসলমান। সরকারী তরফ থেকে আমাকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে হিন্দু পাড়ায় যেতে হলে আমার সঙ্গে থাকবে শিখ রক্ষী; আর মুসলমান পাড়ায় থাকবে মুসলমান রক্ষী। শিখদের উপর মুসলমানদের রাগ ছিল, তারা শিখদের ভয়ও করত খুব। মুসলিম হলের ছাত্ররা একদিন বলেছিল, 'আমরা কথা দিচ্ছি আর কোন গোলমাল হবে না। আপনি কেবল ঐ শিখ দুটোকে সরিয়ে দিন।' বললাম, 'এতে আমার কোন হাত নেই। সবই সরকারী ব্যবস্থা। বাধা দিতে পারি না। তবে কথা দিচ্ছি, শিখ

রক্ষীদের কখনও মুসলিম হলের ধারে কাছে পাঠাব না। তাদের বারণ করে দেব যে কোন গোলমাল হলে আমায় না জানিয়ে তারা যেন কিছু না করে।'

এই হাঙ্গামার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার মনে করি। হাঙ্গামার তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে সকাল বেলা কলকাতা থেকে টেলিফোন পেলাম যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি প্রাইভেট প্লেনে বিকেল চারটের সময় ঢাকায় এসে পেঁছিবেন এবং আমার বাড়িতেই থাকবেন। বলা বাহুল্য স্যার আশুতোষের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে এই দায়িত্ব আমি সানন্দেই গ্রহণ করলাম। বেলা বারোটা কিম্বা একটার সময় কমিশনার ফোন করে জানালেন যে তিনি আমার বাড়িতে আসছেন। এসেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু নাকি ঢাকায় আসছেন? আমি তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন যে এই খবরে মুসলমানেরা খুব উত্তেজিত হয়েছে। নবাব বাড়িতে এক সভায় তারা ঠিক করেছে যাতে শ্যামাপ্রসাদবাবু ঢাকায় আসতে না পারেন তার জন্যে গভর্ণরকে অনুরোধ করা হবে। সম্ভবতঃ তারা কলকাতায় খবর দিয়েছে এবং সেইমত আমার উপর নির্দেশ এসেছে যাতে শ্যামাপ্রসাদবাবু ঢাকায় না থাকেন তার ব্যবস্থা করতে। আমি বললাম, শ্যামাপ্রসাদ এখানে এসে আমার বাড়িতে থাকবে বলেছে এবং আমি তাতে রাজী হয়েছি। সুতরাং আমার পক্ষে তাঁকে আসতে নিষেধ করা অসম্ভব। স্যার আশুতোষের কাছে আমি কি পরিমাণ ঋণী তাও বললাম। বললেন, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। আচ্ছা দেখি, কি করতে পারি।'

সম্ভবতঃ আমার ওখান থেকে তিনি নবাব বাড়ি গেলেন। মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছিল তা আমার জানা নেই। বেলা তিনটের সময় তিনি ফোন করে জানালেন যে তিনি আমার সঙ্গে এরোড্রোমে যাবেন। তিনি আমার বাড়িতে এলেন এবং আমরা একসঙ্গে এরোড্রোমে গেলাম।

শ্যামাপ্রসাদ যথাসময়ে ঢাকায় এসে পেঁছিলেন। কমিশনার তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন যে তাঁর ঢাকায় আসার জন্যে মুসলমানেরা খুব আপত্তি করছে। অতএব তিনি যেন অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে যান। শ্যামাপ্রসাদ রাজী হলেন না। বললেন, 'স্বেচ্ছায় ফিরে যাব না। আপনারা এখানে আমায় আটক করে রাখতে পারেন।' এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলল।

ইতিমধ্যে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময় পাইলট এসে জানাল যে এখন আর কলকাতায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন কমিশনার বললেন, 'আচ্ছা, আমি আপনাকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে থাকবার ভাল ব্যবস্থা করে দেব।' (ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ ৮ মাইল দূরে)। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, 'এই গোলমালের মধ্যে আমাকে ঢাকায় আসতে দিতে আমার মা কিছুতেই রাজী হননি। শেষে এই শর্তে তিনি অনুমতি দিলেন যে আমি ডঃ মজুমদারের বাড়িতে থাকব। এজন্যেই সকালে ডঃ মজুমদারের সঙ্গে ফোন করে থাকার ব্যবস্থা

করা হয়েছে জেনেই তিনি আমাকে আসতে দিয়েছেন। সুতরাং অন্য কোথাও থাকব না।'

এতক্ষণ আমি দু'জনের কথার মধ্যে কোন অংশ গ্রহণ করিনি ; চুপ করেই বসেছিলাম। এবার কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের কথা শুনে কমিশনারকে বললাম যে শ্যামাপ্রসাদ নিজে অস্বীকার না করলে আমি তাঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব ; কারণ আমি তাঁর মাকে কথা দিয়েছি। আমার ভরসায় তিনি তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। এর জন্যে আমার যাই ঘটুক, আমি কখনও তাঁকে ছেড়ে যাব না।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শ্যামাপ্রসাদের আসার পর বোধ হয় তিন ঘণ্টা পার হয়েছে। আমরা সকলেই তখন ক্লান্ত। অগত্যা কমিশনার শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। তিনি তখন খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এসেই আসন গ্রহণ করে আমার স্ত্রীকে বললেন, 'একটু চা পেলে খুশী হই। এই তিন ঘণ্টা আমার উপর দিয়ে ঝড় বড়ে গেছে। আপনার স্বামীর কাছে সব শুনবেন।' চা পান করে শ্যামাপ্রসাদকে আমার বাড়িতে রেখে তিনি চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে শ্যামাপ্রসাদের জীবন এখানে নিরাপদ নয়। সুতরাং আমি যেন তাঁকে মিলিটারি রক্ষী ছাড়া বেরতে না দিই এবং নিজেও না বেরই।

কমিশনার চলে যাবার পরে আমরা চা খেয়ে একটু সুস্থ হয়েছি, এমন সময় স্ত্রী এসে বললেন, 'এদিকে তো আর এক বিপদ।' বললাম, 'কি?' শুনলাম যে ঢাকার একজন মস্ত ধনীলোক সন্ধ্যার একটু আগে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন ; সঙ্গে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। তিনি নাকি খবর পেয়েছেন মুসলমানেরা সেদিনই রাত্রেই তাঁর বাড়ি লুট করবে। শুনে আমরা খুব বিস্মিত হলাম। একতলার কোণের ঘরে তিনি বসেছিলেন, আমরা সেখানে গেলাম। আমাদের দেখেই তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। বললেন যে, আজ ঢাকা শহরে আমার বাড়ি ছাড়া এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে তিনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আমার বাড়িতে মিলিটারি রক্ষী আছে। সকলেই জানে এ বাড়িতে কোন আক্রমণ হবে না।

আমি কিন্তু ভরসা পেলাম না। অথচ এই রাত্রে ভদ্রলোকটিকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও বলতে পারি না। শ্যামাপ্রসাদকে বললাম আপনিই এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করে দিন। এই বলে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। পরে শুনলাম শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি ঠিক করেছেন যে সেদিন রাত্রে তিনি এখানে থাকবেন, পরের দিন মিলিটারি পাহারা দিয়ে তাঁকে একটি নিরাপদ জায়গায় পেঁৗছে দেওয়া হবে।

শ্যামাপ্রসাদ তখন হিন্দু মহাসভার একজন বড় নেতা। তিনি ঐ ভদ্রলোকটিকে বললেন যে এখানে আশ্রয় না মিললে আপনার রক্ষা পাবার আজ কোন উপায়ই ছিল না—এ কথা আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন। হিন্দুদের

এই সব আপদে বিপদে রক্ষা করার জন্যই আমরা হিন্দু মহাসভা তৈরি করেছি। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আপনি মহাসভার সাহায্যে একটি মোটা টাকা চাঁদা দেবেন আশা করি। ভদ্রলোক বললেন, 'সে কথা কি আর বলতে, নিশ্চয়ই সাহায্য করব।' শ্যামাপ্রসাদ আমাকে বললেন, 'উনি নিজের মুখেই বলেছেন যে ওঁর সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। এর থেকে পাঁচ দশ হাজার টাকা আদায় করব।' পরের দিন এই ভদ্রলোক ব্যবস্থা মত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে কিন্তু একটি পয়সাও চাঁদা দিলেন না।

এদিকে আমরা এরোড্রোম থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর থেকেই অনবরত টেলিফোন আসতে থাকে। একদল বললেন যে শ্যামাপ্রসাদকে নিজের বাড়িতে রেখে আপনি ভাল করেননি। এর জন্যে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। আপনি তাঁকে এখনই কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। আরও তিন চার জন টেলিফোনে বললেন যে শ্যামাপ্রসাদকে মারবার জন্য মুসলমানেরা ষড়যন্ত্র করেছে। আপনার বাড়ির বাবুর্চিটি মুসলমান। সে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আপনি সাবধান হবেন। একথা বিশ্বাস করলাম না; তবে একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারলাম না। শ্যামাপ্রসাদকে একথা জানালাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা উপায় স্থির করা গেল। বাবুর্চির সামনে শ্যামাপ্রসাদ বলবেন যে তাঁর শরীরটা ভাল লাগছে না; মাছের ঝোল খেলে ভাল হয়। আমার স্ত্রী যদি ঝোল রাঁধেন ভাল হয়। উত্তরে স্ত্রী বলবেন যে হ্যাঁ, তিনিই রাঁধবেন। এর উদ্দেশ্য হল বাবুর্চি যেন না সন্দেহ করে যে আমরা তাকে অবিশ্বাস করছি। কদিনই এ রকম ব্যবস্থা ছিল। টেলিফোনের সব কথা বিশ্বাস না করলেও এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে রাজী হইনি।

পরের দিন শ্যামাপ্রসাদ কমিশনারকে বললেন যে তিনি হিন্দু নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে চান এবং শহরের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে চান। কমিশনার তার ব্যবস্থা করলেন। আমার বাড়িতেই নেতারা এলেন। কমিশনার ও আমি রক্ষী নিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে শহর ঘুরিয়ে দেখালাম। যতদূর মনে পড়ে শ্যামাপ্রসাদ ঢাকার নবাব এবং কয়েকজন মুসলমান নেতার সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শহরের অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। শ্যামাপ্রসাদ কলকাতায় ফিরে গেলেন। এরোড্রোমে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ঢাকার নবাব বললেন যে তিনি শহরের সব মহল্লায় গিয়ে দু'সম্প্রদায়ের কাছেই বক্তৃতা দেবেন। আমাকে তিনি সঙ্গে নিতে চান। এ শুনে আমার স্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিন্দু শিক্ষকেরা খুব আপত্তি করলেন, তাঁদের মতে এ সময় এভাবে যাওয়া সমীচীন হবে না। আমি কিন্তু ভেবে দেখলাম যে নবাবের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে হিন্দুদের ক্ষতিই হবে। আমি নবাবের প্রস্তাবে রাজী হলাম। যাবার আগে তিনি বললেন যে ঢাকার নবাবের এখনও

এই প্রতিপত্তিটুকু আছে যে তিনি সঙ্গে থাকলে আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। আমার স্ত্রীকেও তিনি সেই কথাই বললেন।

তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গম গলি দিয়ে শহরের নানা অঞ্চলে—হিন্দু ও মুসলমান—দুপাড়াতেই দু'তিন ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালেন। ফল মনে হয় ভালই হয়েছিল। এর পরেই হাঙ্গামা কমে যায়।

একটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ এতক্ষণ দিলাম। এ রকম হাঙ্গামা আরও তিন চারবার ঢাকায় হয়েছে। আমার ঢাকার কর্মজীবনে এইটিই সবচেয়ে বিষাদময় অধ্যায় বলে মনে করি। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলব যে শহরে মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিংএও এর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি; তবে দু'একটা ছোটখাট ঘটনা যে একেবারে ঘটেনি তা নয়। এই রকম একটি গুরুতর ঘটনার কথা এবার বলছি যাতে হিন্দু-মুসলমান দু'দলেরই সাম্প্রদায়িক মনোভাব বেশ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের ঢাকায় আসার কথা পূর্বে বলেছি। শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. উপাধি দেওয়ার কথা যখন প্রস্তাব করি তখন অনেকেই এ বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখাননি। হিন্দুদের মধ্যেও একটি সাহিত্যিক দল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—এঁদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকও ছিলেন—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্য বিভাগও আপত্তি করেন। অনেক কষ্টে তাদের বুঝিয়ে রাজী করালাম। মুসলমানরা বললেন যে শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. দেওয়া হলে একজন মুসলমান লেখককেও সেই সঙ্গে এই উপাধি দিতে হবে। তাঁদের বললাম এমন একজনের নাম করুন যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক এমন উপাধি দেওয়া যেতে পারে। তখনই তাঁরা কিছু বললেন না। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কয়েকদিন পরে বললেন যে মহম্মদ ইকবালকে এই উপাধি দেওয়া হোক। কবি হিসাবে ইকবাল তখন সারাদেশে বিশেষভাবে পরিচিত। আমি রাজী হলাম এই সর্তে যে ইকবালকে দেওয়া হলে তাঁরা শরৎবাবু সম্পর্কে কোন আপত্তি করবেন না। তাঁরা রাজী হলেন। যে কয়েকজন হিন্দু প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, তাঁরাও এবার মুসলমানদের মনোভাব দেখে আর কোন বাধা দিলেন না।

এই রকম ছোটখাট ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা যেত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের তাতে বিশেষ ব্যাঘাত হত না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার পূর্বে অফিসের কাজ দেখা-শোনা বা পরিচালনা করার কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। প্রথম প্রথম কাজে বেশ অসুবিধা হত। টেবিলে একের পর এক ফাইল আসতে থাকায় বিব্রত বোধ করতাম। কিছুদিনের মধ্যেই অফিসের কাজে অভ্যস্ত হলাম। অফিস সম্বন্ধে

নানা অভিযোগ আসতে থাকে। সেজন্যে দু' একটি নতুন পন্থা গ্রহণ করি। এরই কয়েকটি উদাহরণ এবার দিচ্ছি। ছাত্রেরা অভিযোগ করে যে মাইনে জমা দিতে গেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সময় পার হয়ে গেলে আর কোন মতেই টাকা নেওয়া হয় না ; তাদের ফিরে আসতে হয়। এই অভিযোগ যাচাই করে দেখবার জন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ একদিন একাউন্টস অফিসে হাজির হয়ে দেখি সত্য সত্যই বহু ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তখন রেজিস্ট্রারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ম করলাম যে মাইনে নেওয়ার দিন অফিসের অন্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে লোক এনে তাড়াতাড়ি টাকা নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নিয়ম অনুসারে কাজ ঠিক হচ্ছে কি না দেখবার জন্য মাঝে মাঝে অফিস ঘরে যেতাম। এতে সুফল হয়েছিল। ছাত্ররা আর অভিযোগ করেনি।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিযোগ ছিল যে বই পেতে অনেক দেরী হয়। এক্ষেত্রেও হঠাৎ লাইব্রেরীতে হাজির হয়ে তদন্ত করার ফলে ছাত্রদের অভিযোগ অনেক কমে যায়। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে অফিসের বড়কর্তা নিজে যদি মাঝে মাঝে প্রত্যেক বিভাগে একদিন হাজির হয়ে দেখাশোনা করেন, তাহলে অফিসের কাজ খুব ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। আমি বরাবরই এভাবে কাজ করেছি। সেটা শুধু কেরাণীদের বেলায় নয়, শিক্ষকদের সম্বন্ধেও আমার কাজের এই একই রীতি ছিল। একবার সায়েন্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে বলা হল যে এক একজন শিক্ষক একটানা তিন চার ঘণ্টা ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল কাজ দেখাশোনা করছেন , শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়ে কাজের সময় কমান উচিত। ঐ বিভাগের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই যে তিন চার ঘণ্টা ধরে ছাত্ররা প্র্যাকটিক্যাল করে শিক্ষকেরা কি ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত থেকে তাদের কাজ দেখাশোনা করেন ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' কিন্তু এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। একদিন বিকালে কেমিস্ট্রির প্রফেসর ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে গেলাম। চারজন। লেকচারারের থাকার কথা, কিন্তু গিয়ে দেখি একজনও উপস্থিত নেই। ছাত্ররা নিজে নিজে কাজ করছে। জ্ঞান ঘোষ খুবই লজ্জিত হলেন। কিন্তু সায়েন্সের শিক্ষকরা আমার উপর রুষ্ট হলেন। তাঁরা প্রশ্ন তুললেন হঠাৎ ল্যাবরেটরিতে আসার অধিকার আমার আছে কি না। এমন আপত্তির আশংকা করেই আমি জ্ঞান ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন জায়গায় যাওয়ার অধিকার আমার আছে—এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে শিক্ষকেরা আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না ; বাড়তি শিক্ষকের দাবীও তাঁরা ছেড়ে দিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় অনেক বড় বড় লোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার এসেছিল। এটি আমার জীবনের একটি গৌরবের কথা বলে মনে করি। যদুনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা পূর্বে বলেছি। ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার পর আরও কয়েকজন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

ভাবে মিশবার সুযোগ পাই। এঁদের মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নার কথা পূর্বেই বলেছি। এবার আর দুজনের কথা বলব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অলিখিত নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক বছর বাইরে থেকে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে কনভোকেশনে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হত এবং পালাক্রমে এক বছর একজন হিন্দু ও পরের বছর একজন মুসলমান নির্বাচিত হতেন।

১৯৩৮ সালে স্যার আকবর হায়দারীকে নিমন্ত্রণ করা হয়। স্যার আকবর হায়দারী ডাক বাংলোয় থাকতেন; কিন্তু আমার অতিথি ছিলেন ও প্রায়ই আমার বাড়িতে আসতেন ও পান খেতেন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার অনেক কথা-বার্তা হয়। সে সব প্রসঙ্গ এখন আর আমার মনে নেই, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর তীক্ষ্ন বুদ্ধি, প্রগাঢ় কূটনীতি জ্ঞান এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে উদার মত আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সে সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, নিজাম তাঁর হাতের পুতুল। তিনি খুব ধনীও ছিলেন। ঢাকায় কি কি ভাল জিনিস পাওয়া যায় সে কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। নমুনা হিসাবে তিনি কিছু কিনে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তখনই ঢাকাই তাঁতের শাড়ীর ব্যবসায়ী এবং শঙ্খ ও রুপার সূক্ষ্ম তারের কাজ বা অন্যান্য ধাতুর দ্রব্য নির্মাণে দক্ষ কারিগরদের খবর দিলাম। তিনি প্রচুর কাপড়, তার মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশখানা শাড়ী কিনলেন। অন্যান্য শিল্প সামগ্রীও বহু টাকার কিনলেন। আমার মনে হয় অন্ততঃ দু'তিন হাজার টাকার জিনিস তিনি কিনেছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে অনেক জিনিস উপহার দিলেন। তার মধ্যে দু'একটি বিদরীর কাজ-করা জিনিস এখনও সযত্নে আমার বাড়িতে রক্ষিত আছে। বস্তুতঃ স্যার আকবর যেরূপ মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং অকৃত্রিম বন্ধুবৎসল ছিলেন তার অনেক পরিচয় ঐ দু'তিন দিনের মধ্যে আমি পেয়েছিলাম। এই সামান্য পরিচয়ের সূত্রে পরবর্তী জীবনে আমি একবার খুবই উপকৃত হয়েছিলাম।

স্যার আকবর ঢাকায় আসার তিন চার বছর পরে আমি একবার সস্ত্রীক বোম্বাই গিয়েছিলাম কোন কাজ বা সভাসমিতি উপলক্ষে। সেখানে হঠাৎ স্যার আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অনেক কথাবার্তা এবং ঢাকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি আমাদের দু'জনকে কলকাতায় ফেরার পথে অজন্তা দেখে যাবার আমন্ত্রণ করলেন। অজন্তা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত এবং সেখানে নিজামের অনেক বড় বড় অতিথিশালা আছে। স্যার আকবর বললেন যে, আমাদের অজন্তা দেখার সব ব্যবস্থা করে দেবার জন্য তিনি ঐ গুহার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছেন। আমি অবশ্য পনের কুড়ি বছর পূর্বে একবার অজন্তা গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী কখনও সেখানে যাননি। স্যার আকবরের অতিথি হয়ে থাকলে খুব আরামে থাকা যাবে, এই ভেবে আমি সম্মত হলাম।

এই অজন্তা দর্শনের কথা খুব সংক্ষেপে বলছি, যদিও ব্যাপারটি আদৌ সংক্ষেপে হয়নি। ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা বোম্বাই থেকে রওনা হয়ে জলগাঁও স্টেশনে নেমে দেখলাম যে নিজামের একজন কর্মচারী প্রকাণ্ড একটি মোটরগাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মালপত্র সব অন্য একটি গাড়িতে তুলে তিনি আমাদের সেই বড় গাড়িতে বসিয়ে চললেন। পঞ্চাশ ষাট মাইল বেগে গাড়ি ছুটে চলল। অতিথিশালায় পৌঁছে তার আসবাবপত্র দেখে তো আমাদের চক্ষুস্থির। শোবার খাটের পায়া ও রেলিং সব ঘষা কাঁচের তৈরী। সেই অনুপাতে স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা। কর্মচারীটি বললেন যে, লর্ড কার্জন যখন অজন্তা পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন তাঁর জন্য ঐ অতিথিশালা ও আসবাব তৈরী করা হয়েছিল। স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি কথা আমার মনে পড়ল। হয়তো আমার জন্মের ছয় দিনের দিন বিধাতাপুরুষ আমার কপালে লিখে দিয়েছিলেন যে রাজঅতিথির সম্মান পাব। তাই তিন দিন এমনভাবে সমাদরে কাটিয়ে গেলাম। খাওয়ার ব্যবস্থাও, বলাই বাহুল্য, রাজকীয় ধরনের—নানাবিধ মাছ মাংস ছাড়া কত রকমের ফল যে আসত তার ঠিক ঠিকানা নেই। কর্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, আওরঙ্গবাদ বা ঐ রকম দূরের কোন জায়গা থেকে খাবার জিনিস সব আনা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সর্বদাই আমাদের তত্ত্বতলাস করতেন। বারেবারেই মনে করিয়ে দিতেন কোন অসুবিধে হলেই যেন তাঁকে জানাই। তিনি পাঁচ-ছশ' টাকা মাইনে পান ; যদি অতিথিদের অসুবিধের কথা স্যার আকবরের কানে যায় তাহলে তাঁর চাকরি থাকবে না। তাঁকে অভয় দিয়ে বললাম যে, আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমি ফিরে গিয়েই চিঠি দিয়ে জানাব যে এখানে আমরা পরম সুখে ছিলাম। শুনে তিনি বললেন, 'হুজুর! যদি এই কথাটি লিখে দেন তাহলে হয়তো আমার চাকরিতে উন্নতি হবে। মন্ত্রীমশাই যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি একজন আমীর ওমরাহ লোক এবং তাঁর বিশেষ বন্ধু।' বললাম, 'আমীর ওমরাহ নই, তবে বিশেষ বন্ধু বলতে পারেন।' আসবার দিন বললাম যে, যদি তিনি কিছু মনে না করেন আমি তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বললেন, বলুন, 'কি আপনার কথা?' বললাম, 'যে রকম খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা তাতে বড় কৌতূহল হচ্ছে জানতে, আমাদের দু'জনের এই তিনদিন থাকার জন্যে কত খরচ পড়েছে?' তিনি একটু হেসে বললেন, 'সে এমন কিছু নয়। আমাকে তো সব বিল রাখতে হয়। সব মিলিয়ে ধরুন দেড়হাজার টাকার মতো।'

কলকাতায় ফিরে এসে স্যার আকবরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীটির প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছিলাম। কর্মচারীটির চাকরিতে কোন উন্নতি হয়েছিল কি না অবশ্য জানি না।

পরের বছর (১৯৩৯) কনভোকেশনে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এলেন

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি আমার বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কেউ ছিলেন না। সরোজিনী নাইডু তখন কংগ্রেসের একজন বড় নেত্রী। তাঁর কবিত্ব এবং বাগ্মিতার খ্যাতি বহুদিন ধরেই শুনে আসছি। এবার সাক্ষাৎ পরিচয়ে তাঁর জীবনী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা হল। তিনি কলকাতা থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ এবং সেখান থেকে স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ এলেন।' আমি গাড়ি নিয়ে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে আনব, এমন কথা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের মনোমালিন্য হয় এবং সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই নিয়ে বাংলা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। সরোজিনী নাইডু গান্ধিজীর দলে ছিলেন। তাঁর পেঁছনর দু'এক দিন আগে আমি সংবাদ পেলাম যে, ঢাকা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ কালো নিশান দেখিয়ে শ্রীমতী নাইডুকে অপমান করবে। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা আসার পথেই ছাত্রেরা এই বিক্ষোভ দেখাবে শোনা গেল। তখন একদল শিক্ষক বললেন তাহলে ট্রেনে করেই শ্রীমতী নাইডুকে ঢাকায় আনা হোক। আমি কিন্তু সব বিষয় চিন্তা করে পূর্বের ব্যবস্থা ঠিক রাখলাম।

আমি নিজে গাড়ি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে গেলাম। সঙ্গে দু'একজন শিক্ষকও ছিলেন। নারায়ণগঞ্জ ঢাকা শহর থেকে আট মাইল দূরে। নারায়ণগঞ্জ থেকে রওনা হয়ে প্রায় ছ'সাত মাইল আসার পর ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে রাস্তার উপরে দেখলাম বহু ছাত্র কালো নিশান হাতে নিয়ে পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামাতেই হল। ছেলের দল 'শেম' 'শেম' বলে চীৎকার করতে লাগল। আমি গাড়ি থেকে নেমে তাদের কাছে গিয়ে বললাম যে, তোমাদের যা অভিপ্রায় তা তো সিদ্ধ হয়েছে। আর বাধা দেবার কোন মানে হয় না ; পথ ছেড়ে দাও এবার। দেরী হয়ে যাচ্ছে। অতিথির খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দু'একজন ছাত্র বাধা দিলেও অন্যেরা সবাই আমার কথায় শেষ পর্যন্ত রাজী হল। সরোজিনী নাইডু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ?' বললাম, 'এ তো আপনাদেরই শিক্ষা। যে আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে, তাকে কালো নিশান দেখাতে আপনারাই শিখিয়েছেন। এই ছেলেরাও তাই এ রকম আচরণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এ ঠেকাবার কোন সাধ্য নেই, বরং বাধা দিতে গেলে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়াত। আপনি যেন এতে কিছু মনে করেন না।' তিনি বললেন, 'এটা ঠিকই। সুভাষ বোসের নিজের দেশে যে এটা হবে তা মোটেই আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক নয়।' এরপর নির্বিবাদে আমরা বাড়ি এসে পেঁছলাম।

শ্রীমতী নাইডু বাড়িতে এসেই আমার স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে বেশ ভাব করে নিলেন। একেবারে ঘরোয়া লোকের মতো তাঁর ব্যবহার। তাঁর এমন ঘরোয়া আচরণের একটি কথা আমার মনে আছে। প্রথম দিন রাত্রে খেতে বসেছি, বাবুর্চি'রা ডিশে করে মুর্গীর মাংস এনে খাবার টেবিলে রেখেছে। শ্রীমতী নাইডু

আমার স্ত্রীকে বললেন, 'আমি মুর্গীর gizzard খেতে খুব ভালবাসি। আপনি নিজের হাতে ওটা আমায় বেছে দিন।' প্রথম দিনেই নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভেবে আমাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলায় আমরা দুজনেই—আমার স্ত্রী ও আমি—খুব খুশী হয়েছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রীমতী নাইডু চার পাঁচটি ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রতিদিন কোন সভায় যাওয়ার আগে এবং বিশেষতঃ দ্বিতীয় দিনে কনভোকেশনে যাবার আগে তিনি আমার মেয়েকে ডেকে বললেন, 'দেখতো, আমার শাড়ীর ঝুল ঠিক আছে কিনা এবং জুতো ও জামা শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করছে কি না।' এই কথা শুনে আমার স্ত্রী তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। শ্রীমতী নাইডু বললেন, 'না, না, আপনি নয়। আপনি সেকেলে মানুষ—আপনার দ্বারা হবে না। ঐ মেয়েই ঠিক বলবে।' আমার স্ত্রীর চেয়ে শ্রীমতী নাইডুর বয়স অন্তত কুড়ি বছর বেশী হবে। কিন্তু প্রতিদিন পোষাক পরিচ্ছদে আধুনিক হওয়ার জন্যে তিনি আমার মেয়েকে ডেকে তার মত জিজ্ঞাসা করতেন।

এর কয়েক বছর পরে আমার ঐ মেয়ের যখন বিয়ে হয় তাঁকে নিমন্ত্রণ করে চিঠি দিই। তিনি তখন উত্তর প্রদেশের গভর্ণর। বর কনেকে আশীর্বাদ জানিয়ে যে টেলিগ্রাম তিনি করেন সেটি বিয়ের দিনেই এসে পৌঁছয়।

এইবার শ্রীমতী নাইডুর ব্যক্তিত্বের আর একটি দিকের কথা বলি। ঢাকায় আসার পর দ্বিতীয় দিনে তিনি কনভোকেশন ভাষণ দিলেন। এর বহু পূর্বেই সরকারের তরফ থেকে আমার কাছে এই মর্মে চিঠি এসেছিল যে, তাঁর ভাষণের একটি কপি দশ বার দিন আগেই যেন সরকারের কাছে পাঠান হয়। গভর্ণরের অনুমতি নিয়েই আমি শ্রীমতী নাইডুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তবে জানতাম যে এ বিষয়ে সেক্রেটারীদের মত ছিল না। কারণ শ্রীমতী নাইডু ছিলেন কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধীর দলের বড় চাঁই। তখন সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসেব বিরোধ বেশ পাকিয়ে উঠেছে। যাই হোক সরকারী চিঠি পেয়েই আমি শ্রীমতী নাইডুকে তাঁব ভাষণের কপি পাঠাতে অনুরোধ করে চিঠি লিখলাম। তার উত্তরে তিনি জানালেন যে, তিনি কখনও লিখে বক্তৃতা দেন না, যা বলবেন সবই সভাগৃহে মুখে মুখে তৈরী করে। এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে আমার পত্র বিনিময় হল। বক্তৃতার কপি না হোক সারাংশ জানালেও চলবে। শ্রীমতী নাইডু সারাংশও লিখলেন না। সরকার অগত্যা শেষ পর্যন্ত মুখে মুখে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা মেনে নিলেন।

কনভোকেশন অনুষ্ঠানে তিনি যে অপূর্ব বাগ্মিতা সহকারে সুললিত ও আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা শুনে শ্রোতারা সবাই একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত। বিশাল কার্জন হল নিস্তব্ধ, কারুর মুখে কোন সাড়া নেই। গভর্ণরের স্টেনো এবং আমার স্টেনো দু'জনের প্রতিই নির্দেশ ছিল শ্রীমতী নাইডুর ভাষণ লিখে রাখার। অনুষ্ঠান শেষে তারা বলল যে, যে গতিতে তিনি

বলে গেছেন তাতে তাদের সাধ্য নেই সর্টহ্যাণ্ডে তা লিখে রাখার। বলাবাহুল্য এরা দুজনেই খুব দক্ষ স্টেনো ছিলেন।

শ্রীমতী নাইডুর এই কনভোকেশন ভাষণটি অবশ্য লিখে রাখা হয়নি। তাঁর ভাষণে তিনি ছাত্রদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল—ছাত্ররা সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে যেন মন দিয়ে লেখাপড়া করে; তারা যেন কোন দলাদলিতে যোগ না দেয়। অনেকেই বললেন যে, এটা কালো পতাকা প্রদর্শনের ফল।

কনভোকেশন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন সভা সমিতিতে সরোজিনী নাইডু তিন চারটি ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রত্যেক ভাষণে তাঁর বাগ্মিতা, গভীর জ্ঞান এবং দেশবাসীর প্রতি গভীর সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে শ্রোতারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন এবং ঢাকার জনসাধারণের নিকট সরোজিনী নাইডুর খ্যাতি খুব বেড়ে গিয়েছিল।

বাংলাদেশের তখনকার গভর্নর সার জন উডহেড (Sir John Woodhead) চ্যান্সেলার হিসাবে কনভোকেশন উৎসবে সভাপতি ছিলেন, তিনিও শ্রীমতী নাইডুর বক্তৃতা শুনে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করার বাসনা আমার কাছে জানালেন। আমি শ্রীমতী নাইডুকে সেকথা বলায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করলেন। কারণ তখন জাতীয় কংগ্রেস এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তার নেতাদের মধ্যে কেউই লাট বেলাট বা অন্যান্য বড় ইংরাজ রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করবেন না। আমি তো মুশকিলে পড়লাম; যে কারণে শ্রীমতী নাইডুর অনিচ্ছা সেটা গভর্নরকে জানান সঙ্গত মনে করলাম না। আমি শ্রীমতী নাইডুকে বললাম যে, গভর্ণর আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে যেতে। এখন যদি আপনি না যান, আমাকে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত ও অপদস্থ হতে হবে। এতেও তিনি রাজী হলেন না; তবে একটু নরম হলেন। তখন তাঁকে বললাম যে আপনি ভুলে যান যে আপনি একজন লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করা আপনার কর্তব্য। দেখা না করলে বরং অশোভন দেখাবে। কংগ্রেস লাট বেলাটের সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন। আপনি তো লাটসাহেব হিসেবে তাঁর কাছে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের কাছে। আপনি এ দিকটা একটু ভালকরে বিবেচনা করে দেখুন। এই যুক্তিতে কাজ হল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা আমি যেতে পারি যদি চ্যান্সেলার আমার কয়েকটি শর্ত মেনে নেন। প্রথম, আমার যাবার কথা বাইরের কাগজে বা সরকারী সার্কুলারে প্রকাশিত হবে না এবং গভর্ণরের দৈনিক ভিজিটারস লিস্টে আমার নাম থাকবে না। দ্বিতীয়, আমি যখন চ্যান্সেলারের কাছে যাব তখন তাঁর সেক্রেটারী বা অন্য কোন কর্মচারী উপস্থিত থাকতে পারবেন

না ; চ্যান্সেলার একাই থাকবেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে চলে আসব।' আমি গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাঁকে জানালাম। তিনি এ দুটি শর্তই মেনে নিলেন এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন জানালেন।

সকাল ন'টা দশটার মধ্যে আমি শ্রীমতী নাইডুকে নিয়ে চ্যান্সেলারের বাসভবনে উপস্থিত হলাম তখন কর্মচারী তো দূরের কথা চাকর বাকর বা দারোয়ান পর্যন্ত কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না। আমরা গাড়ি থেকে নামতেই চ্যান্সেলার নিজে এসে শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি চারদিকে লক্ষ্য করে দেখলাম জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। একটি ঘটনায় এই অবস্থাটি একটু হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হল। প্রায় আধঘণ্টা কথাবার্তার পর শ্রীমতী নাইডু জল খেতে চাইলেন। চ্যান্সেলার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনারই শর্তমত চাকর দারোয়ান কাউকেই এখানে রাখিনি। আমি নিজেই জল আনতে যাচ্ছি।' এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং দু'এক মিনিট পরে এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। আমি বেশ বুঝতে পারলাম শ্রীমতী নাইডু নিজেই একটু লজ্জিত হয়েছেন। বাড়ি ফিরে এসে তিনি চ্যান্সেলারকে এই কারণে খুবই প্রশংসা করলেন, বললেন, 'রাজনৈতিক কারণে ইংরেজদের আমরা যতই গালমন্দ করি না কেন, এইভাবে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যে সদাশয়তা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়।" চ্যান্সেলারের সঙ্গে শ্রীমতী নাইডুর ঠিক কি কথাবার্তা হয়েছিল তা আজ আমার বিশেষ মনে নেই। তবে তার বেশীর ভাগই ছিল সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে। ভারতীয় নারী-সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে অনেক আলোচনা হয়। গভর্ণর শ্রীমতী নাইডুর ইংরাজী কবিতার খুব প্রশংসা করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে দু'একটি কবিতা নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল।

স্যার আকবর হায়দারী, শ্রীমতী নাইডু, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই চারজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ আমার ঢাকার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা বলেই মনে করি। এ ছাড়া আর দু'জন অতিথির কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। এঁদের একজন হলেন জার্মান পণ্ডিত Luders—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে ইনি একজন অসাধারণ খ্যাতিমান পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অতি সুপণ্ডিত এবং এঁর প্রধান কীর্তি হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে তিনশ' খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যত প্রাচীন শিলালেখ (inscription) এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রণয়ন। প্রত্যেকটি লেখর সারমর্মও তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রায় ১৪০০ প্রাচীন লেখর তিনি বিবরণ দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস যাঁরাই আলোচনা করবেন তাঁদের পক্ষে এই Luders' List একান্ত অপরিহার্য। এটি না থাকলে ছাত্র ও গবেষকদের যে কি অসুবিধায় পড়তে হত তা এককথায় বলা যায় না। ইনি ঢাকায় এলে আমি তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ

করেছিলাম। নিমন্ত্রণের সময়ের অনেক পূর্বেই তিনি আমার বাড়িতে এসে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা ও আলাপ শুরু করেন। আমার বড় মেয়ে তার অটোগ্রাফের খাতায় তাঁকে কিছু লিখে নাম সই করে দিতে অনুরোধ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ চার লাইনের একটি সংস্কৃত শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে লিখে দিলেন এবং নীচে ঐ অক্ষরেই নিজের নাম সই করে দিলেন। আমার বাড়ির আঙ্গিনায় এই চায়ের আসরের ব্যবস্থা হয়েছিল। কেক প্যাস্ট্রি ইত্যাদি বিদেশী খাবারের চেয়ে নানা ধরনের দেশী খাবারেরই বেশি আয়োজন করা হয়েছিল। বিদেশী খাবার না নিয়ে তিনি দেশী খাবারই বেশি নিলেন এবং খেয়ে বললেন যে, তা তার খুবই ভাল লেগেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এবং শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই আসরে হাজির ছিলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে অমায়িক ভাবে আলাপ করলেন। ঢাকায় তিনি আরও দু' একদিন ছিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে সে সময় দেখা করেছিলাম। তাঁর অসামান্য বিনয় ও সৌজন্যের কথা আজও আমার মনে পড়ে।

এঁর জীবনের পরিণাম বড় শোচনীয়। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের পরে তাঁর অকস্মাৎ তিরোধান হয়। এদেশে অনুসন্ধান করে আমরা যতদূর জেনেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিটলারের অনুচরেরাই তাঁকে হত্যা করেছিল। এই সময়ে তিনি প্রাচীন ভারতের আর একখানি লেখসংগ্রহ প্রকাশের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকগুলি লেখ সংগ্রহ করে তিনি তার বিবরণ লিখেছিলেন। এ সম্বন্ধে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর অনেক পত্রবিনিময় হয়। আমার যতদূর স্মরণ আছে তাতে মনে হয় যে, ভারত সরকারই এই বই প্রকাশ করবেন এরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাঁর প্রথম লেখসংগ্রহটিও ভারত সরকারই প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাঁর যখন আর কোন সন্ধানই মিলল না, তখন ভারত সরকার বিলাতের কর্তৃপক্ষর সাহায্যে ঐ দ্বিতীয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। Luders এর চিঠি থেকেই জানা গিয়েছিল যে তিনি এই তালিকাটি প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন। লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ এই পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এভাবে পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট হওয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে পক্ষে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

এইবার দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা বলব। এঁর নাম হল সৈয়দ মামুদ। ঢাকার পুরনো নবাব বংশে এঁর জন্ম। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে এখন ঢাকার নবাব বলে যাঁরা পরিচিত উনিশ শতকের আগে তাঁদের কোন প্রসিদ্ধি ছিল না। মুসলমান যুগে বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁর বংশধরেরা আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত ঢাকায় বেশ মান সম্ভ্রমের সঙ্গে বসবাস করতেন। সেই সময় একজন কাশ্মীরী শালওয়ালা প্রতি বছর তাঁদের কাছে শাল বিক্রয় করতে আসত। সেই

শালওয়ালা পরে খুব ধনী হয়ে জমিদারী কেনেন এবং নবাব উপাধি পান। ঢাকার নবাব গণি মিঞা এঁরই বংশধর এবং তিনি একজন খুবই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমানে ঢাকার নবাব বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এঁরই বংশধর।

পুরনো শায়েস্তা খাঁর বংশধরেরা তখনও ঢাকায় ছিলেন। তাঁদের তখন খুবই দৈন্যদশা; সৈয়দ মামুদ এই বংশেরই সন্তান। তিনি আমেরিকার কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সেই উপলক্ষে ঢাকায় এসে তিনি আমার বাড়িতে অতিথি ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে তাঁদের বংশের পুরনো ইতিহাস শোনালেন। সেই বংশের যিনি বর্তমান কর্তা, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি পুরনো নবাব বাড়িতে গেলেন। পরের দিন সেই বৃদ্ধ আমার বাড়িতে এসে সৈয়দ মামুদের সঙ্গে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে রাত্রে তাঁর বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা সকলে একসঙ্গে গেলাম। বাড়িটি বেশ বড় হলেও তখন ভগ্নদশায়; নবাব বংশের বর্তমান দুর্দশার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তাঁদের সৌজন্য ও আদবকায়দায় আমি ও আমার স্ত্রী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। নবাববাড়ির মানুষদের কথাবার্তা এবং আচরণ আমাদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরব ও মর্যাদা যে তখনও কতদূর টিকে ছিল তা বেশ বোঝা গেল। নবাব বাড়ির মেয়েরা পর্দানশীন; তাঁরা বাইরে বেরুলেন না। আমার স্ত্রীকে অবশ্য তাঁরা অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে অন্তঃপুর-বাসিনীদেরও এমনই সৌজন্য ও আভিজাত্যের কথা শুনেছিলাম। ঢাকার এই প্রাচীন নবাব বংশের ইতিহাস ও সৌজন্যের কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

সৈয়দ মামুদ ছিলেন অতি সুপুরুষ ও প্রতিভাশালী। তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং সকলের মুখেই তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর বক্তৃতার বিষয়ে একটি কথা বিশেষভাবে আজও আমার মনে আছে। প্রত্যেকটি বক্তৃতা তিনি ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ করতেন—একেবারে ঘড়ির কাঁটার কাঁটায় মিলিয়ে। অথচ লেখা বক্তৃতা তিনি পাঠ করতেন না। এটা আমেরিকায় বসবাস করার ফল বলে মনে হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তী কালে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। বিশেষতঃ পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব সৌহার্দ্য ছিল এবং এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু নানা কারণে তা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত হবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর তিনি মিশরে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে। তবে তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি।

ভারত ভ্রমণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রায় একুশ বছর ছিলাম ; এর মধ্যে ভারতের প্রায় সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ায় এভাবে ঘুরে দেখার বিশেষ সুযোগ হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম হল—ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন, অল-ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স, ইণ্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস ও ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স—এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের আমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এদের প্রায় সব অধিবেশনে আমি যোগ দিতাম এবং যখনই কোন জায়গায় যেতাম তখন অধিবেশন শেষ হলে তার কাছাকাছি জায়গাগুলি ঘুরে দেখতাম। তখনকার দিনে দক্ষিণ ভারতের রেল কোম্পানী এক রকম টিকিট বিক্রয় করতেন তাতে একটি নির্দিষ্ট ভাড়া দিলেই ঐ লাইনের যে কোন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার ইচ্ছা ঘুরে বেড়ান যেত। এমনি এক টিকিট কিনে সস্ত্রীক নানা জায়গায় ঘুরেছি। তার মধ্যে কয়েকটি জায়গার কথা বিশেষভাবে মনে আছে, যেমন, হায়দ্রাবাদ, বিজয়নগর, ত্রিবাঙ্কুর, কন্যাকুমারী, ত্রিচিনাপল্লী, মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, মাদুরা, মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থ, মহীশূর, শ্রীরঙ্গপত্তম। এছাড়া উত্তর ভারতের জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানেও গিয়েছি। এদের মধ্যে অনেক জায়গাতেই স্টেট গেস্ট হিসেবে থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। সুসজ্জিত ঘর, আহারের প্রাচুর্য এবং ঘুরে বেড়ানর জন্য একটি মোটর গাড়ি সর্বদাই আমার তাঁবে থাকত। বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর এবং হায়দ্রাবাদে যে রকম রাজসিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামে ছিলাম তা আমার পূর্বজন্মের বহু সুকৃতির ফল বলেই ধরে নিতে হবে।

আর একটি ভ্রমণ বিশেষভাবে স্মরণীয় বলেই তার কথা এখানে একটু বিস্তৃতভাবে লিখছি। একবার পেশোয়ারে ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের অধিবেশন হয়। সেই উপলক্ষে অধিবেশনের কর্তৃপক্ষরা আমাদের 'খাইবার' গিরিপথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই ইতিহাসে 'খাইবার' গিরির সংকটের কথা পড়ে আসছি। এই পথেই বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। যখন মোটরে সেখানে যাই তখন বারে বারে মনে পড়ছিল যে এই সংকীর্ণ গিরিপথটি ভারতের অতীত ইতিহাস গঠনে কিভাবে সাহায্য করেছে।

'খাইবার' গিরিপথে আমাদের গাড়ি যেখানে গিয়ে থামল সেখানে একটি লৌহকপাট ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমান্ত নির্দেশ করছে। কপাটের ওদিকে আফগান সৈন্য এবং পুলিশ; কপাটের এদিকে ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশ। গ্রিল দেওয়া গেটের মধ্য দিয়ে লোকজন বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, দু'পক্ষে কথাবার্তাও হয়। কিন্তু গেট পার হলে আর রক্ষে নেই। ভারতের কোন লোক যদি গেট পার হতেন, তখনই তাকে ধরে একেবারে সোজা কাবুলে চালান করে দেওয়া হত—এই রকমই নিয়ম ছিল। একবার একটি আট দশ বছরের ছোট ছেলে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে চা বিক্রি করছিল। গেটের ওধারের এক কাবুলী সৈন্য তার কাছে চা চায়। ঐ সৈন্যটি চা নেবার জন্য দরজা খুলে দাঁড়ায়। ছোট ছেলেটি হাত বাড়িয়ে চা দেবার সময় ভুলে দরজা পার হয়ে ওপারে চলে যায়। যাওয়ামাত্রই কাবুলী সৈন্যরা তাকে ধরে কাবুলে পাঠানর আয়োজন করে। ভারতীয় সৈন্যদের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে যে গেট পার হয়ে এলেই কাবুলে পাঠান নিয়ম; এর অন্যথা হবে না। তবে আমরা কাবুলে লিখে দিচ্ছি ছেলেটির যাতে কোন শাস্তি না হয়। ছেলেটি অবশ্য পরে কাবুল থেকে নিজের দেশে ফিরে আসে।

'খাইবার' গিরিপথ থেকে আমাদের সোয়াট নদীর উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তখন এক পাঠান নবাব ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি Dir-এর নবাব বলে পরিচিত। তিনি একদিন সমস্ত প্রতিনিধিদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের মধ্যে আট দশজন পাঠান নবাবের বাড়িতে মাংস খেতে রাজী হলেন না, বললেন তাদের জন্য নিরামিষ ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে চাঁদোয়া খাটিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি চাঁদোয়ার নীচে আমিষ এবং আর একটির নীচে নিরামিষ ভোজ্যবস্তু সব টেবিলে সাজান ছিল। আমিষ ভোজ্য দ্রব্যের সম্ভার দেখে নিরামিষভোজীদের টেবিল একরকম ফাঁকা পড়ে রইল। সবাই আমাদের টেবিলে এসে যোগ দিল।

খাওয়ার প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ছে। 'খাইবার' গিরিপথের একজন কর্মচারী আমাদের সকালবেলায় চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সীমান্তের সেই চায়ের আসরে নানা ধরনের সুস্বাদু ফল—আঙ্গুর, খরমুজা ইত্যাদি—প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করা হয়েছিল। তার স্বাদ অতি বিচিত্র। সে রকম সুস্বাদু ফল এর আগে কখনও খাইনি, ভবিষ্যতে খাব বলে আশা হয় না।

পেশোয়ারে একজন হিন্দু পাঞ্জাবী মিলিটারী ডাক্তারের বাড়িতে আমার ও আমার স্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। খাওয়ার বিষয়ে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অতিথিদের জন্য আয়োজনে তিনি কোন কার্পণ্য করেননি। তাঁদের রেওয়াজই হচ্ছে খাওয়ার পর প্রচুর আঙ্গুর খাওয়া। রাত্রে খেতে বসে দেখি বড় বড় আঙ্গুর একটি পাত্রে সাজান আছে। এখানকার আঙ্গুর যাঁরা খেয়েছেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন সে আঙ্গুরের স্বাদ কি রকম। কথাপ্রসঙ্গে

গৃহস্বামী বললেন, "এখন কি আর ভাল খাওয়ার উপায় আছে। আঙ্গুরের সের আট আনা।" শুনে বললাম, "আট আনা?" "হ্যাঁ, আগে তো মাত্র দু'আনা সের ছিল।" তখনই মনে পড়ল, কলকাতায় পাতলা কাঠের বাক্সে যে আঙ্গুর আমরা কিনি তার দামই বা কি এবং স্বাদই বা কি। ঐ অঞ্চলের ফলের স্বাদ সত্যই অপূর্ব।

এই অধিবেশন উপলক্ষে আমরা তকৎ-ই-বাহি পাহাড় দেখতে গিয়েছিলাম। এই পাহাড়ের চূড়ার কাছেই আছে প্রসিদ্ধ গণ্ডোফারিসের শিলালিপি। এর কথা বইএ পড়েছি, এবার স্বচক্ষে দেখলাম।

এই যাত্রায় পাঠানদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হল। সেখানে ছেলেবুড়ো সকলের কাঁধেই দেখি একটি বন্দুক ঝোলান। শুনলাম ওখানকার রীতি নাকি এই যে ওরা রেগে গেলে একে অন্যকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়ে, আমরা যেমন বন্দুক নিয়ে পাখী শিকার করি। জাফর নামে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন কর্মচারী আমাদের গাইড ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম একথা সত্য কিনা। তিনি বললেন, 'সত্য, তবে পাঠানদের উপর অত্যাচার বা তাদের অপমান না করলে তারা কখনও অপরের প্রাণ হানি করে না। আপনারা শুনেছেন যে পাঠানরা গুলি করে ইংরাজদের হত্যা করেছে। কিন্তু তার আসল কারণ ইংরাজরা কখনও বলেন না, একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পাঠান মেয়েদের উপর অত্যাচার করায় একবার পাঠানরা ইংরেজদের উপর বন্দুক নিয়ে চড়াও হয়। ইংরাজরা তার প্রতিশোধ নিল পাঠানদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে। আপনারা পাঠানদেরই গুলি চালানর কথা কেবল শুনেছেন; গুলি চালানর আসল কারণ যে ইংরাজদের অকথ্য অত্যাচার—এর কিছুই শোনেন নি।' জাফর এবং আরও দু'একজন পাঠানের অমায়িক ব্যবহারে আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হই। আসার পূর্বে তিনি আমার স্ত্রীকে বল্লেন, 'আপনার মেয়ের বিয়ের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন। আমি নিশ্চয়ই যাব।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার থাকার সময় মালদহের জেলা শাসক শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন আমাকে সেখানকার নব প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামটির দ্বারোদ্ঘাটন করতে আমন্ত্রণ করেন। সেই উপলক্ষে আমি মালদহে যাই এবং গৌড় পাণ্ডুয়া ভালভাবে ঘুরে দেখি। একবার মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ এক উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে কারণেই আমি মেদিনীপুর যাই। যে বাড়িতে এই সভা হয়, সেই বাড়িতে একটি ছোট মিউজিয়ামও ছিল। মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখবার সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটি কাচের আলমারিতে দুটি তাম্রশাসন রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম এ দু'টি কার তাম্রশাসন। পরিচালকবর্গ কিছু বলতে পারলেন না। আমি ঐ দু'টি দেখতে চাইলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' এক লাইন পড়েই মনে হল এটি সম্পূর্ণ নতুন; এর কোন বিবরণ আগে পড়িনি। ভাল করে পড়ে দেখবার

জন্য সেদিনকার মতো সেগুলি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। পরিষ্কার করে পড়বার চেষ্টা করে দেখি যে এ দু'টি মহারাজ শশাঙ্কদেবের তাম্রশাসন এবং ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে খুবই মূল্যবান। বিকেলে কর্তৃপক্ষকে বললাম এই রকম দুইটি মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনের বিষয়ে কোথাও কিছু প্রকাশ করেননি কেন? এই তাম্রশাসন দু'টি কোথা থেকে এল—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানালেন যে যখন শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক ছিলেন তখন একবার মফঃস্বল ট্যুর করতে গিয়ে এক গ্রামে তিনি এগুলি পান এবং পরে তাঁদের উপহার দেন। এর বেশী কিছু তাঁরা জানেন না। তাঁদের বলে ঐ তাম্রশাসন দু'টি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করে দেখি যে এ দু'টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই বেশি। *Epigraphia Indica*র ছাপানোর জন্য এই তাম্রশাসন দু'টির বিবরণ আমি লিখি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, *Epigraphia Indica*র প্রকাশ বন্ধ থাকায় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে সেই বিবরণ ছাপা হয়। এখন বাংলাদেশের সব ইতিহাসে এদের উল্লেখ দেখা যায়। একটি জেলার মিউজিয়ামে বহুদিন এ দু'টি পড়ে ছিল। কেউই তার কথা প্রকাশ বা প্রচার করেননি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে মিউজিয়ামের ভিজিটার্স বুকে দেখি যে আমার পূর্বে আরও দু'তিনজন ইতিহাসের অধ্যাপক ঐ মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলেন; সে সময়েও তাম্রশাসন দু'টি সেখানে ছিল। অথচ তাঁরা এ বিষয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ করেননি, কোন অনুসন্ধানই করেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সামাজিক জীবন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী-কালে দেশে বিদেশে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হলেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু এবং আরও দু'জন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো—কে. এস. কৃষ্ণান (ফিজিক্স) ও পি. মহেশ্বরী (বটানী)। এঁদের সকলেরই নিজ নিজ বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ও নূতন নূতন আবিষ্কার সর্বজনস্বীকৃত। অবশ্য প্রথম আমলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন; তবে তিনি প্রসিদ্ধ-পণ্ডিত হিসেবেই ঢাকায় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া আরও কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের উদ্ভাবিত ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে একটি নতুন আবিষ্কার তাঁর নামানুসারে Ghose's Law নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই Lawটি এখন আর সর্ববাদীসম্মত তথ্য বলে স্বীকৃত হয় না, এ রকম কথা শুনেছি। তবে একসময় পৃথিবীর সর্বত্র এর খুবই সমাদর হয়েছিল। সুশীলকুমার দে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেছিলেন; কিন্তু তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। এই দুই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। পুণাতে মহাভারতের যে critical edition ছাপা হয় তার কয়েকটি পর্ব তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। মৌলভী মহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসেবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরেই এঁর স্থান। আমরা একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম.এ., ডি. এল. একজন বড় আইনজ্ঞ ছিলেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। পরে সেই পদ ত্যাগ করে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। আর একজন খ্যাতনামা আইনের অধ্যাপক ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ইনি আইন বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার দু'জনেই আমার সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন কালিকারঞ্জন কানুনগো। ইনিও পরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এছাড়া গণিত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ভূপতিমোহন সেন (বি. এম. সেন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে পুনরায় সরকারী কলেজে যোগ দেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি

কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অর্থনীতির অধ্যাপক এইচ. এল. দে ভারত সরকারের তরফ থেকে আমেরিকায় ইউ. এন. ও-র অধীনে দীর্ঘকাল দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে চাকরী করেছেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হরিহাস ভট্টাচার্য এবং গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নলিনীমোহন বসুও খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়ার অ্যাসিস্টাণ্ট লেকচারারদের মধ্যেও অনেকে পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন অমিয়কুমার দাশগুপ্ত। ইনি এদেশে এবং ইয়োরোপে অনেক উচ্চ পদ অধিকার করে পাটনায় একটি সোস্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি Pay Commission-এর সভ্য হয়েছিলেন। এই রকম কৃতি ও খ্যাতিমান আরও অনেক প্রোফেসর ও লেকচারার ছিলেন। মোটকথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে তুলনায় যে বেশ উচ্চস্থানই পাবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ইতিহাস বিভাগে আমার ছাত্রদের মধ্যে পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শশীভূষণ চৌধুরী ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ঢাকায় অধ্যাপনা করেন ও পরবর্তী জীবনে ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ অধ্যাপকই রমনার কাছাকাছি এক পাড়ায় বাস করতেন। ফলে পরস্পরের মধ্যে একটি নিবিড় সৌহার্দের ভাব জন্মেছিল। আমরা যেন সবাই এক পরিবারের মানুষ ছিলাম। প্রত্যেকের সুখে দুঃখে আপদে বিপদে অনেকের সাহায্য, সাহচর্য ও সহানুভূতি পাওয়া যেত। পরস্পরের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া ছিল খুবই আনন্দের ব্যাপার। সেই সামাজিক জীবনযাত্রার স্মৃতি আজও আমার মনে গভীরভাবে অংকিত রয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত বড় বড় সব অধ্যাপক থাকাসত্ত্বেও ঢাকা শহরের হিন্দু অধিবাসীরা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়কে আদৌ ভাল চোখে দেখতেন না। প্রথম থেকেই তাঁদের মনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি খুব বিদ্বেষভাব ছিল। তার একটি কারণ যে হিন্দুরা কোনদিনই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পছন্দ করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকাই তাঁদের ইচ্ছা ছিল। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যখন প্রস্তাব করলেন যে মুসলমানদের সুবিধার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে তখন মুসলমানেরা যে পরিমাণে খুশী হলেন হিন্দুরা সেই পরিমাণে অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস হল যে, এও আরেকভাবে বাংলা দেশকে দুখণ্ড করা হল।

হিন্দুদের এই বিশ্ববিদ্যালয় ভাল না লাগার আরও একটি কারণ বোধ হয় ছিল। বাইরে থেকে আমরা এতগুলি অধ্যাপক ঢাকায় গিয়ে বড় বড় বাড়িতে থাকি আর মোটা মাইনে পাই এটা তাঁদের বিসদৃশ লাগত। ঢাকার স্থানীয় লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায়নি—ঢাকার উকিলদের মধ্যে এই ভাবটি প্রবল ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোর্টের' (court) সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন তৈরি, বাজেট পাশ এবং সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা এবং বিতর্ক হত। এই কোর্টে স্থানীয় হিন্দুদের একটি বড় দল ছিল। কোর্টের মিটিংএ প্রায় সব বিষয়েই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন এবং নানা প্রস্তাব আনতেন। তাঁদের তর্কের উত্তর দেওয়ার ভার ছিল আমাদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকের উপর। কারণ মুসলমান সভ্যরা যদিও আমাদের পক্ষে ভোট দিতেন, তাঁদের মধ্যে তেমন বক্তা কেউ ছিলেন না। আমি যে বিশ বছর ঢাকায় ছিলাম, তখন সব সময়েই কোর্টের মিটিংএ বিরোধী হিন্দু দলের সঙ্গে আমায় তর্ক করতে হয়েছে। নরেশবাবু যতদিন ঢাকায় ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন আমাদের দলের নেতা। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি তাঁর স্থানে জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট নিযুক্ত হলাম এবং কোর্টের সভাতেও আমাকে তাঁর স্থান দখল করতে হল। নরেশবাবু প্রবীণ লোক ছিলেন। আমার বয়স কম, হিন্দু সভ্যরা আমায় Leader of the House বলে ঠাট্টা করতেন। মুসলমান সদস্যেরা আমাদের দলে থাকায় ওঁরা কোনদিনই অবশ্য আমাদের অনিষ্ট করতে পারেননি। এঁদের কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে। প্রতি সপ্তাহের অধিবেশনে তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাদ প্রতিবাদ চলত। একজন ব্যারিস্টার ছিলেন তাঁদের নেতা। আমার প্রতি তিনি কোন কারণে বেশ রুষ্ট ছিলেন। একদিন তিনি প্রস্তাব করলেন যে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ উঠিয়ে দেওয়া হোক। তাঁর দলের দুজন ছাড়া বাকী সতের জনের কেউই অবশ্য এই প্রস্তাবে সায় দেননি। এইরূপে নানাভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সব ব্যাপারে আমরা যে সুখে শান্তিতে ছিলাম তা নয়। তবে মুসলমান ছাত্র শিক্ষক ও শহরের অধিবাসী সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকদের সমর্থন করতেন। তাঁদের যুক্তি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এইটিই তাঁরা বিশেষভাবে চাইতেন। আগেকার ঢাকা কলেজের তুলনায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যায় ও গুণে অনেক বেশি অধ্যাপক আছেন। তাঁদের কাছ থেকে মুসলমানেরা অনেক উপকার পাবেন সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি না হলে তো তা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এজন্যেই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার বা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লেকচারারের পদে অনেক সময় আবেদনকারীদের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠ না হলেও উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থীকেই নিয়োগ করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু প্রোফেসর বা রীডারের বেলায় তা করতেন না। তাঁরা জানতেন এঁদের উপরেই শিক্ষার উৎকর্ষ নির্ভর করে; এইজন্য যোগ্যতম প্রার্থীকেই এই সব পদে নিয়োগ করা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পূর্বেই বলেছি যে অনেক ছাত্র 'হলে' থাকত। যারা থাকত

না তাদের কোন না কোন 'হলের' সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও তিন ভাগ করে প্রত্যেককে তিনটি হলের যে কোন একটির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হত; এবং হলের প্রোভোস্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে সেই হলের সঙ্গে যুক্ত বাইরের ছাত্রদের ভাগ করে দিতেন—যাতে শিক্ষকেরা সেই ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে তাদের পড়াশোনা, অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে পারেন, উপদেশ দিতে পারেন। কাজেই প্রত্যেক ছাত্রকেই কোন না কোন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হত। পূর্বেই বলেছি ক্লাশের পড়াশোনা ছাড়া প্রত্যেক হলে খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ সাহিত্যচর্চা সমাজসেবা ইত্যাদি নানা বিভাগ ছিল। ছাত্রদের এর কোন না কোনটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। সুতরাং হলের প্রোভোস্ট বা হাউস টিউটর প্রায় অধিকাংশ ছাত্রকেই ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। সেই জন্যই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সহজেই একটি নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকালকার দিনে এর মূল্য যে কত বেশি তা বলাই বাহুল্য।

তখনকার ছাত্ররা সবাই যে সুবোধ সুশীল ছিল তা নয়। তারাও অনেক গোলমাল, হাঙ্গামা করেছে। রাজনীতির প্রবল আকর্ষণে ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে নানা আন্দোলনে যোগ দিত। তখন সরকারের নির্দেশ আসত তাদেব ঠিকপথে চালনা করবার। আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেকে কারাবরণও করেছিল। তখন আমরা কিভাবে তাদের জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতাম সেকথা পূর্বেই বলেছি।

তখন ছাত্রদের উপর আমাদের কিরকম প্রভাব ছিল সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের গোলমাল হওয়ায় সাহেব ভাইস-চ্যান্সেলার পুলিশ সাহেবের উক্তির উপর নির্ভর করে ছাত্রদের দণ্ডবিধান করেন। দণ্ডের মধ্যে একটি ছিল এই যে নিজেদের দুর্ব্যবহারের জন্য তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। ছাত্ররা তা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী নয়, প্রায় একহাজার ছাত্র একজোট হয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। আমি তখন ঢাকায় ছিলাম না। ইতিহাসের ছাত্রদের নিয়ে অন্যান্য বছরের মতো ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণে বেরিয়েছি। হঠাৎ একদিন ভাইস-চ্যান্সেলারের টেলিগ্রাম পেলাম—তখনই ঢাকায় ফিরতে হবে। সেই অনুযায়ী ঢাকায় ফিরে এসে স্টেশন থেকে সোজা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারের ঘরে হাজির হলাম। আমার ফেরার কথা আগেই জানাজানি হয়েছিল। গিয়ে দেখি, ভাইস-চ্যান্সেলারের ঘরের সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রায় হাজার খানেক ছাত্র জমায়েৎ হয়েছে; ভাইস-চ্যান্সেলার দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। কাচের জানালায় টোকা দিতে তিনি আমাকে দেখে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটি শুনে বললাম, একবার ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে আসি। এই বলে উঠে যেই দরজার দিকে এগিয়েছি তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'করো কি। তোমাকে

ওরা মেরেই ফেলবে।' বললাম যে সে ভয় করলে তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে থাকা উচিত নয়। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে দরজা খুলে তিনি আমাকে বাইরে যেতে দিলেন। পরের দিন তিনি বলেছিলেন বাইরে কেবলমাত্রই ছাত্ররা চারিদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরছে দেখে আমার জীবন সম্বন্ধে তিনি খুবই ভয় পেয়েছিলেন।

ছাত্রদের মধ্যে গিয়ে আমি তাদের কয়েকজন বাছাই বাছাই নেতাকে কাছে ডেকে নিলাম, এদের আমি জানতাম। এক ঘণ্টার উপর তাদের সঙ্গে অনেক কথা হল। তাদের যে অভিযোগ তাও মন দিয়ে শুনলাম। শুনে ধারণা হল যে কয়েকজন ভারতীয় পুলিশ কর্মচারী প্রথমে ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে; তারপর অবশ্য ছাত্ররা নানারকম গোলমাল এবং হাতাহাতি শুরু করে। উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ মারপিটও হয়েছিল এবং সেই সময় কয়েকজন সাহেব কর্মচারীদের দিকে ছেলেরা ধাওয়া করে; তারা অবশ্য ছাত্রদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেনি। ছাত্র নেতাদের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর এই মর্মে বোঝাপড়া করলাম যে যেসব কর্মচারী ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে পুলিশের বড়সাহেব তাদের শাস্তি দেবেন; সাহেব কর্মচারীদের কাছে ছাত্রদের নিজেদের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। ক্ষমা চাইতে ছাত্ররা কোনমতেই রাজী হল না। পরে ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটির পর এই সিদ্ধান্তই বহাল হয় এবং ছাত্রদের জরিমানা সব মকুব করা হয়।

এই ঘটনার একটি উপসংহার আছে; তখন জানতাম না, পরে জেনেছি। বহুদিন পরে কলকাতার একটি সভায় সে সময়কার ঢাকার একজন শিক্ষক (শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ) এই কাহিনী বলেছিলেন। তখন ইংরাজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন Wrenn সাহেব। আমি যেদিন ঢাকায় এসে ছাত্রদের সঙ্গে মিটমাট করলাম তার পরের দিন Wrenn সাহেব ইংরাজী বিভাগের শিক্ষকদের ঘরে গিয়ে বলেন, 'তোমরা শুনেছ কি যে ভগবান পৃথিবীতে এসেছেন?' ব্যাপারটি কি? সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সাহেব বললেন, 'তোমরা তো জান ছাত্ররা বলেছিল যে, স্বয়ং ভগবান এসে বললেও তারা দুঃখ প্রকাশ বা দোষ স্বীকার করবে না। এখন যখন তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে তখন ভগবানই এসেছেন বলতে হবে।' এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকদিন হাসাহাসি চলেছিল।

আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। একদিন ক্লাস নিচ্ছি, এমন সময় ভাইস-চ্যান্সেলারের এক স্লিপ এল—'তুমি এখনই বাড়ি যাও; লাঞ্চ খেয়ে ফেরার পথে আমি এই মাত্র দেখে আসছি যে একদল ছেলে তোমার বাড়ি ঘিরেছে। তোমার স্ত্রী একা আছেন।' তখনই ক্লাস বন্ধ করে ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?' তিনি বললেন যে প্রায় ষাট সত্তর জন ছেলেকে আমার বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বেশ ভয় পেয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ি গেলাম। তখন দুপুর দুটো আড়াইটা হবে।

গিয়ে দেখি 'হলে'র ৬০।৭০ জন ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলল যে আজ তাদের জন্য খাবার কিছু নেই। সেটা দোলযাত্রার দিন, তারা আবীর খেলতে শহরে গিয়েছিল, অনেক দেরীতে ফিরেছিল। ফিরে দেখে খাবার নেই। সুতরাং এর একটা ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। এই শুনে আমার স্ত্রী বলেছেন, 'তোমরা স্নান সেরে এস, খাবারের ব্যবস্থা করছি।' ইতিমধ্যেই তিনি দু'জন ছেলেকে আমার গাড়িতে নবাবপুর থেকে মিঠাই কিনে আনতে পাঠিয়েছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঠাই এসে গেল। ছেলেরা সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে খুশী মনে বাড়ি চলে গেল।

আমি ফিরে গিয়ে-চ্যান্সেলারকে সব বললাম। তিনি বললেন, 'এ তো বড় আব্দার, হোস্টেলে খাবার নেই বলে তোমার স্ত্রীর উপর উৎপাত করবে, এ কেমন কথা?' বললাম, 'সব ব্যাপারে অত খুঁটিনাটি নিয়ম মেনে চলা যায় না। আর এমন ব্যাপারে টাকা খরচাও কিছু অপব্যয় নয়। ভবিষ্যতে গোলমাল হলে দেখবেন ওরাই আমার পিছনে দাঁড়াবে।' গল্পটি বলার উদ্দেশ্য এই যে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করলে তার প্রতিদান পাওয়া যাবেই। আমার বিশ্বাস ছাত্রদেব উপর আমাদের যে এমন প্রভাব ছিল তার কারণ তারা মনে মনে বেশ ভালভাবেই জানত যে আমরা তাদের ভালবাসি।

ডঃ জ্ঞান ঘোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার তখন ছাত্রদের সঙ্গে অনেকবার গোলমাল হয়। এই সব মেটাবার উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষকদের একটি সভা ডাকেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন—'যদি কিছু মনে না করেন আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলি। আমি বা মজুমদার ছেলেদের যে যথেষ্ট শাসন করতাম তার একটা কারণ তাদের সঙ্গে আমরা আন্তরিকভাবে মিশতাম, তাদের অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করতাম। এটা তারাও জানত এবং বিশ্বাস করত। আজকাল ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের আর সে সম্পর্ক নেই। ছাত্র হাঙ্গামা দূর করতে হলে ছাত্রদের সঙ্গে এই রকম সম্পর্ক আগে স্থাপন করতে হবে।'

জ্ঞান ঘোষের মুখে যেমন শুনেছি, লিখলাম। আমারও মনে হয় আজকাল প্রায়ই ছাত্র হাঙ্গামার যে-কথা শুনি তার অনেক কারণ আছে সত্য, কিন্তু ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও নিবিড় বন্ধনের অভাবও অন্যতম কারণ।

আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অনেক বিপ্লবীও ছিল জানতাম। একবার কার্জন হলে পুলিশ ঢুকে কয়েকজন বিপ্লবী ছাত্রকে মারধোর করে এবং একজন ছাত্র মারা যায়। তাতে ছাত্রের দল ক্ষেপে উঠেছিল। অনেক কষ্টে আমরা ছাত্রদের উত্তেজনা দূর করি এই বলে যে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে একজন সিনিয়ার টিচার সঙ্গে না নিয়ে কোন পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বাড়িতে ঢুকবে না এবং কোন 'হলে' সার্চ করতে হলে পুলিশকে প্রোভোস্ট বা হাউস টিউটরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিশ্রুতি পালন

করেই চলত। মাঝে মাঝে আমাদের বেশ মুশকিলে পড়তে হত। সাধারণতঃ কোন 'হলে' সার্চ করতে হলে শেষ রাতে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলত এবং খুব ভোরেই সার্চ করত। সুতরাং আমাকেও খুব ভোরে ডেকে তুলত। দু'টি সার্চ পার্টির কথা উল্লেখযোগ্য। একবার ঐ রকম ভোরবেলায় পুলিশ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ছাত্রদের প্রতিটি ঘর দেখতে থাকে। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি, পুলিশের লোকে ভিতরে গিয়ে তল্লাস করে। এইভাবে আমরা চলেছি। পুলিশ কর্মচারীটি এক ঘরে ঢুকে হঠাৎ এক লাফে বাইরে এসে চীৎকার করে উঠল—'বোমা! বোমা!' পুলিশ অফিসারকে বললাম, 'কি ব্যাপার, ভিতরে চলুন তো।' কিন্তু কেউ ভিতরে ঢুকতে চায় না; আমাকেও একা যেতে দিতে রাজী নয়, যদি আমি সেগুলি লুকিয়ে ফেলি। পুলিশ কর্মচারীটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল যে চার পাঁচটি বোমা রয়েছে। দেখি ছেলেটির খাটের তলায় কয়েকটি গোল কালো কালো জিনিস। দেখে আমিও কিছু বুঝতে পারিনি। ছেলেটিও কেমন মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলতে চায় না। আমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'আজ্ঞে ওগুলো তামাক-খাওয়ার গুল।' শুনে হাতে করে সেগুলি বাইরে এনে পুলিশকে ব্যাখ্যা করে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম।

আর একবার ভোররাত্রে পুলিশ এসে বলল যে ঢাকা থেকে তিন চার মাইল দূরে একটি ডাকাতি হয়েছে। আমার হলের একজন ছাত্র সেই ডাকাতিতে আছে; এখনই তার ঘর সার্চ করতে হবে। আমি তখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ছেলেটির ঘর তালাবন্ধ। পাশের ঘরের একটি ছেলে বলল খুব ভোরে উঠে সে বাড়ি চলে গেছে। পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি কাল রাত্রে এখানে ছিল? 'হলে'র নিয়ম ছিল যে প্রতিরাত্রে ৯।১০টার সময় হাউস টিউটর ছাত্রদের নাম ডেকে খাতায় হাজিরার ঘরে দাগ দেবেন। হাউস টিউটরকে রেজিস্ট্রি বই নিয়ে আসতে ডেকে পাঠালাম। দেখা গেল যে ছেলেটি প্রতিদিন রাত্রেই হাজির ছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে ঘরের বাইর থেকে নাম ধরে ডাকার পর সে ভিতর থেকে 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলে উত্তর দিয়েছিল। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তালা ভেঙ্গে পুলিশ সেই ঘরে ঢুকল। ঘরে একটি সাইকেল; তার উপর ধুলো জমে আছে। পুলিশ অফিসার বললেন এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ছেলেটি ঘরে ছিল না; ব্যবহার হলে সাইকেলের সিটে ধুলো জমত না। পুলিশের সন্দেহ যে একেবারে অমূলক নয় তা মনে হলেও পুলিশের কথার প্রতিবাদ করে বললাম সে রাত্রে নামডাকা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে সে হাজির ছিল।' তাছাড়া হাউস টিউটর নিজে বলছেন যে সে ঘরের ভিতর থেকে সাড়া দিয়েছে—এরপর কি করে অবিশ্বাস করা যায়? যাই হোক, পুলিশ তো চলে গেল। কিন্তু আমার মনে বেশ একটু সন্দেহ থেকে গেল। আমাদের 'হলে' এক একটি বড় ঘরে কাঠের পার্টিশন

দিয়ে ভাগ করে চারজনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ঐ ছেলেটি যে ঘরে থাকত তার দু'পাশের ঘরে যে দুটি ছেলে থাকত তাদের আমি ডেকে পাঠালাম। তার মধ্যে একজন আমার কাছে গোপনে স্বীকার করল যে ঐ ছেলেটি তিন চার দিন যাবৎ ঘরে থাকত না। পূর্বব্যবস্থামত এই ছেলেটি পার্টিশন টপকে পার হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলত। এর দু'একদিন পরে এই ছেলেটিই দৌড়ে আমার বাড়িতে এসে বলল যে, স্যার, সে এইমাত্র ফিরেছে। আমি বললাম যে, এখনই তাকে চলে যেতে বল। পুলিশ যখন পিছু লেগেছে তখন এই 'হলের' আশে পাশে চর রেখেছে। আমার নির্দেশমত ছেলেটি তখনই চলে গেল। কিন্তু পরে সে ধরা পড়েছিল এবং ডাকাতির অপরাধে কয়েক বছর তার জেলও হয়েছিল।

এবার ঢাকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলব। ১৯২১ সালে কলকাতা থেকে একটি চাকর ও ঠাকুর সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় যাই। চাকরকে বাজারে পাঠিয়েছিলাম। সে যা মাছ নিয়ে এল তা ছ'সাত জন লোকের খাওয়ার মত। তাকে বললাম, 'এত মাছ এনেছিস কেন ?' সে বলল, 'এই-ই তো চার আনার মাছ। আর কত কম আনব।' ক্রমে দেখলাম যে ঢাকায় সব রকম খাবার জিনিস কলকাতার তুলনায় আশ্চর্য সস্তা। বড় বড় রুই মাছের পেটি—সের খানেকের বেশি হবে—সাত আট আনা দাম। মাংসের সের পাঁচ আনা। ঢাকার মিঠাইএরও নাম খুব। এদের মধ্যে অমৃতি ও প্রাণহরা সন্দেশ খুবই প্রসিদ্ধ। ঢাকার আর একটি প্রিয় জিনিস বাখরখানি। অনেকটা পরোটার মত; দামেও খুব সস্তা। তখন খাঁটি ঘি পাওয়া যেত। দাম যতদূর মনে পড়ে দু'তিন টাকা পাকি সের। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা অনেকটা এখন গল্পের মতো শোনাবে। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হল কলকাতায়। কিন্তু বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে খুব বড়গোছের একটা ভোজের আয়োজন করলাম। তাতে অন্ততঃ ছ'সাতশ জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীসত্যপ্রসন্ন ঘোষকে নিমন্ত্রণ করতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সেখানে আর একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। নিমন্ত্রণ পত্রখানা সত্যপ্রসন্নবাবুর হাতে দিলে তিনি পড়ে বললেন এ নিমন্ত্রণে মাছের ব্যবস্থা কিছু করেছেন নাকি। বললাম, এখনও তো আটদশ দিন বাকী আছে। কাজের দিন বাজার থেকে কেনার ব্যবস্থা করব। তিনি তখন ঐ উপস্থিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ঢাকার কাছে একটি জায়গার পুলিশের সাব-ইন্‌সপেক্টর। বললেন, জায়গাটি মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। আপনি যদি চান আমি ওঁকে দিয়ে আপনার মাছের ব্যবস্থা করতে পারি। আমি বললাম, সে তো খুব ভাল কথা। সেই ভদ্রলোকও আনন্দের সঙ্গে রাজী হলেন। স্থির হল যে, নিমন্ত্রণের আগের দিন সন্ধ্যার সময় আমি একজন লোক পাঠিয়ে দেব। সে ট্রেনে যাবে এবং রাত বারটা একটা নাগাদ মাছ নিয়ে ফিরবে। ব্যবস্থামত ঠিক

সময়েই মাছ এল। দেখি কুড়ি পঁচিশটি বড় বড় রুই মাছ এবং মাথা পিছু একটি হিসাবে ছ'সাতশ চিংড়ি মাছ সদ্য পুকুর থেকে ধরে এনেছে। যাক্, প্রচুর পরিমাণে মাছ তো খাওয়া হল। কাজ মিটে গেলে দামের কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম। তিনি বললেন মাছের দাম সতের টাকা। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। শেষ শুনলাম ওখানকার রীতি হচ্ছে প্রথমে দু'তিন জন জেলেকে ঠিক করতে হয়। তারা এক একবার পাতা জাল টানলে যত মাছ উঠবে তার জন্য একটাকা করে দিতে হয়। সতের বার টানার পরে আমার প্রয়োজন মত মাছ হয়ে যায়; সুতরাং আমায় মাত্র সতের টাকা দিতে হবে। পরে এ গল্প বহুজনের কাছে করেছি। জীবনে এত সস্তা মাছ দেখিও নাই, শুনিও নি।

খুব ভাল চালের মণ ছিল সাত আট টাকা। সাধারণ ভাল চাল যা ভদ্রলোক-মাত্রই খান তার দাম ছিল চার-পাঁচ টাকা মণ। আমি একবার বাজারে খুব ভাল মিহি চাল দেখে আট ন' টাকা মণ দরে কিনি। তাতে আমার সহযোগীরা খুব ঠাট্টা করতেন। তখন তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি একদিন একশো টাকা মণ দরে মোটা চাল কিনে খেতে হবে।

ঢাকায় তখন মোটরগাড়ির চল হয়নি। ছ্যাকড়া গাড়িতে যাতায়াত করতে হত। আমাদের বাড়ি থেকে শহরে যেতে হলে চার আনা ভাড়াই যথেষ্ট ছিল। ঢাকার গাড়োয়ানরা সকলেই মুসলমান—এদের বলা হত কুট্টি মুসলমান। এদের নিয়ে অনেক গল্প চলিত আছে। কিছুদিন আগে দেখেছিলাম কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি এদের নিয়ে বেশ সরস গল্প ও কাহিনী রচনা করেছেন। দু' একটি চলিত কাহিনীর নমুনা দিচ্ছি। যাত্রীরা জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক জায়গায় যেতে কত নিবি? গাড়োয়ান বলল, বারো আনা। যাত্রী বললেন, চার আনা। এময় সময় ঘোড়াটি চিঁ হিঁ হিঁ করে উঠল। গাড়োয়ান বলল, ঐ দ্যাখেন কর্তা। আপনার কথা শুনে ঘোড়াটাও হাসবার লাগছে। আর একটি কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের; খুব সম্ভবতঃ এটি সত্য। দু'জন সাহেব স্টেশন থেকে একটি ভালো ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ি করে রমনায় এসেছে। গাড়োয়ান এক টাকা ভাড়া চেয়েছে। তারা আট আনা দিয়ে চলে গেল। গাড়োয়ান বলল, আচ্ছা রহেন কর্তারা, হটলার সাহেব (Hitler) তো আইবার লাগছে। দেখে নিমু তখন কত ভাড়া দেন।

ভাড়া ঠিক করার সময় গাড়োয়ানরা প্রায়ই বলে নিত, কর্তা, দ্যখছেন কি, এ পক্ষীরাজ ঘোড়া, একেবারে উড়াইয়া লইয়া যাইব, ইত্যাদি। এই গাড়োয়ানদের সৎ বলে খ্যাতি ছিল। আমার ধারণা সম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অনেক সুযোগ পেয়েও এরা হিন্দু যাত্রীদের উপর অত্যাচার করেনি।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণের কথা পূর্বেই বলেছি। বাংলাদেশের মধ্যেই দুইবার সুদীর্ঘ নৌকাযাত্রাও আমার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ঢাকায় একরকম বড় নৌকা পাওয়া যায়—তাদের বলে গ্রীণ বোট বা হাউস বোট।

এর মাঝখানে দুটি শোবার ঘর এবং বাথরুম। ভিতরে দাঁড়ালে ছাদে মাথা ঠেকে না। ছাদের উপরে বসার জায়গা। রাত্রে ত্রিপল খাটিয়ে মাঝি বা চাকররা সেখানে শুতে পারে। আমার বাড়ি ফরিদপুর জেলা শহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে একটি ছোট গ্রামে। একবার পুজোর সময় আমি সপরিবারে এই রকম একটি নৌকায় ঢাকা থেকে দেশে যাত্রা করলাম। স্থির ছিল যে পদ্মা নদীতে গিয়ে পড়বার পর আমরা স্টীমারে পদ্মা পার হব। খালি নৌকা নদী পেরিয়ে ওপারে গেলে আবার তাতে উঠব। কারণ পুজোর সময় ঝড়ের সম্ভবনা থাকে, সে সময় পদ্মার মতো বিশাল নদী নৌকায় পার হতে ভরসা হয় না। পদ্মায় যখন পেঁছিলাম দিন পরিষ্কার ; আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। মাঝিরা সাহস দিল। শেষ পর্যন্ত নৌকাতেই পদ্মা পার হলাম। প্রায় দু' ঘণ্টা লেগেছিল। কিন্তু সর্বদাই ভয়ে ভয়ে ছিলাম।

খাল বা ছোট নদী দিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে জেলেদের নৌকা থেকে তাজা ইলিশ বা অন্য মাছ কেনা হত। গ্রামে নৌকা লাগিয়ে অন্য খাবার জিনিস-পত্রও কেনা হত। আমাদের সঙ্গে একটা গ্রামোফোন ছিল। গ্রামে নৌকা লাগিয়ে গ্রামোফোন বাজাতে আরম্ভ করলেই অনেক লোক আসত। তখন তাদের কাছ থেকে দুধ তরিতরকারি প্রভৃতি কেনার সুবিধা হত। গান বন্ধ হলেই রেকর্ড-খানা দেখিয়ে ওরা বলত, কর্তা, থালখানা আর একবার ঘুরাইয়া দ্যান। শহরের হাওয়া তখনও এই সব ছোট গ্রামে পেঁছয়নি। এরা গ্রামোফোন তখনও চোখে দেখেনি। এদের সরল গ্রাম্য স্বভাব খুবই ভাল লাগত।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের শ্যামল শোভা যে কত সুন্দর তা এবারে এই নৌকা-ভ্রমণে মনের মধ্যে যেমন উপলব্ধি করেছি, তা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। তিন চার রাত্রি জলপথে কাটিয়েছি ; এই সব গ্রামে নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষীদেরই বাস ; কখনও কোন গোলমাল হয়নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর আর এভাবে নৌকা যাত্রার কথা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। যে চার পাঁচদিন বাড়িতে ছিলাম ঐ নৌকাতেই রাত্রে থাকতাম। আবার ঐ নৌকা করেই ঢাকায় ফিরে এলাম। মোট প্রায় ১৪।১৫ দিন নৌকাবাস হল।

আর একবার ঢাকার নিকটবর্তী নারায়ণগঞ্জের কাছে শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌকা করে প্রায় ২৫।৩০ মাইল ঘুরে এসেছিলাম। নদীটি ছোট ; দুধারে গ্রামের পর গ্রাম। একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মুড়াপাড়া। নৌকা থেকেই জমিদারের বাড়ি ও বাগান চোখে পড়ল। সে-যাত্রা সাত-আট দিন বেড়িয়ে ঢাকায় ফিরে আসি।

এই রকম আর একবার জলপথে একটি মাল বোঝাই স্টীমারে গোয়ালন্দ থেকে কলকাতায় এসেছিলাম। স্টীমারে মাত্র দুটি ফার্স্ট ক্লাস কেবিন ছিল : আমরা ছাড়া আর যাত্রী কেউ ছিল না। প্রকাণ্ড ডেকের উপর বেড়াতাম। এই পথে সুন্দরবনের কাছ দিয়ে আসতে হয়। সুন্দরবনের দৃশ্য খুবই মনোহর। সুন্দরবনে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ যে কত সস্তা তা নিজের চোখে না দেখলে

বিশ্বাস করা যায় না। মাত্র তিন-চার পয়সার মাছে আমাদের সকলের চলে যেত। দু চার পয়সা বকশিস দিলে মাঝিরা আপত্তি করত—জেলেরা পাছে পরে বেশি দাম চায়। সুন্দরবনে অপরিসর খাতে নৌকা যেত। দু'পাশে নিবিড় অরণ্য ; সেখানে বাঘ থাকে। তবে আমরা ছিলাম স্টীমারে ; তার উপর দিনের বেলায় চলেছি। কাজেই বাঘের ভয় তেমন ছিল না। নদীপথে সুন্দরবনে এই অপরূপ শোভা আর দেখার সম্ভাবনা নেই। এই তিনটি জলপথে ভ্রমণ আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

আর দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেই ঢাকার প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রথমটি হল অভয় আশ্রম। অভয় আশ্রয় সে সময়ের একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। কর্ম-কর্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ, অন্নদা চৌধুরী ও সুরেশ ব্যানার্জী। এঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে এঁদের খুব সদ্ভাব ছিল। আমরা এঁদের অনেক সময় অর্থ সাহায্য করেছি। আমার সন্দেহ ছিল এবং এখনও আছে যে এঁরা সকলেই যে অহিংসাপন্থী ছিলেন তা নয়। গভর্ণমেণ্ট বরাবরই এঁদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। সুতরাং প্রকাশ্যে এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বেশ বিপজ্জনক ছিল। মাঝে মাঝে টাকার দরকার হলে তাঁরা জ্ঞান ঘোষ কিম্বা আমাকে বলতেন। আমরা অন্যান্য শিক্ষকদের বলতাম, 'ভাই, আমাদের কিছু সাহায্য করবেন ; দশ বিশ টাকা যা হয়। সৎকাজেই লাগবে। তবে কাকে দেব সেকথা জিজ্ঞাসা করবেন না।' সকলেই বুঝতেন, তবে কেউ কোন কথা বলতেন না। আমাদের সঙ্গে অভয় আশ্রমের কর্তাব্যক্তিদের পরিচয় আছে, একথা যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে সে বিষয়ে তাঁরা সতর্ক থাকতেন। একবার প্রায় মাঝরাতে এগারটা বারটা আন্দাজ সুরেশবাবু আমার বাড়িতে এসে হাজির। বললেন, 'আজই কিছু টাকা বিশেষ দরকার। অনেকক্ষণ যাবৎ বাড়ির ভিতরে আসার চেষ্টা করছি, আপনার বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। এতক্ষণে ঢুকতে পেরেছি।' তার চোখমুখ দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল তিনি অভুক্ত আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, খাওয়া দাওয়া কিছু হয়েছে। বললেন, 'সকালে চা খেয়েছিলাম। আর কিছু খাওয়ার সময় বা সুবিধা করে উঠতে পারিনি।' তখন তাঁকে বসিয়ে তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। এইভাবে কষ্ট সহ্য করে তাঁরা এই আশ্রম চালিয়ে গেছেন।

ঢাকায় থাকার সময় আর একটি খুব চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। সেটি হল ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। তখনকার দিনে এ কাহিনী সকলেরই জানা ছিল। আজ বোধ হয় অনেকের মনে নেই। সুতরাং এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর সামান্য বিবরণ দেওয়া দরকার মনে করি। ঢাকা থেকে দশ বার মাইল দূরে জয়দেবপুর নামে একটি রেল স্টেশন আছে। এখানকার জমিদারেরা খুব প্রসিদ্ধ। যে সময়কার কথা বলছি তখন তিনটি পুত্র রেখে জমিদার মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুর

পর প্রথমে জ্যেষ্ঠ পরে মধ্যম কুমার জমিদার হন। এই মধ্যম কুমার দার্জিলিং-এ মারা গেছেন এই কথাই সকলে জানত। কনিষ্ঠ পুত্র আগেই মারা গিয়েছিলেন ; সুতরাং জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে চলে যায়।

এই ঘটনার ১২।১৩ বছর পরে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। দীর্ঘ গৌরবর্ণ, সুন্দর চেহারা, বেশ স্বাস্থ্যবান। দেখে সম্ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কিন্তু মুখের কথা গ্রাম্য ধরনের। ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে এই সন্ন্যাসী কে তা নিয়ে নানারকম গুজব রটে। কিন্তু সন্ন্যাসী নিজের কোন পরিচয় দেন না। আমি তখন রমনায় একটি বাড়িতে থাকি। এই বাড়ির সামনে বড় রাস্তা দিয়ে সন্ন্যাসী প্রত্যেকদিন একটি বড় টমটম হাঁকিয়ে যেতেন। তিনি নিজেই তেজী ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে অবলীলায় গাড়ি চালিয়ে যেতেন। তাতে লোকের মনে সন্দেহ হয় সন্ন্যাসী হলেও আসলে উনি কোন বড়লোকের ছেলে। কিছুদিন পরে গুজব রটল যে উনিই নাকি ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার। প্রথমে সকলেরই বেশ আশ্চর্য বোধ হল। পূর্বের ঘটনা যা শোনা গেল তা হল এই যে, মধ্যম কুমার যখন দার্জিলিং-এ ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও এক শ্যালক ছিলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন শোনা গেল তিনি মারা গেছেন। শবদেহ নিয়ে যেতে অনেক লোক জড়ো হল। দার্জিলিং-এর শ্মশানঘাট ছিল একটি দুর্গম জায়গায়। পাহাড়ের নীচে অনেকটা নেমে যেতে হয়। শবযাত্রীরা যখন শ্মশানে পৌঁছায় তখন বৃষ্টি নেমেছে। শব শ্মশানঘাটে নামিয়ে রেখে তারা পাশের চালাঘরে আশ্রয় নেয়। এ পর্যন্ত গল্পে কোন গোঁজামিল নেই। কিন্তু পরের ঘটনা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটা প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বৃষ্টি থামলে লোকেরা বাইরে এসে দেখল যে কুমারের শবদেহ নেই। একথা বাইরে প্রকাশ পেলে নিন্দা রটবে, সেজন্য কুমারের শ্যালক তখনই হাসপাতাল থেকে একটি মড়া এনে পোড়াবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শ্যালক অবশ্য একথা স্বীকার করেননি। তিনি বলেন যে এটা মিথ্যা। কুমারের শব ঠিকই ছিল ; আমরা সেই শবই দাহ করেছি। কিন্তু পূর্বোক্ত গুজব দশ-বার বছর ধরে অর্থাৎ তখনও প্রচলিত ছিল।

কিছুদিনের মধ্যে এই সন্ন্যাসী গভর্ণমেণ্টের কাছে একটি আবেদন করলেন। তাতে তিনি লিখলেন যে তিনিই ভাওয়ালের মধ্যম কুমার। জ্ঞান হয়ে তিনি দেখেন যে দার্জিলিং শহরের শ্মশানঘাটের নীচে এক সাধুর গুহায় শুয়ে আছেন। সাধু তাঁকে বলেন যে 'তাঁকে মৃত মনে করে শ্মশানে নিয়ে এসেছিল। বৃষ্টি হওয়ায় লোকেরা দূরে আশ্রয় নেয়। তখন ঐ সাধুটি কাছে এসে দেখেন যে তিনি মরেন নি। বৃষ্টির জল গায়ে লেগে তাঁর জ্ঞান ফিরছে। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখেন যে সত্য-সত্যই তিনি বেঁচে আছেন। কোন বিষাক্ত জিনিস খাইয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল ; সুতরাং এখনই ফিরে গেলে আবার হত্যার চেষ্টা হবে। এই শুনে তিনি সাধুর সঙ্গে চলে যান এবং নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এতকাল পর

তাঁর আবার সংসার আশ্রমে ফেরার ইচ্ছে হয়েছে। তাই তিনি ফিরে এসেছেন। ভাওয়ালের সম্পত্তি তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসএ। তারা এই বিবরণ বিশ্বাস করল না। সুতরাং সন্ন্যাসীর তরফ থেকে আদালতে মামলা রুজু হল।

বলা বাহুল্য যে এই ব্যাপারে সমস্ত শহরে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিল। যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, অনেক বন্ধু—যাঁরা কুমারকে চিনতেন—বললেন যে হ্যাঁ, এই কুমার—কেউ কেউ বললেন, না, কুমার নয়। মামলা আরম্ভ হল। বহুদিন এ মামলা চলেছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে কলকাতার বড় বড় ব্যারিস্টার এলেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে শ্রীযুত শশাঙ্ক ঘোষ মামলা চালালেন। পান্নালাল বসু ছিলেন বিচারক। দুই পক্ষেই কয়েকশ' লোক সাক্ষ্য দিলেন। এই মামলার সওয়াল জবাব মাঝে মাঝে খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। পান্নালালবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল সুতরাং দু'একদিন কোর্টে তাঁর পাশে বসে কুমারের শ্যালকের সাক্ষীর জবানবন্দী শুনেছিলাম।

লোকের সঙ্গে আলাপ করে যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয় ঢাকার অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস ছিল এই সাধুই মধ্যম কুমার। এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দুটি কাহিনী বলছি। এই সময় ঢাকায় একজন বড় জ্যোতিষী আসেন। আমার যে শীঘ্রই পদোন্নতি হবে—একথা তিনি বলেছিলেন। সে-কথা পূর্বেই বলেছি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আচ্ছা, আপনি তো কুষ্ঠি ঠিকুজি বা হাতের রেখা দেখে সব বলতে পারেন। কুমারের তো ঠিকুজি কোষ্ঠি আছে। আপনি তাঁর হাতের রেখাও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তা একবার মিলিয়ে দেখুন না কেন।' তিনি একটু হেসে বললেন, 'তা কি আর বাকী আছে? আমি সব দেখেছি।' আমি বললাম, 'দেখে আপনার কি মনে হল?' তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন উনিই যে কুমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন আমি তাঁকে একটি কথা বললাম। সেটা বোঝবার জন্য একটু পূর্বের প্রসঙ্গ বলা দরকার। এই মামলায় গোড়া থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে শ্যালকই, এই সন্ন্যাসী যে কুমার নন—এ প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে কুমারের কোন সাদৃশ্য নেই—এটাই তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বড় সাক্ষী হলেন রাণীমা অর্থাৎ কুমারের স্ত্রী। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অম্লানবদনে বললেন যে ইনি আমার স্বামী নন। বিচারক তখন বললেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যা কোন তৃতীয় ব্যক্তির জানা সম্ভব নয়—আপনি এই রকম দু'একটি প্রশ্ন করে দেখুন না। রাণী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, 'না, ইনি আমার স্বামী নন। আমি কোন প্রশ্নই করতে চাই না।'

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে আমি জ্যোতিষীকে বললাম যে রাণীমা তো এরকম বলছেন। আপনি একবার রাণীকে বলুন না আপনি কি মনে করছেন। জ্যোতিষী বললেন; 'আমি রাণীমার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম, 'মা,

ইনি যে আপনার স্বামী তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আপনিও তা জানেন। তবে সেকথা স্বীকার করছেন না কেন? আমি সন্ন্যাসীর কোষ্ঠী ঠিকুজী এবং হাতের রেখা দেখে বেশ বুঝতে পারছি ইনিই আপনার স্বামী।' একটু চুপ করে থেকে রাণীমা বললেন যে অনেকদূর এগিয়েছি; এখন আর ফেরা যায় না।

দ্বিতীয় ঘটনাটির কথা এবার বলি। এই মামলা যখন চলছে তখন জয়দেবপুর স্কুলের কর্তৃপক্ষ প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষে আমায় আমন্ত্রণ করেন। রাজবাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। দুপুরে একটি বড় ঘরে খেতে বসেছি, একজন বৃদ্ধ রাজকর্মচারী আমার আহার তদারক করার জন্য বসে আছেন। খেতে খেতে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল দেয়ালে একটি বড় অয়েল পেণ্টিং ছবি টাঙ্গান আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ছবিটি কার?' তিনি হেসে বললেন, 'যাকে নিয়ে দেশ তোলপাড় হচ্ছে এটি সেই মধ্যম কুমারের ছবি।' তখন আমি হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, আপনাদের কি বিশ্বাস এই সন্ন্যাসীই মধ্যম কুমার?' বৃদ্ধ ভদ্রলোক দরজার দিকে চেয়ে ভাল করে দেখে নিলেন আর কেউ আছে কি না। কাউকে না দেখে আস্তে আস্তে বললেন, 'উনি যে মধ্যম কুমার তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের হুকুম—সেকথা বলা যাবে না। আপনি দয়া করে একথা যেন কাউকে বলবেন না, তা হলে আমার চাকরি যাবে।' আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে তাঁর বিশ্বাস রাজবাড়ির সকলেই এ কথা জানেন।

মামলার সুদীর্ঘ শুনানী শেষ হল। পরের দিন জজ রায় দেবেন। বেলা এগারটা আন্দাজ বাড়িতে খেতে বসেছি, এমন সময় হঠাৎ তোপ দাগার মতো আওয়াজ। তখনই বুঝলাম জজের রায় অনুসারে সন্ন্যাসীই কুমার সাব্যস্ত হয়েছেন। তা নইলে এমন আনন্দধ্বনি উঠত না। এর কয়েকদিন পরে আমি, পান্নালালবাবু, পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট এবং আরও দু'একজন ট্রেনে ঢাকার কাছে একটি জায়গায় এক সভা উপলক্ষে যাচ্ছিলাম। পান্নালালবাবু গল্প করছিলেন কি রকম সাবধানে তিনি তাঁর রায় গোপন করে রেখেছিলেন যাতে কেউ না টের পায়। পুলিশ সাহেব হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু আগেই টের পেয়েছিলাম সন্ন্যাসীকেই আপনি কুমার বলে সাব্যস্ত করেছেন।' পান্নালালবাবু খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনি কি করে টের পেলেন?' পুলিশ সাহেব বললেন, 'আপনার হয়তো মনে আছে যে রায় দেবার আগের দিন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রায় দেবার দিন আদালতে স্পেশাল পুলিশ মোতায়েন করব কি না। তাতে আপনি বললেন—না, তার কোন দরকার নেই। তখনই বুঝলাম যে সন্ন্যাসীই জিতবেন। তা না হলে একটা গোলমালের আশঙ্কা সবাই করেছিলেন।'

রায় বেরবার পরে সন্ন্যাসী কুমার আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। মামলার সময় বিপক্ষের উকিল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন

যে সন্ন্যাসী ভাল বাংলা বলতে পারেন না। আমি কিন্তু দেখলাম যে বাংলা তিনি বেশ ভালই বলতে পারেন; তবে তাঁর কথার মধ্যে ঢাকার নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে চলিত ভাষা মেশান আছে। শুনেছি ভাওয়ালের জমিদার বাড়ির ছেলেরা লেখাপড়া তেমন শেখেন নাই, নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে মানুষ হন। সুতরাং তাদের মুখের কথা বলা এঁদের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে কুমারের কথার মধ্যে ঈষৎ জড়তা বোধ হয় ছিল। সন্ন্যাসী বললেন যে তাঁকে বিষ খাইয়েছিল। তার ফলে তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সন্ন্যাসী এবং তাঁর দলের লোকদের বিশ্বাস যে মধ্যম কুমারের শ্যালক ওঁকে বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছিল যাতে তিনিই বোনের জমিদারির আসল কর্তা হতে পারেন। কুমারের স্ত্রী প্রথমে না জানলেও পরে এ সবই জানতেন। তবে ভাইএর বিপক্ষে কিছু বলতে চাননি। মোটের উপর এ এক অদ্ভুত কাহিনী; গল্প উপন্যাসের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর।

গভর্ণমেণ্ট এই বিচারের বিরুদ্ধে প্রথমে হাইকোর্ট এবং পরে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছিলেন। তবে দুই জায়গাতেই ঢাকার বিচারক পান্নালালবাবুর রায় বহাল থাকে অর্থাৎ সন্ন্যাসীই কুমার বলে সাব্যস্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেদিন বিলাতের আপীলের জয়ের খবর এসে দেশে পৌঁছল সেইদিন বা তার পরের দিনই সন্ন্যাসী মারা গেলেন। এইভাবে এই অদ্ভুত কাহিনীর উপর যবনিকা পতন হয়।

আর একটি কথা বলেই আমিও ঢাকার কাহিনীর উপর যবনিকাপাত করব। পূর্বেই বলেছি আমি ঢাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম। আমার কার্যকাল শেষ হবার সময় সমগ্র বাংলা দেশের জন্য এরূপ একটি বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব হয়। এইজন্যে প্রধানমন্ত্রী (ফজলুল হক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার (আজিজুল হক) ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়। এইজন্য আমাকে মাঝে মাঝে কলকাতা আসতে হত। ১৯৪১ সনের ৭ই আগস্ট এই সমিতির এক অধিবেশনে আমরা তিন জন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসে আলোচনা করছি এমন সময় একজন এসে সংবাদ দিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তিম কাল উপস্থিত। আমরা তৎক্ষণাৎ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তাঁর শ্বাস উঠেছে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হল। স্থির হল যে তাঁর মৃতদেহ কলকাতা সিনেট হাউসের কাছ দিয়ে নেওয়া হবে, বঙ্গদেশের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মৃতদেহে মাল্যদান করবেন। কয়েক ঘণ্টা পরে সিনেট ভবনের সিঁড়ির নীচে শবাধার থামল। আমি ও আজিজুল হক তাঁর দেহের উপর পুঞ্জীভূত মালার উপর বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে মাল্য দান করলাম।

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম

যে একুশ বৎসর (১৯২১-৪২) আমি ঢাকায় ছিলাম ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে তা একটি বিশেষ স্মরণীয় যুগ। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহোযোগ আন্দোলন। অপর দিকে গুপ্ত সমিতির সশস্ত্র হিংসাত্মক বিপ্লববাদের কাহিনী এই যুগকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। ঢাকার যুবক দলের যে এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রসঙ্গে তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কিছু যোগাযোগ ছিল সংক্ষেপে তা লিপিবন্ধ করছি।

ছাত্র অবস্থায়—বিশেষতঃ বরিশালে অশ্বিনী দত্তের প্রভাবে স্বদেশী আন্দোলনে ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনে অন্যান্য বহু ছাত্রের ন্যায় আমিও যোগদান করেছিলাম। ১৯০৮ সনে যখন মানিকতলার বাগানে সশস্ত্র বিপ্লবের উপকরণাদি আবিষ্কৃত হল, তখন ছাত্রদের মধ্যেও যে তা কিভাবে বিস্তৃত হয়েছিল তার একটি কাহিনী বলছি।

আমি যখন হিন্দু হোস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়ি (১৯০৭-০৯ সনে) তখন একদিন রাত্রে আমার একটি ছাত্র বন্ধু আমাকে ডেকে নিয়ে হোস্টেলের মাঠে নির্জন স্থানে বসে গুপ্ত সমিতির বিষয় অনেক গল্প করত এবং বারীন ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা দেশের জন্য কিভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার প্রশংসা বা স্তুতিগান করত। আমিও তার সঙ্গে যোগ দিতাম। আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে অবশেষে সে এক দিন আমাকে খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করল আমি এইরূপ সমিতিতে যোগদান করতে প্রস্তুত আছি কিনা। আমি বললাম, আমি তো এরূপ সমিতির কাউকেও চিনি না। তখন সে বলল যে সে নিজে এইরূপ এক সমিতির সভ্য এবং সে আমাকে ঐ সমিতির কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাবে। এর ফলে আমার যে কত রকম বিপদ হতে পারে—কারাবাস, মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে তাও বলল। তারপর যোগ করল—তুই খুব ভাল ছেলে, (আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে F. A. অর্থাৎ এখনকার I. A পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলাম) পুলিশ তোদের সন্দেহ করবে না এই জন্যেই তোদের মত সদস্য দরকার। তবে বিপদ যে আছে তা আমি গোপন করতে চাই না। তুই ভেবে দেখ।

সে রাত্রে আমার ঘুম হল না—এই রকম গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেব কিনা তাই মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। পরদিন বা দুই-এক দিন পরে গভীর রাত্রে আমি তাকে মাঠের এক নির্জন স্থানে নিয়ে যা বলেছিলাম তাহার সারমর্ম এই, "আমি খুব দরিদ্র পরিবারে জন্মেছি। আমার ছেলেবেলার কথা মনে আছে। কোন কোন দিন ঘরে চাল নেই, তখন সাত আট বছরের ছেলে আমি ও আমার এক ভগ্নী গ্রামের কোন প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চাল ধার করতে যেতাম। অনেক দিন ডাল ভাত ছাড়া আমার জেঠি; খুড়ী, বউদিদিদের আর কিছু জুটত না। তখন মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে বড় হয়ে এঁদের দুঃখ কষ্ট ঘুচাব। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা খুব বড় কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বাল্যকালের সে প্রতিজ্ঞা ভুলি নি। মনে আশঙ্কা হয় যে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিলেও হয়ত আমার চিত্তের দুর্বলতার জন্যে আমার দরিদ্র পরিবারের কথা চিন্তা করে ব্রত ভঙ্গ করে ফেলব। এতে সমিতির যে গুরুতর অনিষ্ট হতে পারে তাই ভেবে আমি গুপ্ত সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করব না। তবে আমার প্রাণ গেলেও তোদের গুপ্ত সমিতির কথা কারও কাছে বলব না।

এর কয়েকদিন পরে আমার বন্ধুটি এসে বলল যে বড় বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি। বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়েছি যে আজ রাত্রে পুলিশ আমাদের কয়েকজনের ঘর অনুসন্ধান করবে। আমাদের ঘরে দুইটি রিভলভার আছে। পুলিশ ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই কাছাকাছি ঘুরছে—আমরা যে কয়জন মার্কামারা আছি তারা বাইরে গেলেই সন্দেহ করে আমাদের খানাতল্লাস করে। আর একটি ছাত্রের নাম করে বলল, তোরা দুজনে আলোয়ান গায়ে দিয়ে যদি রিভলভার দুটো নিয়ে বাইরে কোথাও রেখে আসিস তবে আমরা এ যাত্রা রক্ষা পাই। আমরা দুজনে আলোয়ান গায়ে দিয়ে বিকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যাচ্ছি এইভাবে অগ্রসর হয়ে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গেলাম। পরবর্তী কালে এই ইনস্টিটিউট এক বিশাল ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন কিন্তু এটি ঐ ভবনের পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র রাস্তাটির ওপারে একটি একতলা বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর একটি ঘরে এক গাদা কতকগুলি পুরাণো সংবাদপত্রের নীচে রিভলভার দুইটি রেখে চলে এলাম। সেই রাত্রে পুলিশ সত্যি সত্যিই হিন্দু হোস্টেলের কয়েকটি ঘর খানাতল্লাসী করেছিল।

পরবর্তী কালে আমি যখন ঢাকায় চাকুরী করি তখন কয়েকটি বিপ্লবী সমিতিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতাম। এর মধ্যে একটি ছিল অভয় আশ্রম। আমি ও জ্ঞান ঘোষ শিক্ষকগণকে বলতাম, দেশের মঙ্গলের জন্য তুমি এত টাকা দেবে—কোন প্রশ্ন করবে না। তারা ব্যাপারটা বুঝত—টাকা দিত, কোন প্রশ্ন করত না। গোপনে রাত্রে এসে সুরেশ ব্যানার্জী টাকা নিয়ে যেতেন। সুরেশ ব্যানার্জী পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন।

সুভাষ বসুকেও এইরূপ অর্থ সাহায্য করেছি। সুভাষ আমার এক

ভাগিনেয়ের সঙ্গে কটকে এক ক্লাসে পড়ত। সেই সুবাদে কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসত, আমার স্ত্রীকে মামী বলে ডাকত। সুভাষ পরবর্তী জীবনে কোন্ বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে কিভাবে জড়িত ছিল তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু অভয় আশ্রমের ন্যায় তাকেও অর্থ সংগ্রহ করে দিতাম। ১৯৪০ সনের বড় দিনের ছুটিতে কলকাতা এসেছিলাম। সুভাষ তখন জেলের কয়েদী, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সরকার তাকে এলগিন রোডে নিজের বাড়ীতেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাড়ীর দরজায় দুই সৈনিক পাহারা দিত, কারণ সুভাষের বাড়ীর বাইরে যাবার অনুমতি ছিল না। ১৯৪১ সনের জানুয়ারি মাসের প্রথম পাঁচ ছয় দিনও ছুটি ছিল। এই সময় আমার ঢাকার এক ছাত্র এসে বলল যে সুভাষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নির্দিষ্ট সময়ে আমি এলগিন রোডের বাড়ী গেলাম। দরজায় দুজন সান্ত্রী পাহারাওয়ালা ছিল। তারা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। আমি দোতলায় উঠে দেখলাম সিঁড়ির মাথায় সুভাষের ভাইপো দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে একটি বন্ধ দরজার সামনে নিয়ে বলল— আপনি এই দরজা খুলে ভিতরের প্রথম ঘর পার হয়ে দ্বিতীয় ঘরে যাবেন, আমার আর এর বেশী যাওয়ার অধিকার নেই। আমি ঘরে ঢুকে দেখি সুভাষ শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বলল, আমার কিছু টাকার দরকার, সেই জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি বললাম, তুমি এখন টাকা দিয়ে কি করবে? সুভাষ ঈষৎ হেসে জবাব দিল—এ প্রশ্ন তো কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নি? আমি বললাম, তোমার শরীর খুব খারাপ—টাকা সংগ্রহের মানে তুমি কিছু করবার মৎলবে আছ। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সুভাষ বলল, যতটা শুনেছেন আমার শরীর ততটা খারাপ নয়। আমি বললাম, এ সংবাদে খুব খুশী হলাম। তারপর কি ভাবে কার হাত দিয়ে টাকা পাঠাব তার ব্যবস্থা করে উঠলাম। দরজা পর্যন্ত গিয়েছি এমন সময় সুভাষ ডাকল 'শুনুন, শুনুন'। আমি ফিরে গেলে বলল, 'মামীমাকে আমার প্রণাম জানাবেন।' আমি এটা সাধারণ মামুলি কথা মনে করে চলে এলাম। ঢাকায় ফিরে যেদিন সংবাদপত্রে দেখলাম সুভাষ গৃহত্যাগ করেছে তখনই আমার মনে হল আমার স্ত্রীকে প্রণাম জানানোর অর্থ সে বহু দিনের জন্য বিদায় নিল। আমার স্ত্রীকে বললাম—সুভাষ বোধ হয় শেষ বিদায় নিয়ে গেল। তখন জানতাম না যে আমার এই আশংকা নিদারুণ সত্যে পরিণত হবে।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে আমাদের স্বাধীনতালাভে সুভাষের অবদান গান্ধীর চেয়ে কম নয় বরং বেশী। ভারত সরকার—যারা স্বাধীনতালাভের জন্য ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট সারারাত্রি উৎসব ও মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার সময় সুভাষ বোসের উল্লেখ মাত্র করেন নি, তারা আমার প্রতি এইজন্য বিরূপ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব (Attlee)

আমার এই সিদ্ধান্ত পুরাপুরি সমর্থন করেছেন। আমার *History of the Freedom Movements* Vol. III—গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করেছি (দ্বিতীয় সংস্করণ ৬০৯-৬১০ পৃষ্ঠা)। সুভাষ বসু আজ জীবিত আছে কিনা তা আমার জানা নেই। এ যাবৎ তা নির্ণয়ের জন্য সরকার একাধিক সমিতি গঠন করেছেন। সকলেই সিদ্ধান্ত করেছে যে সুভাষ টাইহোকু বন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান (১৯৪৫—১৮ আগস্ট)। কিন্তু আমি তা সত্য বলে স্বীকার করি না। দুইজন আমেরিকান সমসাময়িক সংবাদপত্রে লিখেছেন যে ঐ তারিখের দুই দিন পরেও তাঁরা সুভাষ বসুকে সাইগনে দেখেছেন। ভারত সরকারও যে জানত সুভাষ বোস ১৮ আগস্ট মারা যান নি ভারতের বড়লাট ওয়াভেলের পত্র থেকে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ২৩শে আগস্ট (১৯৪৫) তিনি লর্ড পেথিক লরেন্সকে এক চিঠিতে সুভাষ বসুকে এখন কোথায় রাখা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন (*The Transfer of Power* Vol. VI—Her Majesty's Stationery Office, 1976, P. 107)।

বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিকে সুভাষচন্দ্র বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে যারা আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে সকলকেই আমি বলেছি ১৯৪১ সনে জানুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে এলগিন রোড ভবনে আমি সুভাষ বসুকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। এই টাকার প্রকৃত সংখ্যা যদি এই ব্যক্তি বলতে পারে তবে জানব এই ব্যক্তিই সুভাষ; অন্যথা সে জাল প্রতারক মাত্র। স্বাধীনতা লাভের পর সুভাষ বসু যে বহুদিন জীবিত ছিলেন এরূপ কিছু কিছু প্রমাণ পেয়েছি কিন্তু যদিও একাধিক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে সুভাষ এখনও (১৯৭৭ ডিসেম্বর) জীবিত আছেন। আমি এর কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাই নি।

শচীন ও ব্যবসায়ের কথা

১৯৪২ সনের পয়লা জুলাই আমি ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা এসে আমার নিজের বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করি। তখন আমার বয়স ৫৪ বৎসর পূর্ণ হয়নি এবং স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। সুতরাং ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী একটা স্থির করতে হল। বলা বাহুল্য, ইতিহাসের বই লেখাই আমার লক্ষ্য হল। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশের যে ইতিহাস আমি ঢাকায় থাকতে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম সেইটি শেষ করাই প্রথম কর্তব্য মনে করলাম এবং তদনুসারে কিছু পড়াশোনাও আরম্ভ করলাম। কিন্তু এই সময় ঘটনাচক্রে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমাকে যোগ দিতে হয়। আমার জীবনে ব্যবসা করা এই প্রথম এবং শেষ। এই কাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কয়েকজন ছাত্রের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সুতরাং একটু সবিস্তারে বলছি।

ঢাকায় শচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য নামে আমার একজন ছাত্র ছিল। আমি যখন জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট তখন সে ঐ হলেই বাস করত। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়ে তার ব্যক্তিত্ব, অধ্যবসায় এবং চরিত্রের যে পরিচয় পাই তাতে তার প্রতি আমি খুব আকৃষ্ট হই। ছেলেটি ছিল খুব গরীব; পড়াশোনার খরচ চালান তার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। আমি তাকে একটি স্টাইপেণ্ড দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু তাতেও তার কুলতো না বলে আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলাম। এই জন্য সে আমার বিশেষ অনুগত এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। শচীন তেমন মেধাবী ছাত্র ছিল না; কিন্তু একবারেই সে বি. এ. পাশ করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন তুমি কি করবে?' সে বললে, 'এম. এ. পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এবং কেবল বি. এ. পাশ করে কোন ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না। এজন্য স্থির করেছি আর পড়াশোনা না করে ব্যবসা করব।' শুনে আমি একটু আশ্চর্য হলাম, বললাম, 'তোমার তো টাকা পয়সা কিছু নেই। ব্যবসা করবে কি করে?' সে বললে, 'মাড়োয়ারীরা তো এদেশে কেবল লোটা কম্বল নিয়ে আসে; তারপর বড় ব্যবসা ফাঁদে। আমিও সেই চেষ্টা করব, তবে ঢাকায় সুবিধে হবে না; আমি কলকাতায় যাব। আমাকে আশীর্বাদ করুন।' কিন্তু ব্যবসায় তার সফল হবার সম্ভাবনা ছিল বলে আমার মনে হল না। তবুও আমি তাকে আশ্বাস জানিয়ে এবং আশীর্বাদ করে বিদায় দিলাম। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে চিঠি

লিখে সে আমায় জানাত ছোটখাট কি ব্যবসা শুরু করেছে। সে সব কথা ঠিকমতো এখন আর আমার মনে নেই।

তিন চার বছর পরে শচীন আমাকে লিখে জানাল সে একটা ব্যাংক খুলেছে এবং জগন্নাথ হলের কয়েকজন ছাত্র তার সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। এদের সকলকে আমি ভালই চিনতাম। কিন্তু একটা ব্যাংক চালান যে এদের পক্ষে সম্ভব তা কখনই ভাবতে পারিনি। সে এই ব্যাঙ্কের নাম দিয়েছিল ন্যাশনাল ব্যাংক। কলকাতায় ঐ নামে আর একটি ব্যাংক ছিল। তারা আপত্তি করায় নামটা একটু বদলে নতুন নাম হল ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক। সে আমাকে জানাল যে অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। তবে সে ভরসা ছাড়েনি। একদিন সে হঠাৎ ঢাকায় এসে হাজির। আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, 'আমার পৈতৃক বাড়ি বাবার আমল থেকে ঋণের দায়ে একজনের কাছে মর্টগেজ আছে। দু'একটি ব্যাংক শত্রুতা করে সেই খবর কাগজে ফলাও করে লিখে আমার ব্যাঙ্কের ক্ষতি করছে। এখন সেই মর্টগেজ ছাড়িয়ে নিয়ে তার পাল্টা জবাব দিতে হবে। এ বিষয়ে আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি। সুদে আসলে ঋণের পরিমাণ দু'তিন হাজার টাকার মতো হয়েছে। এই টাকাটা যদি আপনি দেন কুমিল্লায় আমার বাড়িতে গিয়ে মর্টগেজটা ছাড়াতে পারি।' জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাংক সম্বন্ধে তার কাছ থেকে যা খবর পেলাম তাতে এই ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদই মনে হল। আমার ধারণা হল শচীন যে রকম উৎসাহ এবং উদ্যমের সঙ্গে কাজ করছে তাতে তার নিজের ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল। অনেক ভেবে চিন্তে তাকে ঐ টাকাটা আমি দিলাম এবং সে ঋণ শোধ করল। এর কিছুকাল পরে আবার কি একটা গোলমাল দেখা দেওয়ায় সে আমার কাছে ছুটে আসে। সেবারও আবার আমি দু'তিন হাজার টাকা দেওয়ায় তার ব্যাংক রক্ষা পায়। এই রকম বাধা বিপত্তি আরও এসেছিল কিন জানি না। ঢাকা ছাড়বার পূর্বেই শুনে আনন্দ হয়েছিল যে শচীনের ব্যাংক এখন খুব বড় হয়েছে। বাংলা দেশের নানা স্থানে এবং বাংলার বাইরেও তার অনেক ব্রাঞ্চ হয়েছে। ফলে শচীনের উপার্জনও বেশ বেড়েছে। কলকাতায় মিশন রো'তে ব্যাঙ্কের একটি নিজস্ব চারতলা বাড়িও হয়েছে।

ঢাকা থেকে আমার কলকাতায় ফেরার কয়েকদিন পরে শচীন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়জন ছাত্র এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে লিপ্ত ছিল তারা সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ব্যাংক সম্বন্ধে যে সব কাগজপত্র শচীন সঙ্গে এনেছিল তা দেখে আমি বিস্মিত হলাম। ব্যাংকটি তখন বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং বহু লক্ষ টাকা ডিপোজিট হয়েছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে শচীনের এই সাফল্যের জন্যে তাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম। ছাত্ররা বলল যে কেবল আশীর্বাদ করলেই হবে না আপনাকে এই ব্যাঙ্কে যোগ দিতে হবে। আপনার নামটা আমাদের চাই। আমি বললাম যে ব্যাংক বা এই জাতীয় ব্যবসা কখনও করিনি, কিছু

জানিও না ; সুতরাং এ সবের মধ্যে আমি যেতে চাই না। তখন তারা বলল যে আমরা নতুন একটা কটন মিল খুলেছি—'হিন্দুস্থান কটন মিল'। আপনাকে এতে যোগ দিতে হবে। আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না ; সুপারভাইজার রূপে থাকবেন। আমরা সকলেই আপনার ছাত্র। বাঙ্গালীর ব্যবসা ফেল করার প্রধান কারণ নিজেদের মধ্যে কলহ। এজন্য আমরা স্থির করেছি আপনি সুপারভাইজার রূপে থেকে আমাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলে সব শুনে যা বলবেন আমরা সবাই তা মেনে নেব। কাজের চাপও তেমন নয়। সাধারণভাবে আপনি কাজ দেখবেন। সপ্তাহে দু'তিন ঘণ্টা বিকেলে অফিসে গেলেই চলবে। এর জন্যে আমাকে অবশ্য মাসিক কিছু টাকাও দেবে তাও বলল। অনেক ইতস্ততঃ করে আমি তাদের প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম।

কাজে যোগ দিয়ে দেখলাম ব্যাংক এবং কটন মিল ছাড়াও ওরা আরও অনেক রকম ব্যবসা করে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। ওরা অনেকগুলি মিলিটারি কনট্রাক্ট নিয়েছে। আমাকে তার একটি ব্যবসায়ে ডিরেক্টরও করল। একটি কনট্রাক্ট ছিল মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে স্পিরিট ল্যাম্প সরবরাহ করা। সপ্তাহে একহাজার কিম্বা তার বেশি এই ল্যাম্প সরবরাহ করতে হত। ল্যাম্পের খরচা পড়ত প্রতিটি পাঁচ সিকে ; কিন্তু ওরা পেত পাঁচ টাকা করে। এই হিসেবে কাগজে কলমে প্রতি সপ্তাহে প্রায় তিন চার হাজার টাকা লাভ হবার কথা। কিন্তু এর অর্ধেক ঘুষ দিতে হত কর্মচারীদের। তাহলেও অনেক লাভ থাকত এবং যত দিন যুদ্ধ চলেছিল তাতে বেশ মোটা টাকাই ওরা লাভ করেছিল। অবশ্য ডিরেক্টর হিসেবে আমিও তার কিছু অংশ পেয়েছিলাম।

এইরকম আরও দু'একটি কনট্রাক্ট ওরা নিয়েছিল। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই আর কোনটির মধ্যে যাইনি। কটন মিলটিও ভালই চলছিল। কিন্তু এই সময় তুলা যোগাড় করা ছিল খুব কষ্টসাধ্য। আমি নিজে বোম্বাই গিয়ে অনেক তদ্বির করে আমার পরিচিত কয়েকজন লোকের সাহায্যে কিছু সুতো সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলাম। এতে ব্যবসাটি বেশ ভালই চলতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে আমার কেমন সন্দেহ হল যে মিলের নাম করে এই যে সুতো আনার ব্যবস্থা আমি করেছি, ওরা তার একটা অংশ কালোবাজারে বিক্রি করে নিজেরাই সে লাভের টাকা নিচ্ছে। এতে আমি বেশ অসন্তুষ্ট হলাম। কিছুদিন পরে কটন মিলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলাম।

ক্রমে ক্রমে কানে আসতে লাগল যে ব্যাংক নিয়েও শচীন অসদুপায়ে অনেক টাকা লাভ করছে। এর একটি দৃষ্টান্ত মনে আছে এবং সেটি সম্ভবত অনেকটা সত্য। ব্যাংক থেকে একটি চা বাগানে আট লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এ সব ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল যে, বাগানের সম্পত্তি কি আছে তা ভাল ভাবে তল্লাস করে তার মূল্যের অর্ধেক বা কিছু বেশি টাকা ধার দেওয়া যেতে পারে। ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় শচীন বলল যে সে নিজে গিয়ে তদন্ত করে দেখে এসেছে এই বাগানের

যে সম্পত্তি আছে তাতে আট লক্ষ টাকা ধার দেওয়া যায়, এবং তার কথামতই ঐ ঋণ মঞ্জুর হয়। এর কিছু কাল পরে একদিন সন্ধ্যার পর আমার একজন খুব প্রিয় ছাত্র আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসে। ছাত্র হিসেবে সে খুব মেধাবী ছিল; এম. এ. পরীক্ষাতেও তার ফল বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবী দলে থাকায় কোন সরকারী চাকরি সে পায়নি। শচীনকে বলে আমি তাকে এই ব্যাংকে একটি চাকরি দিয়েছিলাম। সচ্চরিত্র বলে তার খ্যাতি ছিল। আমিও তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম। সে এখনও জীবিত; সেজন্যে তার নাম উল্লেখ করছি না। ব্যাংক সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপার সে আমাকে জানায়। তার একটি এই চা বাগানের ঋণ সম্বন্ধে। সে বলে যে অনেকেরই সন্দেহ শচীন এক লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে ঐ আট লক্ষ টাকা ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। আসলে বাগানে এত টাকার মতো সম্পত্তি নেই। আমি আর এই ব্যাংকে থাকতে চাই না—আপনি আমায় অনুমতি দিন। সত্য সত্যই ছেলেটি ঐ চাকরি ছেড়ে দিল; যদিও তার আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। তারপর ক্রমশই এই রকম জনরব আরও আমার কানে আসতে থাকে। শচীনকে একদিন ডেকে বললাম, 'তুমি যে ব্যবসায় উন্নতি করেছ তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার অসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধি, অধ্যবসায় এবং কর্মকুশলতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু তোমার সততা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জন্মেছে। সততা না থাকলে ব্যবসা টেকে না।' শচীন অবশ্য সব অভিযোগই অস্বীকার করল। তার কথায় আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। ফলে তার ব্যবসার সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি ত্যাগ করলাম। এখানে বলা দরকার, শচীনকে যে টাকা ধার দিয়েছিলাম তার সবই সে শোধ করে দিয়েছিল। তবে তার অনুরোধে আমি ব্যাংকের অনেক টাকার শেয়ার কিনেছিলাম।

এর পরে ক্রমে ক্রমে শচীনের সঙ্গে জগন্নাথ হলের যে কয়জন ছাত্র কাজ করত—শচীনকে অনুরোধ করে যাদের আমি ঐ ব্যাংকে কাজ দিয়েছিলাম—তারা অনেকেই আমার কাছে এসে শচীনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতে থাকে। ব্যাংকের উন্নতি খুবই গৌরবের বিষয়; এবং শচীন নিজেও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছে। এখন কিন্তু তার মাথা গরম হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছে, সে ঠিক পথে চলছে না। তখন ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংকের বেশ সুনাম; শচীনও ব্যবসাজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। শচীনকে ডেকে একদিন যা শুনেছি বললাম। দুঃখের বিষয় কোন ফল হল না। কিছুদিন পরেই ঐ ব্যাংক ফেল পড়ল। শচীন বলল তার শত্রুদের নানা মিথ্যে রটনায় আমানতকারীরা দল বেঁধে টাকা ফেরৎ চাওয়ায় ব্যাংক ফেল হল। কিন্তু অন্য ছাত্ররা বলল যে তা নয়। ব্যাংকের অনেক গলদ ছিল, সেটা বেরিয়ে পড়তেই এই বিপত্তি ঘটল। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ কলকাতায় যখন কয়েকটি দেশী ব্যাংক মিলে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া তৈরী হয় তখন

শচীনকেও তাতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমিও সেই পরামর্শই দিয়েছিলাম। শচীন তাতে রাজী হয়নি। আমার ধারণা এতে যোগ দিলে ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সব পরীক্ষা হত। তাতে গলদ ধরা পড়ত, সেজন্যেই শচীন রাজী হয়নি।

ব্যাঙ্ক ফেলের পর কটন মিলও শচীনের হাতছাড়া হল। তার নামে ফৌজদারী মামলা শুরু হল। অভিযোগ ছিল, ব্যাঙ্কের কোন এক কর্মচারীকে দিয়ে সে একটি বিবরণ (statement) লেখাতে চেয়েছিল যাতে তার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়। কর্মচারীটি অস্বীকার করায় সে তাকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি ছুঁড়েছিল। মোটকথা, শচীনের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দু'রকম মামলাই চলতে থাকে। শেষ জীবনে শচীন বেশ অশান্তির মধ্যে ছিল। এই সব মামলা নিষ্পত্তি হবার আগেই হঠাৎ তার মৃত্যু হয়।

শচীনের জীবন কাহিনী সবিস্তারে বলার কারণ আমাদের দেশেও এমন মেধাবী ছাত্র আছে যারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণ হয় যে খুব বেশি সফল হলে ধীরভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যবসা চালান সহজ ব্যাপার নয়। শচীনের জীবনের এহেন পরিণতির জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু তার অসাধারণ কর্মকুশলতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থান কটন মিলেরও অনেক গলদের কথা প্রকাশ পায়। এই নিয়েও মামলা শুরু হয়। শচীনের মৃত্যুর পর তার সহযোগী জগন্নাথ হলের আর একজন ছাত্রের জেল হয়। এইভাবে আমার ঢাকার কয়েক-জন ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার উপর যবনিকাপাত হয়। আমার অনেক টাকার শেয়ার ছিল, সে সবই নষ্ট হল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা

কটন মিলের জন্য সুতো সংগ্রহের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর যে কারণে আমি এই সময় মাঝে মাঝে বোম্বাই যেতাম এখন সেই কথা উল্লেখ করব। আমি যখন শচীনদের সঙ্গে ব্যবসায় যোগ দিয়েছি সেই সময় একবার কাশীতে এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে (ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস কিম্বা ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স-এ) যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে বোম্বাইএর এক প্রতিনিধি, আচার্য জিন বিজয় নামে এক জৈন সাধু, আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন যে শ্রীকে. এম. মুন্সী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা মুন্সীজী করেছেন। তাঁর ইচ্ছা সেই ব্যাপারে আমি যেন যুক্ত হই।

শ্রীকানহাইয়া লাল মুন্সী তখন বোম্বাই শহরের একজন খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বেশ কিছুকাল বোম্বাই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং একবার তিনি ভারত সরকারেরও মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর পেশা ছিল ওকালতি এবং এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ১৯৩৮ সনে তিনি বোম্বাই শহরে 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আচার্য জিন বিজয় ছিলেন ভারতীয় বিদ্যাভবনের ডিরেক্টর। মুন্সীজীর সঙ্গে তখন আমার কোন পরিচয় ছিল না।

জিন বিজয়জীর সঙ্গে ইতিহাস লেখার বিষয়ে কথাবার্তা বলার পর তিনি আমাকে বলেন যে আপনার যখন এতে সম্মতি আছে তখন এ বিষয়ে মুন্সীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলা দরকার, মুন্সীজীরও তাই ইচ্ছা। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই গেলেন। মুন্সীজীর বাড়িতেই উঠলাম। তাঁর কাছে ব্যাপারটি বিশেষরূপে শুনলাম।

ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুন্সীজী একখানি পূর্ণাঙ্গ ভারতের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর ধারণা ছিল, এই বইখানি অন্ততঃ আট দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে, প্রতি খণ্ডে পাঁচ ছ শত পৃষ্ঠা, এবং ভারতীয় ছাড়া অন্য দেশের কোন লোক এর লেখক হবেন না। বলা বাহুল্য এই কাজ বহু ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তিনি তাঁর এক মক্কেল এবং বিশেষ বন্ধু বিড়লা কোম্পানীর কর্তা শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লার কাছে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। শ্রীবিড়লা এই প্রস্তাবে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বলেন তিনি

শ্রীকৃষ্ণার্পণ চ্যারিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং ঐ কমিটির পক্ষ থেকে তিনি এই ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং এই ইতিহাস লেখার জন্য কমিটি গঠিত হল। তার নাম হয় ভারতীয় ইতিহাস সমিতি—এর চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীকে. এম. মুন্সী ; ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লা, আর ছজন সদস্যের মধ্যে ছিলেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, স্যার টেকচাঁদ প্রভৃতি। ১৯৪৪ সনে এই কমিটি গঠিত হয়। কমিটি স্থির করলেন যে এই বই-এর বিভিন্ন অধ্যায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত হবে এবং এর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার থাকবে একজন সাধারণ সম্পাদকের (General Editor) উপর।

পরে মুন্সীজী আমাকে বলেছিলেন যে, এইরূপ ব্যবস্থার মূলে ছিল ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের প্রস্তাবিত এইরূপ একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার অভিজ্ঞতা। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস বই লেখার সমস্ত ভার দিয়েছিলেন একটি কমিটির হাতে। কিন্তু তাতে কাজ বেশি এগোয়নি। মুন্সীজীর তাতে এই ধারণা হয় যে, একজন লোকের উপর দায়িত্ব না দিলে এই ধরনের কাজ ভাল-ভাবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হবে না। এই কমিটিতে স্থির হয় যে আমাকে এই সাধারণ সম্পাদকের ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হোক। এক স্যার রাধাকৃষ্ণণ ছাড়া উক্ত কমিটির আর কোন সদস্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। পরে মুন্সীজীকে এক সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন কেন—কারণ শুনেছিলাম তাঁর প্রস্তাব অনুসারেই আমি নির্বাচিত হয়েছি। মুন্সীজী বলেছিলেন যে যদিও তিনি আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন না তবে ঢাকা থেকে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল (প্রথম খণ্ড) দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁদের প্রস্তাবিত ইতিহাসও এই ভাবেই লেখা উচিত। এইজন্যই তিনি আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ীই আচার্য জিন বিজয়জী আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

মুন্সীজীর সঙ্গে বই-এর প্ল্যান নিয়ে অনেক কথা হল। স্থির হল মোট দশ খণ্ডে এই বই শেষ হবে—হিন্দু যুগ পাঁচ খণ্ড, মুসলমান যুগ দুই খণ্ড, মারাঠা এক খণ্ড এবং ইংরেজ যুগ দুই খণ্ড। তখন অবশ্য জানতাম না যে, এই বই শেষ হওয়ার আগেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং তার ফলে ইংরেজ যুগের অনেক ঘটনা নতুন ভাবে লেখার দরকার হবে। ইংরেজ যুগের জন্য পরে আরও একটি খণ্ড বাড়ান হয়। সব শুনে মুন্সীজীকে বললাম যে আমি ভার নিতে রাজী আছি যদি তিনি আমার দুটি শর্ত গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, কোন্ অধ্যায় কে লিখবেন সে বিষয়ে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তিনি বা কমিটি তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আমি সম্পাদন করে যে

বই প্রেসে পাঠাব আমার সম্মতি ছাড়া তার মধ্যে কোন অদল বদল করা চলবে না। যদি তাঁদের আপত্তির কিছু থাকে তা অবশ্যই আমি বিবেচনা করে দেখব। কিন্তু আমার যা সিদ্ধান্ত সেটাই শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে। মুন্সীজী এই দুটি শর্তই মেনে নিলেন। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, এই কথা হওয়ার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর পার হয়েছে ; বই এর জন্য টাকাকড়ি সবই মুন্সীজী ব্যবস্থা করেছেন ; এর মধ্যে এগারো খণ্ড বইও প্রকাশিত হয়েছে এবং মুন্সীজীও আজ ইহজগতে নেই ; কিন্তু মুন্সীজী তাঁর প্রতিশ্রুতি কোনদিন লঙ্ঘন করেন নি।

মুন্সীজীর সঙ্গে কথা বলে কি ভাবে কাজ শুরু হবে তা স্থির হল। তিনি বললেন, 'একাজে প্রথম দিকে আপনার বোম্বাইএ থাকা উচিত। কারণ আপনার সঙ্গে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দরকার হবে।' সপরিবারে আমার বোম্বাইএ থাকার জন্য তিনি একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। তদনুসারে মাস দুয়েকের মধ্যেই আমি কলকাতার কাজকর্ম গুটিয়ে বোম্বাই গেলাম।

অনেক দিন পরিশ্রম করে ভেবে চিন্তে একটি প্ল্যান আমি স্থির করলাম। কোন্ খণ্ডে কি কি বিষয় থাকবে এবং কে কে লিখবেন তার একটি খসড়া প্রস্তুত করলাম। মুন্সীজী আমাকে বললেন যে বিলেতের George Allen & Unwin প্রকাশন সংস্থা এই বই ছাপানর ভার নিয়েছেন! যতদূর স্মরণ হয় আমি প্রায় সাত আট মাস বোম্বাইএ ছিলাম। এর মধ্যে প্ল্যান ছাপা হল। যাঁদের লেখার কথা তাঁদের কাছে চিঠি লেখা হল এবং সে চিঠির উত্তরও এসে গেল। বই লেখার কাজ এক রকম আরম্ভ হয়ে গেল। মুন্সীজী আমাকে একজন কেরানী ও একজন টাইপিস্ট দিয়েছিলেন।

বোম্বাইএ আমার হাতে অনেক সময় ছিল। কাজেই যে সব অধ্যায় আমার লেখার কথা তা লিখতে শুরু করলাম, কিন্তু কিছুকাল পরে আমার হজমের গোলমাল দেখা দিল। পেটে ভয়ানক বেদনা এবং সর্বদা ক্ষুধার ভাব। বেশি কাজ করতে পারতাম না। বোম্বাইএ তখন একজন নামকরা বাঙ্গালী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। তাঁর ওষুধেও কোন কাজ হল না ; বরং অসুখ বেড়ে গেলে। মুন্সীজীকে অসুখের কথা জানাতে তিনি তাঁর পরিচিত একজন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের নাম বললেন—এ ভদ্রলোকের তেমন নামডাক ছিল না ; তবে তাঁর উপর মুন্সীজীর খুব বিশ্বাস ছিল। মুন্সীজীর কথা অনুসারে আমি সেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। দু'তিন দিন পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে সবই উল্টো চিকিৎসা হয়েছে। লক্ষণ দেখছি গ্যাসট্রিক আলসারের (Gastric ulcer)। এর উপশমের জন্যে প্রধান দরকার খাওয়ার দিকে নজর রাখা। কিন্তু আমরা বোম্বাইএর লোক ; বাঙ্গালী রোগীর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক মতো করতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বললেন, এই অবস্থায় সরষের তেল খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। সরষের তেল গ্যাসট্রিক আলসারের রোগীর কাছে বিষবৎ। কিন্তু আপনারা তাতে অভ্যস্ত।

তাছাড়া এর উপর আবার মাছও আপনারা খান। কাজেই আপনার উচিত বাঙ্গলা-দেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শুনে বেশ মুসকিলে পড়লাম। কারণ কথা ছিল দু'তিন বছর বোম্বাইএ থেকে বইএর কাজ দেখা শোনা করব। ততদিনে প্রথম খণ্ড ছাপা হয়ে যাবে। সেজন্যেই মুন্সীজীর আমার জন্যে বাড়ির ব্যবস্থা এবং আমাকে মাসে এক হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ডাক্তারের কথা মুন্সীজীকে বলায় তিনি বললেন স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে তো কাজ করতে পারবেন না। আপনি বরং এখন কলকাতায় ফিরে যান; বাড়ি ভাড়া ছাড়া যে টাকা আপনাকে দিই তা আমি দেব। এভাবে আমার বোম্বাই প্রবাস শেষ হয়।

কথা ছিল শরীর ভাল হলে আমি মাঝে মাঝে বোম্বাই যাব। ভারতীয় বিদ্যাভবনের নতুন যে বাড়ি তৈরী হল তাতে আমার থাকার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট হয়—যাতে বোম্বাই গিয়ে আমি থাকতে পারি। আরও স্থির হল আমি যখন বোম্বাইএ থাকতে পারছি না তখন আমার কাজের কিছু ভার—চিঠিপত্র লেখা, লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি—একজন সহকারীর উপর দেওয়া হবে। এজন্য একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটার নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। ডঃ এ. ডি. পুসলকারকে এই পদে নিয়োগ করা হল। পুসলকার তখন বোম্বাইতে একটি কলেজের লেকচারার ছিলেন। আমি কলকাতায় থাকব, আর তিনি আমার নির্দেশ অনুযায়ী বোম্বাই অফিস থেকে কাজ করবেন। কলকাতায় আমার কেবল একজন টাইপিস্ট থাকবে। মুন্সীজী এসব ব্যবস্থাই করেছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতায় ফিরে এসে এই ইতিহাস লেখার কাজে মনোনিয়োগ করলাম। পূর্বেই বলেছি শচীনদের সঙ্গে যে ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছিলাম নানা কারণে তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হই। সুতরাং এই সময় থেকে আমার প্রধান কাজ ছিল ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রস্তাবিত ইতিহাস লেখা। এই গ্রন্থমালার নাম স্থির হয় *History and Culture of the Indian People.* এই কাজের ভার গ্রহণ করি ১৯৪৫ সনে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি এতে লিপ্ত রয়েছি। ইতিহাসচর্চার দিক থেকে এইটিই আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকব—এমন আশা ছিল—সৌভাগ্যবশতঃ আমার জীবিত কালেই (১৯৭৭) একাদশ খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট দিল্লীতে মহাসমারোহে এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাইর নেতৃত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং আমাকেও সম্বর্ধনা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংকলন করার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ

করেন এবং আমাকে তার সম্পাদক সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে মতানৈক্য হওয়ায় আমি পদত্যাগ করি। দিল্লীর একজন উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি পরে আমাকে বলেছিলেন যে, যখন আমার সঙ্গে ভারত সরকারের মতবিরোধ চলছে তখন মুন্সীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মুন্সীজী তাঁকে বলেছিলেন যে ডঃ মজুমদারকে আমি আমার বইএর সম্পাদক নিযুক্ত করেছি; আজ পর্যন্ত তাঁর মতের বিরুদ্ধে লেখাতে বাধ্য করিনি। আপনারা তাঁকে তাঁর মতের বিরুদ্ধে লেখাতে চান, তিনি যে রাজী হবেন না তা সহজেই বুঝতে পারি, আপনারা লেখার ভার ঐতিহাসিকের উপর ছেড়ে দিন। তাঁর উপর রাজনীতির মতামত চাপাবেন না।

মুন্সীজী যা বলেছিলেন তা যথার্থ। তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। একথাও আমি সংকোচের সঙ্গে বলছি তিনি যদি আমার উপর সব ভার ছেড়ে না দিতেন তাহলে এতদিনে একাদশ খণ্ড বই বেরত না। প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি মুন্সীজীর এই প্রস্তাবের পূর্বে ভারতের পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাস লেখার জন্য আরও দুটি প্রস্তাব হয়েছিল। প্রথম প্রস্তাবটি করেছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই প্রস্তাব অনুসারে মোট কুড়ি খণ্ডে বই শেষ করার কথা ছিল এবং এর সম্পাদক ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল। বারটি খণ্ডে এই ইতিহাস লেখার কথা ছিল। এর পরিকল্পনার ভার ছিল একটি কমিটির উপর; ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন তার সভাপতি। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর চেষ্টায় এর জন্য দু'লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে আজ পর্যন্ত মাত্র দুই খণ্ড বই বেরিয়েছে।

মুন্সীজী আমাকে যখন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন তাকে বললাম যে ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস থেকে এ ধরনের একটি বই প্রকাশ করার প্রস্তাব হয়েছে এবং সে বিষয়ে কিছু কাজও হয়েছে। আপনার ও তাঁদের পরিকল্পনা মিলে যদি কাজ হয় ভাল হয়। কারণ আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লেখকের বড়ই অভাব। দুখানি বই বেরলে একজনকেই হয়তো একই বিষয় দু'বার লিখতে হবে। মুন্সীজী বললেন যে কমিটি করে এ রকম কাজ বেশি এগোবে বলে মনে হয় না। তবে আপনি ওঁদের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতে পারেন। যদি উপযুক্ত কোন প্রস্তাব আপনারা করেন আমি অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব।

হিস্ট্রি কংগ্রেস যে কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন আমি তার সভ্য ছিলাম। মুন্সীজীর পরিকল্পনা এবং সম্ভব হলে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিকল্পনা মিলিয়ে একখানা বই বার করার কথা আমি কমিটির মিটিংএ তুললাম। কমিটির অধিকাংশ সদস্য এবং বিশেষ করে ডঃ তারাচাঁদ আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। তারাচাঁদ বলেছিলেন যে মুন্সীজীর বই তো স্কুলের পাঠ্য বই হবে; আর আমাদের বই হবে scholarly work। মুন্সীজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলেও তাঁরা কিন্তু

রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। স্থির হল রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং হিস্ট্রি কংগ্রেস-এ দুয়ের প্রস্তাব মিলে একটি সিরিজ বেরবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের আদি পরিকল্পনা অনুসারে এই সময় *Vakataka-Gupta Age* নামে এক খণ্ড বই বেরিয়েছিল, ডঃ আলতেকর ও আমার সম্পাদনায়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও হিস্ট্রি কংগ্রেসের মিলিত প্রস্তাবের ফলে যে বই প্রকাশের আয়োজন হয় আজ পর্যন্ত (১৯৭৭ খৃঃ) তার মাত্র দুটি খণ্ড বেরিয়েছে। এর জন্য সংগৃহীত দু'লক্ষ টাকার বেশির ভাগই ব্যয় হয়েছে অফিসের খরচ এবং কর্মচারীদের বেতনে। এই কমিটি অবশ্য এখনও আছে। দু'একটি খণ্ড বই প্রকাশের আয়োজন চলেছে, তবে তা কবে বেরবে বলা কঠিন। এই পরিকল্পনায় যে খণ্ড আমার সম্পাদনায় বেরনোর কথা তা আমি প্রায় পনের বৎসর পূর্বে শেষ করেছি। কিন্তু আজও (১৯৭৭ খৃঃ) তা ছাপা হয়নি। এর কারণ কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই; কারণ তাতে অনেক অপ্রীতিকর কথা বলতে হয়।

ভারতীয় বিদ্যাভবন পরিকল্পিত ইতিহাসের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণের সময় মুন্সীজীর সঙ্গে আমার এই মর্মে কথা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে পড়াশোনা সংক্রান্ত যদি কোন কাজ পাই তা আমি গ্রহণ করতে পারব। অর্থাৎ যদি বিদ্যাভবনের ইতিহাস সম্পাদনায় বিলম্ব বা বিঘ্ন না হয়, তবে এক সঙ্গে দুটি কাজ করলে মুন্সীজীর কোন আপত্তি হবে না। এই রকম যেসব কাজ করেছি তা বলছি।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ

বোম্বাই-প্রবাস শেষে কলকাতায় আসবার কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রী পি. এন. পারিজা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমাকে তিনি বললেন যে সেখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীগোবিন্দ মালব্য (পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র) ভারতীয় ইতিবৃত্তের পঠন পাঠনের জন্য পৃথক একটি বিভাগ খুলতে চান। তাঁর ইচ্ছা আমি যেন এই কলেজের—College of Indology—প্রথম প্রিন্সিপ্যাল রূপে কাজ করে এর গোড়াপত্তন করি।

ভারতীয় বিদ্যাভবনের ইতিহাসের কাজ তখন অনেকটা এগিয়েছে। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরী আছে, কাজেই এ কাজে যোগ দিলে আমার লেখার কাজে কোনরূপ অসুবিধে হবে না মনে হল। মুন্সীজীকে সব লিখলাম, তিনি সম্মতি দিলেন।

১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি কলেজ অফ ইণ্ডোলজির প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। ১৯৫৩ সন পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলাম। এই তিন বৎসর ভারতপ্রসিদ্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অনেক বিষয়ে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক গোলমাল ও হাঙ্গামার কথা কাগজে দেখতে পাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এখানে দু-চারটি কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না—কেন যে আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অবনতি ও দুরবস্থা তার কিছু কারণ হয়তো আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাবে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এক আশ্চর্য কীর্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একজন মানুষ যে এত বড় একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। শহর থেকে তিন চার মাইল দূরে একটি জায়গায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ, ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের বাসস্থান। সমস্ত জায়গাটি ঘিরে যে প্রাচীর আছে তা ঘুরে এলে পাঁচ মাইল হয়। ভিতরে অনেক চওড়া রাস্তা—উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি। ছ সাতটি বিশাল ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের জন্য সত্তর আশিটি বাড়ি। এ ছাড়া ভাইস-চ্যান্সেলার ও অন্য কর্মচারীদের বাড়ি, লাইব্রেরী, অফিস এবং একটি ব্যাঙ্ক আছে। বস্তুতঃ এটি একটি ছোট শহর বললে অত্যুক্তি হয় না।

যতদিন ওখানে ছিলাম দেখতাম অনেক নতুন নতুন বাড়ি ও রাস্তা তৈরী হচ্ছে। প্রথমেই আমার কেমন খটকা লাগল—এত বড় জায়গা এবং এতগুলো বাড়ি, তার দেখাশোনার জন্য একজন অল্প বেতনের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন। যা দেখেছি ও শুনেছি তাতে মনে হয় যে এই ব্যাপারে একটি মস্ত গলদ আছে। অনেকে বলত যে নতুন বাড়ি তৈরী, পুরনো বাড়ি মেরামত, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা এসবের জন্য যে টাকা ব্যয় হয়, অনেক কর্মচারী তার অংশ পান এবং এর মধ্যে ভাইস্-চ্যান্সেলারেরও নাকি অংশ আছে। এ অভিযোগ কতদূর সত্য বলতে পারি না। এখানে বাড়ি তৈরীর ব্যবস্থাও খুবই অদ্ভুত। বাড়ি তৈরী করতে হলে প্রথমে একদল কর্মচারী নিযুক্ত হত। বাড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা মাইনে পেত। বাড়ি তৈরী করত অবশ্য কনট্রাকটার। এই সব কর্মচারীরা বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে কিছুই করত না। স্বভাবতই বাড়ি তৈরী হতে অনেক বেশি সময় লাগত। কারণ তাতে কর্মচারীদের লাভ।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহের জন্য ওখানে যে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বা কোর্ট প্রভৃতি আছে তার সদস্যদের মধ্যে ভীষণ দলাদলি ছিল। আর সে দলাদলি কতকটা জাতি, কতকটা প্রাদেশিক সংকীর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব সমিতির মিটিংএ গেলে মনে হত যে একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক যে আবহাওয়া থাকা দরকার তা এখানে নেই। আরও দেখলাম শিক্ষকদের মধ্যেও তেমন সৌহার্দ্য নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দ্যের কথা পূর্বে বলেছি। এখানে এসে দেখলাম ঠিক তার বিপরীত অবস্থা। শিক্ষকদের একটি ক্লাব আছে, কিন্তু সেখানে খুব কম শিক্ষকই যান। এর একটি কারণ হতে পারে বেনারসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্র এবং শিক্ষকরা এসেছেন। সুতরাং ঢাকার মতো পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বা ঘরোয়া আবহাওয়া থাকা এখানে সম্ভব ছিল না।

সবচেয়ে দুর্বোধ্য হল তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলার গোবিন্দ মালব্যর কূটনীতি। তিনি আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কথা আমার কানে আসতে থাকে। তা পুরেপুরি সত্য না হলেও কতক যে সত্য সন্দেহ নেই। তবে তার প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। গোবিন্দ মালব্যর চক্রান্তের ফলেই ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ওখানে বেশি দিন থাকতে পারেননি এবং একবার শ্যামাপ্রসাদকে যে প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলার করার প্রস্তাব হয়েছিল তাও ব্যর্থ হয়। ভাইস-চ্যান্সেলারের মতো গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবার কোন যোগ্যতাই গোবিন্দ মালব্যের ছিল না। তিনি একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্টরূপে কাজ করতেন—কোন শিক্ষায়তনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। কেবল মাত্র পিতার নামের জোরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল যে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নানা পদে তিনি অযোগ্য লোক নিয়োগ করতে থাকেন। কোর্ট এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে

নিজের দল যাতে ভারী থাকে সেজন্য নানা রকম অসৎ উপায় অবলম্বন করেছেন। এই সব কারণে শিক্ষকদের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ঘোর অসন্তোষ ছিল। ওখানে থাকতে থাকতে বেশ অনুভব করেছিলাম যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের যা অবস্থা তাতে কাজ ভাল চলছে না এবং অল্প কালের মধ্যেই অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াবে। বাস্তবিক হয়েছিলও তাই। ওখানে ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগের পদ্ধতিটি ছিল বড় অদ্ভুত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ শূন্য হলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে তিনজনের নাম পাঠান হত এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তা থেকে একজনকে নির্বাচিত করতেন। গোবিন্দ মালব্য সে সময় লোকসভার সদস্য ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই জন্যেই তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলার হতে পেরেছিলেন। দিল্লী থেকেই তিনি নানা বিষয়ে কলকাঠি চালাতেন।

তিন চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। সর্বত্রই একই অভিজ্ঞতা—উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষ যদি কূটনীতির আশ্রয় নেন, সর্বস্তরেই তার প্রভাব পড়ে। কর্তৃপক্ষ যোগ্য এবং কর্মদক্ষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং পঠন পাঠন—দুইই ভালভাবে চলে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এর নিদর্শন আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। সে কথা বিস্তৃতভাবে আর বলার দরকার নেই।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আর কয়েকটি মাত্র কথা বলব। কলেজ অফ ইণ্ডোলজিতে যোগ দেবার পর আমার দৃষ্টি পড়ল লাইব্রেরীর উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীটি বেশ বড়। ভারতের অনেক লোক—রাজা, মহারাজা, ধনী, বিদ্যোৎসাহী—এই লাইব্রেরীতে অনেক বই দান করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তার একটি ভাল ক্যাটালগ নেই। কারণ অনুসন্ধান করে জানলাম, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহুদিন পর্যন্ত এর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। তিনি লাইব্রেরীর বিষয়ে কিছু জানতেন না। সাধারণভাবে তিনি লেখাপড়াও বিশেষ কিছু জানতেন না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে এই বৃদ্ধ প্রতিদিন গীতা পাঠ করে শোনাতেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ তিনি লাইব্রেরিয়ান হয়েছিলেন। আমার যাওয়ার পূর্বে থেকেই লাইব্রেরীর অব্যবস্থা নিয়ে বেশ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। পরে একজন সহকারী লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন—লাইব্রেরীর বিষয়ে তাঁর অবশ্য বেশ জ্ঞান ছিল।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে ভাইস্-চ্যান্সেলারের ধারণা ছিল পূর্বোক্ত বৃদ্ধের মতোই। তাঁকে বললাম *Epigraphica Indica* লাইব্রেরীতে দেখছি না। এ বই না থাকলে তো প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পঠন পাঠন সম্ভব নয়। আরও বললাম যে এর কয়েকটি খণ্ড এখন বাজারে পাওয়া যায় না—পুরনো কপি বেশি দামে কিনতে হবে। তিনি উত্তরে বললেন—তার দরকার কি—সমস্ত বই টাইপ করে নেব। এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এর বোধ হয় মাসখানেক পরে একদিন লাইব্রেরীতে ঘুরে বই দেখছি, এমন সময় দূরের একটি আলমারীতে দেখলাম *Epigraphica Indica*-র মতো কয়েক খণ্ড বই আছে, আলমারীর সামনে অনেকগুলি চেয়ার, টেবিল, জড়ো করা আছে, কাছে যাওয়ার উপায় নেই। সহকারী লাইব্রেরিয়ানকে বললাম যে ঐ আলমারীর বই দেখতে চাই। তিনি বললেন যে ও সব আলমারীর বই কেউ পড়েন না, সেজন্যে খোলাও হয় না। যাই হোক, কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পর তো টেবিল চেয়ার সব সরান হল। আলমারী খুলে দেখি *Epigraphica Indica*-র পুরো একটি সেট আছে অথচ এটা কেউ জানত না।

কানিংহ্যামের *Archaeological Survey Report*ও একদিন এভাবে খুঁজে পেলাম। সে আলমারীও অনেকদিন বন্ধ ছিল, বইএর পাতার যা অবস্থা, হাত দেওয়া মাত্রই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। ভাইস্-চ্যান্সেলারকে বললাম যে এ সব খুব দামী বই—একবার নষ্ট হলে পাওয়া কষ্টকর, এ সব বই রক্ষার জন্য fumigation ইত্যাদি উন্নত ধরনের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে দরকার। ভাইস-চ্যান্সেলারের সেই একই উত্তর—তার দরকার কি? সব টাইপ করিয়ে রাখব।

আমার বিশেষ বন্ধু দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা পণ্ডিত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর নিজের লাইব্রেরীর সব বই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। শুনেছি স্পষ্ট শর্ত না থাকলেও এই রকম একটা আভাস ছিল যে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবেন। তা অবশ্য হননি। তাঁর বই সবই আছে সেখানে, তবে সে বইএর আলমারীগুলিও চাবি বন্ধ। বইএর কোন তালিকা তখনও তৈরী হয়নি। কি বই আছে না আছে তা কেউ জানে না। এত বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর এমন দুরবস্থার কথা আমি বার বার ভাইস-চ্যান্সেলার এবং কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছি। কিন্তু কোন ফল পাইনি।

এই সব অসুবিধাসত্ত্বেও কলেজ অফ ইণ্ডোলজির কাজ এক রকম ভাল-ভাবেই শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে এর ছাত্রসংখ্যাও বাড়তে থাকে। কিন্তু তাদের পড়াতে আরম্ভ করে অল্প দিনের মধ্যেই দেখলাম যে ইংরাজী ভাষায় তাদের জ্ঞান এতই কম যে তারা এই বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইংরাজী বই বা জার্ণাল পড়ে তার সারবস্তু সংগ্রহ করতে পারে না। একদল ছাত্র আমার কাছে স্পষ্টই স্বীকার করল যে বি. এ. পর্যন্ত তারা হিন্দী ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে এবং পরীক্ষা দিয়েছে; এজন্য ক্লাসে আমার ইংরাজীতে বক্তৃতা তারা ভাল বুঝতে পারে না। এ শুনে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে বিভিন্ন জার্ণালের যে-সব প্রবন্ধ তাদের পড়তে বলি, তা হয় তারা আদৌ পড়ে না, কিম্বা হয়তো পড়লেও ভাল বুঝতে পারে না। মনে হয়, প্রধানত এই কারণেই ঐ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ ভাল হয়নি। এই কথাটি আমি বিশেষভাবে লিখে রাখতে চাই। কারণ হিন্দী রাষ্ট্রভাষায়

পরিণত হয়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি এই ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে পরিণত হয় তাহলে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার আশানুরূপ উন্নতি করা কোনমতেই সম্ভব নয়—এই কথাটি বিশেষভাবে আজকাল সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য মনে করি।

বহির্ভারতে যে হিন্দু সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হয়েছিল তার ঐতিহাসিক বিবরণ আমি কলেজ অফ ইণ্ডোলজির পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করি। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে জার্ণাল তো দূরের কথা, এ বিষয়ে কোন বইও ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য এ ধরনের বই কিভাবে প্যারিস থেকে কিনেছিলাম সে কথা পূর্বে বলেছি। শুনেছিলাম, দেশবিভাগের পর ঢাকায় আর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চা তেমন হয় না। সেজন্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে ঐসব বই ও জার্ণাল তাঁদের কেনা দামের দ্বিগুণ টাকায় কেনবার প্রস্তাব করলাম। পূর্বেই বলেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। বেনারসে আমার চাকরির অল্পকালের মধ্যে ভাল লাইব্রেরী গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

আমার আর একটি প্রস্তাব ছিল এই কলেজের সঙ্গে একটি মিউজিয়াম স্থাপন করা। ভাইস-চ্যান্সেলারকে সেকথা অনেকবার বলেছিলাম। আমার বেনারস থেকে চলে আসার কয়েক মাস আগে তিনি দিল্লী থেকে চিঠি লিখে জানালেন যে কাশী শহরে কলাভবন নামে একটি বড় মিউজিয়াম আছে, তার অধ্যক্ষ সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিক্রি করতে চান। এটি কিনলে আমাদের কাজ হবে কিনা এবং এর জন্য কত মূল্য দেওয়া যেতে পারে—সেকথাও জিজ্ঞাসা করলেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁকে জানালাম যে, কেনার কথাবার্তা আরম্ভ করার আগে আমি একবার ঐ কলাভবনে কি কি জিনিস আছে তা ক্যাটালগ মিলিয়ে দেখতে চাই।

ঐ কলাভবনটি আসলে একজন লোকই চালাতেন এবং তিনি ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলারের বিশেষ বন্ধু। আমার চিঠি পেয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যক্ষকে লিখলেন এবং তিনি একটি দিন স্থির করে আমাকে সেখানে যেতে লিখলেন। সেদিন গেলে সব জিনিস দেখার সুবিধা হবে—এমন ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তবে একথাও তিনি লিখলেন যে এই কলাভবনের কোন ক্যাটালগ নেই।

নির্দিষ্ট দিনে দুজন সহযোগী শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে কলাভবনে হাজির হলাম। দেখি বাড়ি তালাবন্ধ ; সেখানে কেউ নেই। ফিরে এসে ভাইস-চ্যান্সেলারকে সব কথা জানালাম।

এর অল্প পরেই কোন এক ছুটিতে—গ্রীষ্ম কিম্বা পূজার—কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলাম। ফিরে গিয়ে শুনলাম যে, কলাভবনের সমস্ত জিনিস ইতিমধ্যে কেনা হয়ে গেছে এবং তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বেশ মোটা

টাকা দিতে হয়েছে। অথচ কি কি জিনিস কেনা হয়েছে, তার কোন তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে খোঁজ করেও পাওয়া গেল না। সমস্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমার কেমন সন্দেহ হল যে, কলাভবনের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ নিজেদের কিছু আর্থিক লাভের জন্যই এই ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন। আমার এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল যখন কিছুদিন পরে জানা গেল যে কলাভবনের অনেক হাজার টাকা দেনা আছে এবং কেনার শর্ত অনুসারে সে-টাকা এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে। আমি এই ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করলাম এবং মিউজিয়ামের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কমিটি গঠিত হয় তার সভায় অনেক অপ্রীতিকর প্রশ্নও তুললাম। এর একটা দৃষ্টান্ত এখনও মনে আছে। কোন এক জার্ণালে বেরিয়েছিল যে, কলাভবনে কয়েকটি বিশেষ দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা আছে। কিন্তু কলাভবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জিনিস পাঠান হয়েছিল তার মধ্যে সেগুলির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এই নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারের সঙ্গে আমার বেশ মনোমালিন্য হয় এবং বোধ হয় অনেকটা এই কারণেই কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরি অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায়। আমি প্রথমে দু'বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলার আমাকে বলেছিলেন যে, আমার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে এর পরেও আরও কয়েক বছর থাকতে পারব। কিন্তু দু' বছর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চাকরি শেষ হল।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান হলেও এর কার্যপ্রণালী দেখে আমি কিন্তু আদৌ খুশী হতে পারিনি। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মন্দির তৈরী করা হয় এবং ঢাকার আনন্দময়ী মা— যিনি তখন কাশীতে ছিলেন—তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে যাগযজ্ঞ করে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইরূপ অর্থব্যয় আরও অনেক হয়েছে এবং অনেকেই তা অনুমোদন করেননি।

এর আর-একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসচর্চার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরেই ভাইস-চ্যান্সেলার আমাকে বললেন যে ডঃ প্রাণনাথ নামে একজন বড় পণ্ডিত মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত সীলগুলির অক্ষর পাঠ সম্বন্ধে অনেক দূর সফল হয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি একটি বড় গ্রন্থও রচনা করেছেন। ভাইস-চ্যান্সেলার প্রস্তাব করলেন, তাঁর এই বিভাগ কলেজ অফ ইন্ডোলজির অন্তর্ভুক্ত করা হোক। খবর নিয়ে জানালাম যে, ডঃ প্রাণনাথ মাসিক ছ-সাতশ টাকা মাইনে পান এবং তাঁর জন্য একজন ফটোগ্রাফার, আর্টিস্ট, টাইপিস্ট প্রভৃতি পুষতে হচ্ছে। আমার মনে হল তাঁর তথাকথিত গবেষণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁর কতকগুলি সিদ্ধান্ত শুনে ভাইস-চ্যান্সেলার খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন; যেমন—হিন্দী ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা; তা থেকেই সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি। ভাইস-চ্যান্সেলার বললেন যে, প্রায় আট-দশ বছর বহু ব্যয় করে এই যে গবেষণা

হয়েছে, কলেজ অফ ইণ্ডোলজির অন্তর্ভুক্ত না হলে তার কোন সার্থকতা থাকবে না। আমি তাঁকে বললাম যে, এই গবেষণার কোন মূল্য আছে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুনে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন। ডঃ প্রাণনাথের উচ্চ প্রশংসা করে বললেন যে, তিনি বিলেতের ডক্টরেট; নিঃসন্দেহে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁকে বললাম যে, তিনি ইকনমিকসের বই লিখে ডক্টরেট হয়েছেন; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান আছে এমন কোন প্রমাণ নেই। আর, যে গবেষণার বিষয়ে তিনি এত বড়াই করছেন, সে বিষয়েও তো কোথাও কিছু তিনি প্রকাশ করেননি। তার জবাবে প্রাণনাথ ভাইস-চ্যান্সেলারকে জানালেন যে, জার্ণালে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলে অন্য অনেকে তাঁর আবিষ্কারের কথা জেনে ফেলবে। এইজন্য তিনি একেবারে বই প্রকাশ করতে চান এবং ভাইস-চ্যান্সেলারও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই বই ছাপানর জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ডঃ প্রাণনাথ বলেছিলেন যে, হায়ারোগ্লিফিক প্রভৃতি সব দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপি তিনি পড়তে পারেন এবং তার সাহায্যেই তিনি মহেঞ্জোদাড়ো লিপি পড়তে সক্ষম হয়েছেন। তখন আমি প্রস্তাব করলাম যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন লিপি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যে কয়েকজন পণ্ডিত ইয়োরোপে ও আমেরিকায় আছেন তাঁদের দু-একজনের কাছে এই বই পাঠান হোক; তাঁরা অনুমোদন করলে এ বই ছাপান হবে এবং তখন কলেজ অফ ইণ্ডোলজিতে তাঁকে আমি গ্রহণ করতে রাজী আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার ডঃ পারিজা আমার প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলারও তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ডাঃ প্রাণনাথের কাছে এই প্রস্তাব পাঠান হলে তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে যে বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে বই পাঠালে তারা চুরি করে আগেই বই লিখে ফেলবে। এই উক্তি এত হাস্যকর যে আমি ও ডঃ পারিজা এ বিষয়ে আর কোন কথা বললাম না। ভাইস-চ্যান্সেলারও চুপ করে গেলেন। কিন্তু ডঃ প্রাণনাথের ডিপার্টমেণ্ট যথারীতি চালু থাকল; বছরে বছরে তার জন্যে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হত। আমার চলে আসার পরেও এ ডিপার্টমেণ্ট বজায় ছিল। তার ফলে আমাদের যে কোনরকম জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে, তার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাইনি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কাশীতে থাকার সময় ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের এক অধিবেশনে একজন সন্ন্যাসী ধরনের ব্যক্তি জানালেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বর্ণিত সূত্র অবলম্বন করে সমস্ত প্রাচীন লিপি তিনি পড়তে পারেন এবং মহেঞ্জোদাড়ো লিপিরও পাঠোদ্ধার তিনি করেছেন। প্রথম প্রথম তাঁর এই কথা কেউ বড় তেমন গ্রাহ্য করত না। কিন্তু দু-তিন বছর ধরে ঐ সন্ন্যাসী হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে একই কথা বলতে থাকেন এবং এ কাজে তাঁকে সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। তখন হিস্ট্রি কংগ্রেসের তরফ

থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়; স্থির হয় তাঁর কাছ থেকে সব শুনে কমিটি মতামত জানাবেন। আমি ছিলাম ঐ কমিটির সভাপতি। কলকাতায় আমার বাড়িতে তাঁকে একদিন আমন্ত্রণ করে এনে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। তিনি যখন দাবি করলেন যে তন্ত্রের প্রণালী জানা থাকলে যে কোন লিপির পাঠ উদ্ধার করা যেতে পারে, তখন আমি তাঁকে অনতিকাল পূর্বে আবিষ্কৃত একটি হিটাইট লিপি দিয়ে সেটি পাঠ করতে বললাম। ঐ লিপি কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইউরোপের কোন কোন পণ্ডিত তা পড়তে পারেন—সে-সব কথা কিছুই তাঁকে বললাম না। মুখে তিনি যতই আস্ফালন করুন, কার্যকালে দেখা গেল এক বর্ণও তিনি পাঠ করতে পারলেন না। আমার মতামতই কমিটি গ্রহণ করে এবং হিস্ট্রি কংগ্রেসেও এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা হল না।

এর কয়েক বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে এক চিঠি পাই। ঐ চিঠিতে জানলাম যে, সেই সন্ন্যাসী ধরনের ব্যক্তি সরকারের কাছে কয়েক হাজার টাকা সাহায্য চেয়েছেন তাঁর এই অমূল্য আবিষ্কার জনসাধারণের গোচরে আনার জন্যে। সেক্রেটারী লিখেছিলেন যে, সরকার এই রকম একটি আশ্চর্য আবিষ্কারের সহায়তা করতে ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু তার পূর্বে এর প্রকৃত মূল্য জানার জন্যে সরকাব আমার মতামত জানতে চান। এই চিঠি পেয়ে সরকারকে পূর্বের কথা সবই জানালাম।

তারপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে কিছু করেছিলেন কিনা জানি না। ঐ সন্ন্যাসী দু-একটি বই লিখেছিলেন; আমাকেও তার কপি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা পড়ে আমার পূর্ব মত পরিবর্তনের কোন কারণ দেখতে পাইনি। এই প্রসঙ্গে আরও বলতে পারি, আসাম থেকে এক ভদ্রলোকও মহেঞ্জোদাড়ো লিপি পাঠ করে এক বই লিখেছেন। তারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমি দেখতে পাইনি। এরূপ আরও অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু এই প্রসঙ্গের এখানেই শেষ করলাম।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবার সময় আমি একবার ফ্লোরেন্সে UNESCO-র এক অধিবেশনে ভারত সরকারের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন প্রতিনিধি দলের নেতা এবং ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন এর অন্যতম সদস্য। এই উপলক্ষে ইটালির অনেক জায়গায় পুরাতত্ত্বের প্রাচীন নিদর্শন দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; এবং UNESCO-র মিটিং শেষ করে ইউরোপের অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছিলাম।

এই মিটিং-এর একটি কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি লিখছি। UNESCO-র প্রত্যেক অধিবেশনেই বিভিন্ন দেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের নিজ নিজ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াবার রীতি আছে। গ্রীস, ইটালি, জার্মানী এবং আরও দু-একটি দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। শুনলাম যে, ভারতীয়

প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ডঃ তারাচাঁদ এই বক্তৃতা দেবেন। আলোচ্য বিষয় হল— ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব। আমি স্যার রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা করে বললাম যে, আর সব দেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের দেশের গৌরবের কথাই একান্তভাবে বিশ্বের দরবারে উত্থাপন করেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধির পক্ষে ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা আমি পছন্দ করি না। লোকে ভাববে, হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয়দের বলবার কিছু নেই ; এতে আমাদের দেশের অসম্মান হবে। আমার যুক্তি তিনি মেনে নিলেন। বললেন যে যদিও ঠিক হয়ে গেছে তবু এখন কি করা যায় দেখছি। তিনি কি করেছিলেন জানি না ; কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল ডঃ তারাচাঁদের বক্তৃতা আর হল না। ডঃ তারাচাঁদ কি ভাবে যেন খবর পেয়ে আমার উপর খুবই রুষ্ট হন। নানাভাবে সে ক্রোধ পরে তিনি প্রকাশ করেছেন ; সে কথা যথাস্থানে বলব। সেই ঘটনার পর অনেক বছর পার হয়েছে, আজও আমার ধারণা সেদিন আমি যে কারণে প্রতিবাদ করেছিলাম তা খুবই সঙ্গত ছিল। ডঃ তারাচাঁদের বক্তৃতা বন্ধ হওয়ায় ভারতের পক্ষে ভালই হয়েছিল বলতে হবে।

কাশীতে থাকবার সময়ে আমি International Commission for a History of the Scientific and Cultural Development of Mankind-এর সদস্য নির্বাচিত হই। এটি UNESCO-রই একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রধান কার্যালয় হচ্ছে প্যারিসে। এর উদ্যোগে মানবজাতির ইতিহাস (*History of the Scientific and Cultural Developments of Mankind*) ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। যে-সব দেশ UNO ও UNESCO-ও সভ্য তালিকাভুক্ত তাদের সরকারের কাছে এই কমিশনের সদস্য হওয়ার উপযোগী ব্যক্তিদের নামের তালিকা চাওয়া হয় এবং তদনুসারে সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ভারত সরকারের মত অনুসারে ডঃ হোমি ভাবা এই কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এর অধিবেশনে তেমন বড় একটা যোগ দিতে পারতেন না। একবার আমাকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে যেতে লিখেছিলেন ; নানা কারণে এই অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।

আমি যখন কাশীতে ছিলাম সে সময় এই ইতিহাসের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক টার্ণার (Turner) ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়ান। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি আসেন আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং দু-তিন দিন ঐ ইতিহাস সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। এর কয়েক মাস পরে হঠাৎ প্যারিস থেকে একটি চিঠি পাই, তাতে জানতে পারি যে, আমি ঐ International Commission-এর সদস্য মনোনীত হয়েছি। সরকারী তরফ থেকে মনোনীত সদস্য ছিলেন ডঃ ভাবা, আর কমিশনের পক্ষ থেকে সরাসরি আমাকে মনোনীত করা হয়। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়, সেকথা বিস্তারিত ভাবে বলছি।

আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে UNESCO কর্তৃক প্রকাশিত পূর্বোক্ত মানবজাতির ইতিহাসে প্রাচীন আর্যজাতি সম্বন্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকের অনেক পত্রবিনিময় হয়; এবং এই বিষয়টি নিয়ে এই International Commission-এর প্রকাশ্য অধিবেশনেও আলোচনা হয়। তার ফলে এই গ্রন্থের অংশবিশেষের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে; সেকথা পরে বলব।

UNESCO-র এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের দেশেও ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে সুতীব্র সমালোচনা হয়। দিল্লীতে লোকসভার কয়েকজন সদস্য এই বিষয়ে সরকারকে প্রশ্ন করেন এবং তার উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা বলেন যে, ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। প্রথমত, আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এই কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইনি। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সুযোগ থাকা সত্বেও এবং বিষয়টি আমার দ্বারা ভারত সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনা সত্বেও সরকার কিছুই করেননি। লোকসভায় মিঃ চাগলার আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবরণ প্রকাশিত হবার পর আমি প্রকৃত ঘটনা Statesman পত্রিকায় এক চিঠিতে বিবৃত করি। এই চিঠিতে জনাব হুমায়ুন কবীরের প্রতি কিছু দোষারোপ ছিল। এই চিঠির প্রত্যুত্তরে হুমায়ুন কবীর Statesman পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করেন; এবং আমিও তার উত্তর দিই। এ ছাড়া আরও কয়েকজন পত্রলেখক সরকারের উপর দোষারোপ করেন; ফলে এ নিয়ে দেশে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আমি যেসব অভিযোগ এনেছিলাম, তার কোন সদুত্তর না পাওয়ায় পত্রলেখকেরা অনেকেই বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। বিষয়টি খুবই গুরুতর। কারণ UNESCO-প্রকাশিত এই গ্রন্থ বহুকাল পর্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ বলে জগতের সর্বত্র বিবেচিত হবে এবং আর্যেরা যে বর্বর অসভ্য ছিলেন, উক্ত গ্রন্থে লিখিত এই উক্তি দেশে দেশে প্রচারিত হবে। মনে হয়, আমার মৃত্যুর পর এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেশের লোকে জানবে না; সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ লিখে রাখা সঙ্গত মনে করি।

১৯৪৭ সালে মেক্সিকো শহরে UNESCO-র সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মানবজাতির সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক ধারণার ক্রমবিকাশ ও উন্নতির সম্বন্ধে একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা আবশ্যক। এই প্রস্তাবের ফলে ১৯৫০ সালে UNESCO-র সাধারণ অধিবেশনে এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission) গঠিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ব্রাজিল-নিবাসী Professor Paulo E. De Berredo Carneiro এবং এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী (Editorial Committee)

গঠিত হয়। এই মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন আমেরিকার Professor Ralph E. Turner। এর একমাত্র ভারতীয় সভ্য ছিলেন Professor J. H. Bhaba। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি Professor Turner ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। নানা স্থান ঘুরে তিনি কাশীতে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার তিন-চারদিন দেখাসাক্ষাৎ এবং এই ইতিহাস সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। সম্ভবতঃ এর ফলেই এবং অধ্যাপক ভাবার সভায় অনুপস্থিতির কারণেই উক্ত International Commission সরাসরি আমাকে ঐ সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য মনোনীত করে একটি চিঠি লেখেন। আমি এই পদ গ্রহণ করি এবং ১৯৫৩ সালে এর সদস্য নিযুক্ত হই। দু-তিন বৎসর পরে আমাকে এই সম্পাদকমণ্ডলীর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং আমি শেষ পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলাম। বহুদিন যাবৎ প্রতি বছরে এর দু-একটি অধিবেশনে যোগ দিয়েছি। শেষ কয়েক বছর বার্ধক্যবশতঃ নানা কারণে আমার যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি যখন এই সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হই এবং কমিশনের অধিবেশনে প্রথম যোগ দিই, তার পূর্বেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় স্থির করা হয়েছিল। সাধারণভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, এই গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হবে এবং প্রতি খণ্ডে কোন সময় থেকে শুরু করে কোন সময় পর্যন্ত ইতিহাসের আলোচনা থাকবে তাও স্থির হয়েছিল। প্রতি খণ্ডের জন্য একজন সম্পাদক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য প্রয়োজন হলে দু-একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হবেন, এই ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন খণ্ডের সম্পাদক তখন স্থির হয়ে গেছে এবং গ্রন্থ লেখার কাজও আরম্ভ হয়েছে। কমিশনের অধিবেশনে প্রথম যোগ দিয়েই আমি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে বলি যে, আমার মতে এই কার্যপ্রণালী খুব সঙ্গত হয়নি; কারণ প্রতি খণ্ডেই পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল সভ্যতার ইতিহাস থাকবে; বিভিন্ন খণ্ডের যাঁরা সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ইউরোপ বা আমেরিকার অধিবাসী; তাঁদের সকলেরই ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি এশিয়ার প্রাচীন দেশের ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান আছে, এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সভাপতি মহাশয় বললেন যে, এখন আর এই প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তখন আমি তাঁদের বলি যে, ভারতের পক্ষ থেকে আমার একটা প্রস্তাব হল এই যে অন্ততঃ দু-তিন জন ভারতীয়কে এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে যুক্ত করা হোক। তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং বললেন, আমি যখন ভারতের প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক তখন ভারতের বর্তমান যুগের ইতিহাস-অভিজ্ঞ দু-জন ব্যক্তিকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হোক। এই প্রস্তাবে আমি রাজী হওয়ায় অধ্যাপক কে. জ্যাকারিয়া (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক) এবং ডঃ কে. এম. পানিক্কর এই দুইজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। যতদূর মনে পড়ে, অধ্যাপক জ্যাকারিয়া তখন লণ্ডনে থাকতেন, এবং তিনি এক বছর এই পদে

নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই লিখতে পারেননি; পরে তিনি নিজের অক্ষমতা জানিয়ে পদত্যাগ করেন। ডঃ পানিক্কর পূর্বে অধ্যাপক ছিলেন, পরে তিনি চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে তাঁর অনেক মূলবান রচনা স্থান পেয়েছে এবং এই খণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা-কিছু লেখা হয়েছে, তিনি তা বিশেষ যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে মতামত দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি যে, এই ছয়খণ্ড গ্রন্থের ছয়জন সম্পাদকই ছিলেন ইউরোপীয় বা আমেরিকান এবং সকল দেশের প্রতিনিধি নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এই ত্রুটি সংশোধন এবং যাতে প্রত্যেক দেশের লোকেই নিজ দেশের ইতিহাস ঠিকভাবে লেখা হল কি না তা দেখা এবং প্রয়োজন হলে তা পরীক্ষা করা এবং আপত্তি করার সুযোগ পান, সেজন্য এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হল যে এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের রচনা সম্পূর্ণ হলেই তা সাইক্লোস্টাইল করে UNESCO-র সদস্যভুক্ত প্রত্যেক দেশের কাছে পাঠান হবে। এই কথা জানিয়ে প্রতিটি দেশকে অনুরোধ করা হল যে, তাঁরা যেন এই বিষয়ে একটি ন্যাশন্যাল কমিটি গঠন করেন, যাঁরা প্রতি খণ্ডের খসড়া পড়ে আপত্তিকর কিছু থাকলে তা কমিশনকে জানাবেন। কমিশন এই সব আপত্তি আলোচনা করে প্রত্যেক খণ্ডের যে পরিবর্তন দরকার মনে করবেন তা করবেন। এই নিয়মটি এই প্রকাশনের একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ প্রত্যেক দেশের অনুমোদনক্রমেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এ কথা বলা চলে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারত সরকার এই নির্দেশ অনুযায়ী একটি ন্যাশন্যাল কমিটি গঠন করেছিলেন; কিন্তু আমাকে তার সদস্যভুক্ত করা হয়নি। যতদূর জানি, বাংলা দেশের প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; এবং এই ন্যাশনাল কমিটিতে এই গ্রন্থের কোনও খণ্ড সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি অন্ততঃ কোন মতামত পাঠান হয়নি। অপর পক্ষে রাশিয়ার যে ন্যাশন্যাল কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটি থেকে কেবলমাত্র ষষ্ঠ খণ্ডের সমালোচনা যা কমিশন পেয়েছিলেন তা প্রায় ছ-সাতশত পৃষ্ঠা হবে। এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে এই গ্রন্থের প্রকাশন-প্রণালী সম্বন্ধে পাঠকেরা একটি সাধারণ ধারণা করতে পারবেন। অতঃপর ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে বিতর্ক এবং গোলমাল হয়, তারই বিবরণ দিচ্ছি।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দুইভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম খণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে খৃষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দী পর্যন্ত মানবজাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিবরণ ছিল। এই দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক ছিলেন Sir Leonard Woolley। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পুরাতত্ত্ববিদ। অনেক বৎসর পূর্বে ভারতের ব্রিটিশ সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে তাঁকে ভারতের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগের কাজ যথাযথ নির্বাহ হচ্ছে

কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আনিয়েছিলেন এবং তিনি এ সম্বন্ধে একটি বৃহৎ রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর লেখা প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ কমিশনের সহকারী সভাপতিরূপে আমার কাছে যথারীতি পাঠান হয়। স্যার উলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা পড়ে কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম। তাঁর বিবরণ ইতিহাসের বিকৃতিমাত্র। তিনি বেদ সম্বন্ধে কিছুই লেখেননি। কারণ তাঁর ধারণা বেদ খৃষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীর পরের লেখা এবং তার মধ্যে উন্নত সভ্যতার কোন পরিচয় নেই। তাঁর মতে আর্যরা ছিল বর্বর জাতি এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর অধিবাসীদের সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল এবং আর্যরা এই দুই জাতির সভ্যতা বলপূর্বক ধ্বংস করে জগতের ইতিহাসে কুকীর্তি রেখে গেছে—এইরূপ অনেক কথা সেই গ্রন্থে ছিল। আমি এই সম্বন্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ করে সভাপতি ও প্রধান সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখি এবং পরের অধিবেশনে যোগ দিয়ে এই প্রশ্ন তুলি। অধিকাংশ সভ্য এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে স্যার লিওনার্ড উলির মতো একজন বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ যা লিখেছেন তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। কিন্তু সভাপতি মহাশয় (পূর্বোক্ত Carneiro) বললেন যে, আমি যখন এ রকম গুরুতর আপত্তি তুলেছি তখন তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। তিনি সব আপত্তিকর মন্তব্য স্যার লিওনার্ড উলির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর ফলে স্যার উলি এবং আমার মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হল। কিন্তু স্যার উলি তাঁর মতের বিশেষ কোন পরিবর্তন করলেন না; কেবল আর্যরা বর্বর ছিল—এই ‘বর্বর’ শব্দের বদলে ‘semi-barbarous’ শব্দটি ব্যবহার করলেন। আরও দু-একটি বিষয়েও সামান্য বদল করলেন। আমার অবশ্য তা পর্যাপ্ত সংশোধন বলে মনে হল না। তখন আমি সভাপতি মহাশয়কে জানালাম যে, আর্যদের সম্বন্ধে যা মন্তব্য করা হয়েছে তাতে ভারতবর্ষে খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। আমি প্রস্তাব করলাম, ভারতবর্ষের কোন পণ্ডিতের কাছে এইসব মতামত ও আপত্তি বিচারবিবেচনা করে দেখবার জন্যে পাঠান হোক। এই প্রসঙ্গে আমি বোম্বাই-এর অধ্যাপক শ্রীভি. এম. আপ্তের নাম উল্লেখ করি। আমার এই প্রস্তাব কমিশন মেনে নিলেন।

শ্রীআপ্তে স্যার উলির মতের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর তের পৃষ্ঠা টাইপ-করা চিঠিতে তিনি স্যার উলির প্রায় প্রত্যেকটি মতামত খণ্ডন করলেন এবং ঋগ্বেদ যে খৃষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হয়েছিল, তার অনেক প্রমাণ উল্লেখ করলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ “ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ যিনি পাঠ করেছেন তাঁর যে প্রাচীন আর্যজাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা কি করে হতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।” তিনি স্যার উলির নিকট আবেদন করলেন যেন তিনি ঋগ্বেদ যুগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি পরিচয় দেন।

ইতিমধ্যে আমিও ঐ কমিশন-প্রতিষ্ঠিত Journal of World History

নামক পত্রিকায় "*The Antiquity and Importance of Rigveda*" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। এটির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় Vol. VI, part II, pp. 215-22)। কোন বিষয়ে বিভিন্ন মতামত জানবার প্রয়োজন হলে সম্পাদক যাতে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁদের রচনা বা আলোচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই কমিশন এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রচনালেখকদের কিছু সম্মানদক্ষিণা দেবার ব্যবস্থাও ছিল।

ঋগ্বেদ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দেওয়ার এই পত্রিকায় ফরাসী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করি। পরে আমার লেখা মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি Bhandarkar Instituteএর জার্ণালে (*Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol. XL. pp. 1-15—*Rigvedic Civilisation in the light of Archaeology*) প্রকাশ করি।

এই সব বাদানুবাদের ফলে বিশেষ কোন সুফল হয়নি। তবে মুদ্রিত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ের শেষে আমার মতামত, স্যার লিওনার্ড উলির প্রত্যুত্তর, এবং সবশেষে সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্য প্রকাশিত হযেছে (*History of the Scientific and Cultural Development of Mankind* Vol I, pp. 405-07 and 411, 412—footnotes 37 and 43)।

যখন স্যার উলির সঙ্গে আমার এই বাদানুবাদ চলছিল, তখন একবার দিল্লীতে জনাব হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। আমি স্যার উলির মতামতের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, ভারতবর্ষে যে ন্যাশনাল কমিটি আছে তার পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। উত্তরে তিনি বলেন যে, ন্যাশনাল কমিটির এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি বললাম যে, ন্যাশনাল কমিটি তো এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল যাতে প্রত্যেক দেশের মতামত সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে জানানো যায়। এই কথা বলার ফলে কিম্বা আর যে কোন কারণেই হোক অল্পদিন পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। এই চিঠিতে তাঁরা লেখেন যে, ভারতের ন্যাশনাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হয়ে উঠছে না ; এবং এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি তখন কয়েকজন এদেশীয় পণ্ডিতের নাম পাঠিয়ে বললাম যে, এঁদের মতামত সংগ্রহ করে সেগুলি প্যারিসে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পাঠানো হোক। পরে জেনেছিলাম যে এটি করা হয়েছিল ; কিন্তু তা করতে এত দেরী হয়েছিল যে সম্ভবত তখন বই ছাপা হয়ে গিয়েছিল বলেই এই প্রতিবাদের কোন ফল হয়নি।

আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের ন্যাশনাল কমিটি থেকে সময়মত প্রতিবাদ পাঠান হলে নিশ্চয়ই কাজ হত। আমার মতামত ব্যক্তিবিশেষের মতামত। তার চেয়ে

একটি দেশের মতামতকে সম্পাদকমণ্ডলী অবশ্যই বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমার ব্যক্তিগত মতামতের মর্যাদা রাখবার জন্যে যখন তাঁরা সেটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন তাঁরা ভারতবর্ষের ন্যাশনাল কমিটির মতামতের নিশ্চয়ই বেশি মূল্য দিতেন।

যাই হোক, ব্যাপারটি এখানেই শেষ হল না। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর এ নিয়ে Statesman পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হল এবং দিল্লীর লোকসভার একজন সদস্যও এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার উত্তরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মিঃ এম. সি. চাগলা বলেন যে, ভারত সরকার আমার মারফৎ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ আমার প্রতিবাদ আমি কমিশনের সহকারী সভাপতি হিসাবে সম্পাদকমণ্ডলীকে জানিয়েছিলাম। তারপর স্যার উলির সঙ্গে আমার যে বাদ-প্রতিবাদ হয়, তার সঙ্গে ভারত সরকারের কোন সম্পর্কই নেই।

পূর্বেই বলেছি যে, মিঃ চাগলা একবার বলেছিলেন যে আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি। তাও সত্য নয়। তাঁদের প্রতিনিধি ছিলেন অধ্যাপক জে. এইচ. ভাবা।

এই বিষয়ে আমি Statesman কাগজে একটি চিঠি লিখে যথাযথ ঘটনা বিবৃত করি (১৩ মে, ১৯৬৬)। সেই চিঠিতে জনাব হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আমার ন্যাশনাল কমিটির বিষয়ে যে-কথা হয়েছিল এবং তিনি যা বলেছিলেন সে-সবই উল্লেখ করি। তার উত্তরে হুমায়ুন কবীর লেখেন যে, এ বিষয়ে তাঁর প্রতি আমি যে দোষারোপ করেছি তা পড়ে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। এ বিষয়টি তাঁর দপ্তরের নয়। অর্থাৎ প্রথমে সেটি শিক্ষা বিভাগের অধীনে ছিল; সে সময় শিক্ষা বিভাগ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—একটি শিক্ষা (Education), অন্যটি সংস্কৃতি (Cultural Affairs)। এই ন্যাশনাল কমিটি যে ভাগে ছিল, তিনি তখন তার মন্ত্রী ছিলেন না; একথা সত্য হলেও আমি যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তখন তিনি আমাকে বলতে পারতেন যে এটা তাঁর দপ্তরের বিষয় নয়; এবং বিষয়টির গুরুত্ববোধে তিনি সহযোগী মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন এবং আমিও তাহলে তখনই এর গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি তাঁর সহযোগী মন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আনতে পারতাম। তিনি আমাকে যে বলেছিলেন ন্যাশনাল কমিটির এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই—একথা তাঁর নাকি মনে নেই। তিনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ আমি এই উত্তরে খুবই আশ্চর্য বোধ করেছিলাম এবং নিরাশ হয়েছিলাম। তাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি এখনও মনে করি যে, এই রকম একটি গুরুতর বিষয়ে তিনি যে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন তা একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও মন্ত্রীর পক্ষে খুবই অসঙ্গত।

স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস ঃ অন্যান্য ঐতিহাসিক গবেষণা

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবার সময় আমার জীবনে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে ; একে একে তারই উল্লেখ করছি। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা হল, এই সময়ে আমি ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজে প্রবৃত্ত হই। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে এবং আমার জীবনের এটি অন্যতম বৃহৎ ঘটনা। সুতরাং এর সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বলা আবশ্যক মনে করি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য বাংলাদেশে যে প্রবল আন্দোলন হয় তার প্রায় সবটাই আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যখন এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হই। বরিশালের প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তিনি এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন না তথাপি তিনি প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের এক অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তাদের সদুপদেশ দিতেন। বরিশালের জনসাধারণের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। গ্রামের অনেক লোক তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করত ; গাছের নতুন সব্জী বা ফল তাঁকে উপহার না দিয়ে নিজেরা ভোগ করত না। এই কারণে অশ্বিনীবাবুর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন বরিশালে যেরূপ ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয় এবং সফলতা লাভ করে বাংলাদেশের অন্যত্র বোধ হয় সেরকম হয়নি। পরবর্তী কালে আমি সরকারী কাগজপত্রে অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে স্থানীয় কর্মচারীদের বহু মন্তব্য পাঠ করেছি। তাঁরা অশ্বিনীবাবুকে নেতা হিসাবে ভীষণ ভয় করতেন এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত প্রতিপত্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। বরিশালে এই আন্দোলন যে খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল অশ্বিনীবাবুর নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তি। আমার মনে আছে যেদিন বঙ্গভঙ্গের আদেশ সরকারী ভাবে জারী হল সেদিন কলেজের সমস্ত ছাত্র মিলে আমরা খালি পায়ে কালো পতাকা হাতে নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করি। এরপর বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সময়েও বরিশালে অনেক ব্যাপার ঘটে।

অশ্বিনীবাবু এবং আমাদের কলেজের আর একজন অধ্যাপককে সরকার পরে deport অর্থাৎ অন্তরীণ করেছিলেন। বরিশালে এঁদের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে একটা গভীর আগ্রহ ও উচ্চ ধারণা আমার মনে জাগে। তারপর

যখন বরিশালে আমার ক্রমাগত অসুখ হতে থাকে তখন বরিশাল ত্যাগ করে কলকাতায় এলাম। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা। তিনি তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। কেবলমাত্র তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাব এজন্যই কলকাতার অন্য কোন কলেজে না গিয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হলাম। সেই সময় গোলদিঘিতে প্রায়ই সভা হত। সেসব সভায় উদ্দীপনাময় বক্তৃতার কথা এখনও মনে আছে। তারপর ছাত্রাবস্থায় বরাবরই আমি কলকাতায় ছিলাম। সুতরাং সমগ্র স্বদেশী আন্দোলনটি আমি ছাত্রাবস্থায় বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি। এর পরে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে ঢাকায় এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও গতি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। যখন বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হল তখন অনেক বিপ্লবীর সঙ্গেও আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পর আমার মনে একটা বিশেষ ইচ্ছা হল যে এই স্বাধীনতাসংগ্রামের একটি তথ্যমূলক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হোক। অন্ততঃপক্ষে এই সংগ্রামে বাংলার যে বিশিষ্ট অবদান তা যাতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তার জন্য চেষ্টা করা খুবই প্রয়োজন বোধ করেছিলাম।

আমি তখন ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের সদস্য। ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জয়পুরে কমিশনের অধিবেশনে আমি প্রস্তাব করি যে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার ব্যবস্থা করা হোক। এ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং আমি যা যা বলি তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ঐ কমিশনের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে।

—"Dr. R. C. Majumdar said that India has attained her independence but the history of the national struggle that culminated in independence has yet to be written. Unless the materials for such a history are now collected some of them are likely to be lost for ever. He did not like to put a chronological limit to the subject that might be done later, but some of the prominent leaders of the independence movement, whether violent or non-violent, were still in the land of living and their correspondence and other relevant papers could yet be saved. This will demand organized effort on the part of the Indian scholars and the Government of the country. The foremost leader of the movement, Dr. Majumdar observed, was Mahatma Gandhi and it was essential that all his papers should be placed in the custody of the National Archives as has been done in the U. S. A. with respect to Lincoln and

Roosevelt Papers.···He was aware of the proposal to organise a Memorial Museum. Other belongings of Mahatmaji might go to the Museum, but his writings and other papers which form an important source of history of our national struggle must come to the National Archives···

A lively discussion on the subject followed and the following resolutions were passed :

Resolution X—This Committee recommends that an attempt be made to compile a list of important records, both published and unpublished, bearing upon the national struggle for freedom.

Resolution XI—That the Government of India be moved to make an initial grant of Rs, 25,000 to be distributed among the Regional Survey Committees for collection of materials relating to the proposed compilation of an authoritative history of Indian national struggle.

Resolution XII—That the Government of India and the Mahatma Gandhi Memorial Committee be requested to transfer all the original writings of Mahatma Gandhi and records relating to him to the custody of the National Archives of India for preservation."

জয়পুরের অধিবেশনের কিছুকাল পরে গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আমি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত New Democrat নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৪৮ সনের ৭ই মে-র সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধে আমি স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলি যে এই কাজ একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয় ; গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই ব্যবস্থা করা দরকার এবং এটি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর আমি তার একটি কপি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নিকট পাঠাই। তাঁর সেক্রেটারী আমাকে একটি চিঠি লিখে জানালেন যে আমি যেন এ বিষয়ে তথ্য ও বেতার বিভাগের (Ministry of Information and Broadcasting) মন্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করি। সেইমত ১৯৪৮ সনের ১৫ই জুন ঐ প্রবন্ধের একটি কপি উক্ত মন্ত্রীর নিকট পাঠাই। কিন্তু তার আর কোন উত্তর পাইনি। তখন আর কোন উপায় না দেখে আমি রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে একটি চিঠি লিখি। তাঁর সঙ্গে পূর্বেই আমার সামান্য

পরিচয় ছিল। চিঠি পাওয়ামাত্রই তিনি ১৯৪৮ সনের ২৫শে অগস্ট তারিখে আমাকে একটি পত্রে জানালেন যে তিনি আমার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং এ বিষয়ে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তাঁর কাছে পাঠাই তাহলে তিনি সেটি কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করবেন।

এই সময় আমার কলকাতার বাড়ির পাশে এক বিবাহ বাড়িতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন দুইজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের কাছে আমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। একজন (নিকুঞ্জবিহারী মাইতি) এটি খুবই সমর্থন করলেন। তিনি এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত প্রস্তাব রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানর জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর কথামত একটি প্রস্তাব আমি ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর নিকট পাঠাই। মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এবং দুবছরের মধ্যে এই ইতিহাস লেখা সম্ভব—এমন মত আমি এই প্রস্তাবে ব্যক্ত করেছিলাম। মন্ত্রী মহাশয় কিন্তু পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারটুকু করারও আবশ্যক মনে করেননি।

জয়পুর অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সে সম্বন্ধে রেকর্ডস কমিশনের পরবর্তী অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯৪৮) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কমিশনকে জানালেন যে দশম ও একাদশ প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির কাছে পত্র লেখা হয়েছে ; এখনও কোন উত্তর আসেনি। অর্থাৎ স্বাধীনতার ইতিহাস সম্বন্ধে সরকার বা শিক্ষামন্ত্রী কিছুই করা আবশ্যক বোধ করেননি।

এইরূপে আমার সমস্ত চেষ্টাসত্ত্বেও যখন কোন ফল দেখা গেল না তখন অকস্মাৎ ১৯৪৯ সনের অগস্ট মাসে দিল্লীর সরকারী দপ্তর থেকে আমি একটি চিঠি পাই। তাতে বলা হয়েছে যে ভারত সরকার স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য একটি সমিতি গঠন করা প্রয়োজন মনে করেছেন এবং আমি তার সভ্য মনোনীত হয়েছি। এই চিঠি পেয়ে মনে হল যে খুব সম্ভবতঃ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় ভারত সরকারের মতির পরিবর্তন হয়েছে। কিছুদিন পরেই আমার এই অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের অধিবেশনে এই বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণী উপস্থাপিত করা হয় ঃ

"Note on the progress made in the compilation of the History of Freedom Movement in India.

Genesis.

The scheme for writing an authentic and comprehensive history of the different phases of the struggle which culminated in the freedom of India in 1947, was originally recommended by the Indian Historical Records Commission at its Jaipur Session in 1948 ; and when the Hon'ble Dr.

Rajendra Prasad invited the attention of the Government of India to the urgency of this work, the Ministry of Education was entrusted with planning and execution of the project." (*Proceedings p. 95*).

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে শিক্ষামন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবীরের কয়েকটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে জয়পুর অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ামাত্রই মৌলনা আবুল কালাম আজাদ তদনুসারে গ্রন্থ লেখার ব্যবস্থা করেন। ("The recommendation of the I. H. R. C. made at Jaipur Session in February 1948 found an immediate response from the late Moulana Abul Kalam Azad who directed that steps should forthwith be taken to give effect to it") সুতরাং এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আবুল কালাম আজাদেরই পাপ্য। ডঃ তারাচাঁদও পরবর্তী কালে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি ক'রেছেন। এই গ্রন্থ রচনার ব্যবস্থার কৃতিত্ব ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের, না মৌলনা আবুল কালাম আজাদের—পূর্বোক্ত ঘটনাবিন্যাসের আলোচনা করলেই পাঠকবর্গ তা বুঝতে পারবেন। আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই যে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে ভারত সরকার এই পরিকল্পনার কোন রূপ দেবারই প্রয়াস করতেন না।

স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লেখার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১৯৫০ সনের ৫ই জানুয়ারী। এই কমিটিতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তা অনুমোদন করেন নি। এর থেকেও বোঝা যায় যে মৌলনা আজাদ সম্বন্ধে হুমায়ুন কবীরের উক্তি কতদূর অসত্য। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি ডঃ তারাচাঁদ। ১৯৫১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর এই কমিটির এক অধিবেশনে ডঃ তারাচাঁদ প্রস্তাব করলেন যে এইরূপ ইতিহাস লেখার ভার সরকারের পরিবর্তে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের উপর দেওয়া হোক। কমিটিতে সিদ্ধান্ত হল যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ই এই কাজের ভার নেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত। কমিটির এই অধিবেশনে কোন কারণবশতঃ আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি; ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেবল ডঃ তারাচাঁদ ও ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। পরে আমি খবর নিয়ে জানলাম যে ডঃ তারাচাঁদের প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল যে একাজের ভার আমাদের হাতে না দিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যায়ের হাতে রাখলে কেবলমাত্র তিনি এবং তাঁর পরিচিত কয়েকজন লোকই এ বিষয়ে কর্তৃত্ব করতে পারবেন। আমি এই কমিটির সভায় উপস্থিত না থাকলেও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। পরে শুনেছি যে এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয় এবং ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক পত্র বিনিময়ও চলে। প্রায় এক বছর এইরূপ চলার পর হঠাৎ শোনা গেল যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

এই কাজের ভার নিতে রাজী হয়নি এবং ভারত সরকারই এখন এই ইতিহাস লেখার ভার গ্রহণ করবেন। আমার বিশ্বাস যে এক্ষেত্রেও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আপত্তির জন্যই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ভার না দিয়ে ভারত সরকার নিজে তা নিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ অবশ্য আমি পাইনি।

এর পরেই অকস্মাৎ ভারত সরকারের তরফে খুব কর্মতৎপরতা দেখা গেল। এক বছর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার পর ১৯৫২ সনের ৩০শে ডিসেম্বর ভারত সরকার এই ইতিহাস লেখার জন্য একটি সম্পাদক-সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতির সভাপতি হলেন ডঃ সৈয়দ মামুদ; বাকি আটজন সভ্য ছিলেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় দত্ত বাহমন পোৎদার, এম. হাবিব, অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, বলবন্ত সিং মেটা, আচার্য নরেন্দ্র দেব, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও আমি। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এর সম্পাদক (Secretary) ছিলেন।

১৯৫৩ সানের ২৬শে এপ্রিল এই সম্পাদক-সমিতির এক অধিবেশনে স্থির হয় যে এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপত্র এবং ইতিহাসের খসড়া (draft) লেখার জন্য একজন বেতনভোগী-ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হবে এবং এই সমিতি আমাকেই এই পদে নিযুক্ত করলেন। এই পদ গ্রহণের পর নানা ভাবে আমি যে রকম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি সে কথা আমার *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857* গ্রন্থের ভূমিকায় এবং *History of the Freedom Movement in India* (Volume I) গ্রন্থের Appendix-এ উল্লেখ করেছি।

প্রথমেই সম্পাদক সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের প্রস্তাবে এই সম্পাদক-সমিতির যাবতীয় কার্যকরী ক্ষমতা একটি ক্ষুদ্র উপসমিতির হাতে ন্যস্ত করা হল। এর সদস্য ছিলেন সম্পাদক-সমিতির সভাপতি সৈয়দ মামুদ, সম্পাদক সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং ভারত সরকারের একজন কর্মচারী। আমাকে বা অন্য কোন ঐতিহাসিককে এর সদস্য করা হল না; অর্থাৎ কার্যতঃ সমস্ত ক্ষমতাই এমন একটি উপসমিতির হাতে ন্যস্ত হল যার সভ্যদের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল উপসমিতিকে উপলক্ষ করে সম্পাদকই সব ক্ষমতা পরিচালনা করছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে এই সম্পাদকের কতকগুলি অদ্ভুত ধারণা ছিল; এর সবিস্তার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করলেই এ বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার হবে।

১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন: "In 1857 an organised attempt was made by the national leaders of India to combine themselves into a single command with the sole object of driving out the British power from India in order that a single unified politically free and

sovereign state may be established. That attempt was conscious and deliberate."

আমি তাঁকে বললাম যে এইভাবে পূর্বেই একটি সিদ্ধান্ত করে তার সমর্থনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা, এটা একেবারে ইতিহাসের মূল সূত্রের বিরোধী। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বাদানুবাদ হয়। আমি প্রথমে তাঁর মতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি আমার সাহায্যের জন্য যেসব রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের লিখিত নির্দেশ দিলেন যে তাঁর পূর্বোক্ত মত সমর্থন করা যায় কেবলমাত্র এমন সব উপকরণই সংগ্রহ করতে হবে; এর বিরোধী কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা হবে না। কারণ তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হবে (thoroughly upset our purpose)। আমি বোর্ড অব এডিটারের ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর এই আদেশ নাকচ করে নির্দেশ দিলাম যে সব রকম প্রমাণই সংগ্রহ করতে হবে—কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রমাণ-উপকরণ সংগ্রহ করা হবে না।

আর একটি কারণেও তাঁর সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ হয়েছিল। আমার কাজে সাহায্যের জন্য যে কয়জন রিসার্চ ফেলো নির্দিষ্ট ছিল তিনিই তাদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন। অনেক সময় কোন মন্ত্রী বা লোকসভায় বিশিষ্ট সদস্যদের অনুরোধে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হত। এরূপ একজন রিসার্চ ফেলোকে তিনি 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামক অধ্যায় লেখার ভার দিলেন। আমি এ বিষয়ে প্রথমে কিছু জানতাম না। কিন্তু পরে আপত্তি করায় তিনি দেখলেন যে এই বিশেষ কাজের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে; অন্ততঃ দু'বছর তাকে এ কাজে রাখতে হবে। দু'বছর পরে সে যখন এই অধ্যায়টি লেখা শেষ করল তখন দেখলাম যে এ লেখার ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই; সম্পাদক সুরেনবাবুর পূর্বোক্ত মত সমর্থন করার উদ্দেশ্যেই সমস্ত অধ্যায়টি লেখা হয়েছে। অবশেষে আমাকে এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ বাদ দিতে হল এবং আমি নিজে পাঁচ ছ'মাস সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে পড়াশোনা করে এই অধ্যায়টি লিখলাম। পরবর্তী কালে এইটি অবলম্বন করে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমার গ্রন্থটি রচনা করি।

সম্পাদকের সঙ্গে মতানৈক্যের আরও একটি গুরুতর কারণ ঘটল। আমি তাঁকে বললাম যে এই বই লিখতে হলে কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বছরে অন্ততঃ দু'তিন মাস পড়াশোনা করা বিশেষ দরকার। তিনি আপত্তি করে বললেন যে আমার নির্দেশমত কোন রিসার্চ ফেলো লাইব্রেরীতে পড়ে নোট করে দিলেই হবে। আমি বললাম, এ অতি অদ্ভুত প্রস্তাব এবং এভাবে ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। এই বিষয়টি নিয়ে আমি শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং তিনি আমাকে বছরে দু'তিন মাস কলকাতায় থাকবার অনুমতি দেন। কিন্তু এতে আর এক বিপদ ঘটল। আমি যখন কলকাতায় থাকতাম তখন সম্পাদক মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে নানা রকম অদ্ভুত বিবৃতি দিতে আরম্ভ

করলেন। একবার বললেন যে নানা সাহেবের সহচর আজিমুল্লার ডায়েরী পাওয়া গেছে ; বোর্ড থেকে তা কেনা হয়েছে এবং এই ডায়েরীতে অনেক গুরুতর তথ্য পাওয়া গেছে। সংবাদপত্রে এই বিবৃতি পড়ে তাঁকে লিখলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্বন্ধে ভালভাবে অনুসন্ধান করে এই সব উপকরণ খাঁটি কিনা তা প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ তিনি যেন এ রকম কোন বিবৃতি না দেন। দিল্লীতে ফিরে সেই ডায়েরী নিয়ে আমি মৌলনা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা করে বলি, আপনি তো উর্দুতে পণ্ডিত ; এই ডায়েরীর ভাষা একশ বছরের পুরনো কি না বলুন। তিনি সেটি রেখে দিলেন। কয়েকদিন পরে জানালেন যে সেটি ঊনবিংশ শতাব্দীর চলিত ভাষা নয়, এটি আধুনিক কালের কোন লেখা।

আর একবার আমার অনুপস্থিত কালে সম্পাদক প্রচার করলেন যে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের এক পাণ্ডার কাছে লেখা ঝাঁসীর রানীর একটি চিঠি পাওয়া গেছে ; তাতে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এই চিঠি ওড়িয়া ভাষার পণ্ডিতদের দেখান হল। তাঁরা একবাক্যে বললেন যে এটা জাল। এইরূপ তাঁতিয়া টোপির উইল পাওয়া গেল। নানা সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যুর পর নানা সাহেব নাকি ছদ্মবেশে তাঁর শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ঐ শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি চিঠিও সম্পাদক বার করলেন। আমি ভারত সরকারের সহায়তায় সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই চিঠির নকল পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ঐ সব নামের ব্যক্তি সেই গ্রামে ছিলেন কিনা তা ভালভাবে অনুসন্ধান করে আমাদের জানাতে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন যে একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী নিজে ঐ গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে সেখানকার অতিবৃদ্ধ অধিবাসীরা বলেছেন যে তাঁরা এই শ্রাদ্ধের কোন কথাই শোনেননি।

তাঁতিয়া টোপির উইলের খবর যারা দিয়েছিল তাদেরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বলাবাহুল্য যে এই সব ব্যাপারে সরকারের বেশ কিছু ব্যয় হয়েছিল। এই রকম আরও বহু ব্যাপার আছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

নানা ব্যাপারে সম্পাদক সুরেনবাবুর সঙ্গে আমার মতানৈক্য প্রায়ই হতে থাকে। সবচেয়ে গুরুতর মতভেদ হল, মহাত্মা গান্ধীর বিবরণী কা'কে দিয়ে লেখান হবে এ নিয়ে। সম্পাদক প্রস্তাব করলেন যে টেণ্ডুলকরকে এই কাজের ভার দেওয়া হোক। আমি এটি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম। টেণ্ডুলকরের লেখা মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিতের ভূমিকায় একটি পৃষ্ঠাতেই তিন চারটি গুরুতর ভুল আছে ; তা সম্পাদককে দেখালাম। সুতরাং টেণ্ডুলকরকে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে অধ্যায় লেখার প্রস্তাবে আমি সম্মত হলাম না।

আর একদিন সম্পাদক-সমিতির অধিবেশনে সুরেনবাবু প্রস্তাব করলেন যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের ফলে বাংলাদেশ যে দুভাগ করা হল, এই

বাংলাভাগের প্রস্তাবের কেউ বিরোধিতা করেনি—এই কথা লিখতে হবে। আমি সেই সভায় বললাম যে অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী যে এর বিরোধিতা করেছিলেন আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারি। তিনি বললেন—প্রমাণ কি? বললাম যে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালিতে ছিলেন। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু। তাঁর কাছে মহাত্মার লেখা চিঠির নকল আছে। আমার কথা শুনে উপস্থিত দু'একজন সদস্যও বললেন যে তাঁরাও এ কথা জানেন।

এই সব বিপত্তি এবং গোলমালসত্ত্বেও ১৯৫৪ সনের মধ্যেই আমি এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের খসড়া (draft) লেখা শেষ করেছিলাম। এই খসড়া সমিতির সকল সভ্যের কাছে পাঠান হল। সে সময় আমেদাবাদে হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। আমাদের সম্পাদক-সমিতির অধিবেশনও আমেদাবাদে ১৯৫৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৫ সনের ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। তিনদিনব্যাপী বাদানুবাদের পর আমার খসড়া ইতিহাস সাধারণভাবে গৃহীত হল। প্রস্তাবে বলা হয়—"The Board generally approves its layout." আরও একটি গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে যদি কোন সদস্য ভিন্নমত পোষণ করেন তবে তা খসড়ার পাশে পাশে পেন্সিলে লিখে আমার কাছে পাঠাবেন এবং আমি সেইমত সংশোধন করে প্রেস কপি তৈরী করব।

এর কিছুদিন পরে লোকসভার এক অধিবেশনে এ বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানালেন যে এই ইতিহাসের খসড়া অনুমোদিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তা ছাপা হবে। কিন্তু এতেই এক বিপদ ঘটল। আমেদাবাদে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে প্রথম খণ্ডের খসড়া অনুমোদিত হলেও তা গোপন রাখা হবে। ছাপা হওয়ার পূর্বে যাতে সেটা বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। অন্যথায় নানা বাদানুবাদের সৃষ্টি হবে। তা সত্ত্বেও লোকসভার অনেক সদস্যকে এই খসড়া ইতিহাস দেখান হয়। এর প্রথম আভাস পাই একদিন মৌলনা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। তিনি আমাকে বলেন যে খসড়া পড়ে তিনি খুব খুসী হয়েছেন এবং বইটি খুব ভাল হয়েছে বলেই তাঁর ধারণা। কয়েকজন এম. পি. তাঁকে বলেছেন যে এই বইএ বাঙ্গালী জাতিরই প্রশংসা বেশি করা হয়েছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদানকেই বড় মনে করা হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম যে প্রথম খণ্ডে রামমোহন রায় থেকে ১৮৮৫ সন পর্যন্ত সময়ের জাতীয় চেতনার ইতিহাস লেখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলার বাইরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশের অবদান যে বেশি ছিল না তা আপনিও ভাল করে জানেন। তিনি বললেন, তাতো জানি। আমরা দু'জনেই বাংলাদেশের লোক। সুতরাং এরূপ বিরূপ সমালোচনা হতে থাকবে এবং তাতে খুবই অনিষ্ট হবে।

কিছুদিন পরেই বুঝতে পারা গেল যে আমার বইএর খসড়া নিয়ে বেশ

গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। ১৯৫৫ সনের ২৮শে মার্চ তারিখে সম্পাদক-সমিতির এক অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনের আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ডঃ তারাচাঁদের একটি লিখিত মন্তব্য সদস্যদের কাছে পাঠান হয়। টাইপকরা ফুলস্ক্যাপ কাগজের এগার পৃষ্ঠাব্যাপী এই মন্তব্যে তিনি এই স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসের সূচীপত্রের বা বিষয়বস্তুর এক খসড়া পাঠিয়েছেন তাতে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরাজ রাজত্ব পর্যন্ত সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এর অনেক বছর পরে ডঃ তারাচাঁদ কর্তৃক সংকলিত স্বাধীনতাসংগ্রামের যে ইতিহাস ভারত সরকার প্রকাশ করেছেন তা থেকে এই পরিকল্পনার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। যদিও ডঃ তারাচাঁদ বা হুমায়ুন কবীর কেউই এই সম্পাদনা-সমিতির সভ্য ছিলেন না তথাপি এঁদের দুজনকে এই সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। কারণস্বরূপ সম্পাদক বলেন যে হুমায়ুন কবীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর বর্তমান সেক্রেটারী এবং ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন ভূতপূর্ব সেক্রেটারী। ডঃ তারাচাঁদ নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিহাস লেখার সমর্থন করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং তার মুখবন্ধে তিনি বলেন যে আমি প্রথম খণ্ডের যে খসড়া তৈরী করেছি তা মোটেই ইতিহাস পদবাচ্য নয়। এর উত্তরে আমি অনেক যুক্তির কথা বলেছিলাম। এই মিটিংএর যে সরকারী বিবরণ ছাপা হয় তা থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করছি—

"অতঃপর ডঃ তারাচাঁদ স্বাধীনতার ইতিহাসের যে পরিকল্পনা তৈরী করেছেন তার আলোচনা আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে ডিরেক্টর ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন। তিনি প্রথমে বলেন যে স্বাধীনতার ইতিহাসের অর্থ ইংরেজ জাতির পরাধীনতা হইতে মুক্তি এবং এ স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সূচিত করে। এই উক্তির সমর্থনে ডঃ মজুমদার দুইখানি চিঠি হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। একখানি ভারত সরকারের পত্র, আর একখানি এই সভার সম্পাদকের। ভারত সরকারের পত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে এই ইতিহাস প্রধানতঃ ১৮৭০ থেকে ১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কাল পর্যন্ত যুগের ইতিহাস। সম্পাদক তাঁর পত্রে লিখেছেন যে এই ইতিহাস আরম্ভ হবে ১৮৫৭ সাল থেকে। সম্পাদকের এই পত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে সম্পাদক-সমিতির বৈঠকে প্রথম খণ্ডের যে খসড়ার সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করা হয় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তদনুসারে গ্রন্থের একটি বিস্তৃত বিবরণ এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনামা ১৯৫৪ সনে সকল সদস্যের নিকট পাঠান হয়। তারপর ১৯৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে আমেদাবাদে সম্পাদক-সমিতির বৈঠকে পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে যে খসড়া তৈরী হয় তা সাধারণভাবে গৃহীত হয়। (একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।) ডঃ মজুমদার বলেন যে ঐ খসড়াটি এখন একরকম স্বীকৃত বলে ধরে নেওয়া হবে এবং নতুন কোন খসড়া করা সমীচীন হবে

না। তিনি আরও বলেন যে ডঃ তারাচাঁদ যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন সেটি একরকম ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ইতিহাস হিসাবে বিচার করতে হলে এর অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক। যদিও ডঃ তারাচাঁদ স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ডঃ মজুমদার এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দেন যে প্রস্তাবিত স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে স্বাধীনতাসংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং অন্য যেসব ঘটনা এই সংগ্রামের সহিত কোন না কোন সূত্রে যুক্ত কেবলমাত্র তারই আলোচনা হবে; কিন্তু ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনায় এই প্রণালীর যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।"

এই বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হল। কোন কোন সভ্য বললেন যে ডঃ তারাচাঁদ যে পরিকল্পনা করেছেন তার সঙ্গে সম্পাদক-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত খসড়ার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই এবং পরিশেষে এই সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে বোর্ড ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনাকে সাধারণভাবে অনুমোদন করেন।

বোর্ডের এই অধিবেশন (২৮শে মার্চ, ১৯৫৫ সন) সম্বন্ধে অনেক কিছুই গভীর রহস্যে আবৃত। আমার তৈরী খসড়া দু' দুবার অনুমোদিত হল এবং সেই অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায় ভাগ করা হল। তার পরেও কে কি কারণে ডঃ তারাচাঁদকে আবার নতুন পরিকল্পনা তৈরী করতে অনুরোধ করলেন এবং কেন আবার আলোচনার জন্য একটি পৃথক মিটিং ডাকা হল, এর কোন কারণ আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, আমার খসড়া ও ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও বোর্ডের কয়েকজন সদস্য বললেন যে এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই এবং বোর্ড সেটি অনুমোদন করলেন; অথচ বোর্ড আমার খসড়াটিও বাতিল করলেন না। এর পর ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয়েছে বলে আমি জানি না।

আরও একটি আশ্চর্য রহস্যের বিষয় এই যে প্রথম খণ্ড পুরোপুরি লেখা এবং বোর্ডের অনুমোদন লাভ করার পর এবং এই অনুমোদিত খসড়া যে শীঘ্রই ছাপা হবে—লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণা সত্ত্বেও মিটিংএ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—

শিক্ষামন্ত্রীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য অনুরোধ করা হোক—(১) সম্পাদক-সমিতি স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা পুরোপুরি সম্পূর্ণ এবং মুদ্রণের উপযোগী করে সেটি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পাঠাবেন, কিংবা সম্পাদক-সমিতি যেসব ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তার সাহায্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এই ইতিহাস লেখার জন্য নিযুক্ত করবেন, (২) যদি ভারত সরকার এই সম্পাদক-সমিতিকেই মুদ্রণের উপযোগী করে এই

ইতিহাসের কপি পাঠানোর অনুকূলে মত প্রকাশ করেন তাহলে এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলি রচনা সম্পূর্ণ করার জন্য যে শেষ তারিখ পূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিম্নলিখিত তারিখ গ্রহণ করা হোক—প্রথম খণ্ড ৩১ মার্চ, ১৯৫৬ ; দ্বিতীয় খণ্ড ৩১ মার্চ, ১৯৫৭ এবং তৃতীয় খণ্ড ৩১ মার্চ, ১৯৫৮ ; (৩) যদি সরকার মনে করেন যে এই সম্পাদক-সমিতি কেবলমাত্র উক্ত ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করবেন তাহলে এই সংগ্রহের কাজ ১৯৫৭ সনের ৩১শে মার্চের মধ্যে শেষ হবে।

এই প্রস্তাবগুলিও খুব রহস্যজনক। কয়েক বছরের চেষ্টায় খসড়া তৈরী হল, সদস্যদের নিকট মতামতের জন্য পাঠান হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেটি গৃহীতও হল। তারপর সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হল আমরা ইতিহাস লিখব, না কেবল উপকরণ সংগ্রহ করব? আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই মিটিংএর ছয়দিন পূর্বে, ১৯৫৫ সনের ২২শে মার্চ তারিখে দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশনে শিক্ষা দপ্তরের পার্লামেন্টরী সেক্রেটারী ডঃ কে. এল. শ্রীমালী একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম ভাগ অর্থাৎ ১৮৮৪ সন পর্যন্ত বিবরণের খসড়া তৈরী হয়ে গেছে এবং এর পরবর্তী খণ্ড (১৮৮৫-১৯০৫) এখন তৈরী হচ্ছে। এর পর শ্রীগোপাল রেড্ডী নামে একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করেন যে কতদিনে এই ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হবে? তার উত্তরে ডঃ শ্রীমালী বলেন যে আশা করা যায় ১৯৫৬ সন শেষ হওয়ার পূর্বেই সমস্ত খণ্ড তৈরী হয়ে যাবে। ডঃ রঘুবীর সিংহ জানতে চান কবে প্রথম খণ্ডের মুদ্রণোপযোগী কপি প্রস্তুত করার কাজ শেষ হবে (when the first volume would be finalised for publiction)। এর উত্তরে ডঃ শ্রীমালী বলেন আমি পূর্বেই বলেছি এটি মোটামুটি তৈরী হয়েছে এবং কিছু কিছু সংশোধন বাকী আছে (This is practically ready and it is waiting for revision only)। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমালী বলেন যে আমি সংশোধনের কথাই লিখেছি, পুনর্বার লেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এই সমুদয় আলোচনা করলে দেখা যায় যে ২৮শে মার্চ তারিখে সম্পাদক-সমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার সঙ্গে লোকসভায় সরকারের এই উক্তির কোন সঙ্গতি নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সম্পাদক-সমিতির প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানর পরেই দেখা গেল তাদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

বিভিন্ন খণ্ড তৈরী করার শেষ তারিখ বাড়ানর জন্য সরকারকে যে অনুরোধ করা হয় সেটি তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। লোকসভায় পূর্বোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে যদিও স্পষ্ট দেখা যায় যে সরকার ১৯৫৬ সনের শেষ পর্যন্ত এই বোর্ড রাখা স্থির করেছিলেন তথাপি তাঁরা হঠাৎ সিদ্ধান্ত করলেন ১৯৫৫ সনের শেষেই এই বোর্ড তুলে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে বোর্ডের কাছে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করে বলেছিলাম যে সরকার যদি এই বোর্ড তুলে দিয়ে ২/৩

জনের হাতে এই বই লেখার ভার দেন তাহলে আমি এই তিনখণ্ড বই আর এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেব—এমন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছি। বোর্ডের সম্পাদক এতে তো রাজী হলেনই না, বরং খুবই বিরক্ত হলেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার খুব তর্কবিতর্ক হয়। তিনি এমন কয়েকটি মন্তব্য লিপিবন্ধ করলেন যাতে আমার পক্ষে বোর্ডের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক বজায় রাখা সঙ্গত মনে হল না।

বোর্ডের সভাপতির সঙ্গেও আলাপ করলাম ; দেখলাম তিনিও সম্পাদকের সঙ্গেই একমত। এটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল যে বোর্ডকে বাদ দিয়ে অথবা বোর্ডের সভ্য হিসাবে আমি এই বই লেখার ভার নেব—এই প্রস্তাবে ভারত সরকার, বোর্ডের সভাপতি বা সম্পাদক কারুরই মত নেই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে পূর্বলিখিত ১৯৫৫ সনের ২৮শে মার্চ তারিখে সম্পাদক-সমিতির যে অধিবেশনে ডঃ তারাচাঁদের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেখানে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে বিষয়ে এই সমিতিতে যে কয়েকজন ঐতিহাসিক সভ্য ছিলেন তাঁরাও ডঃ তারাচাঁদের প্রস্তাব প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মেনে নিলেন। অর্থাৎ কেউ প্রকাশ্যে মেনে নিলেন—এবং বাকী কয়েকজন আমার তৈরী খসড়ার সঙ্গে যে এর গুরুতর প্রভেদ, তা বুঝে এবং মেনে নিয়েও এ বিষয়ে কোন কথাই বললেন না। এই সব কারণে আমার বিশ্বাস হল যে এই গ্রন্থ লেখার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয় এবং আমি কোন কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পাই—এতে তাঁদের মত নেই। সুতরাং ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসেই সম্পাদকের কতকগুলি মন্তব্যের প্রতিবাদে আমি এই বোর্ডের সদস্যপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। এ সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র এখন আমার কাছে নেই ; নিশ্চয়ই তা সরকারী দপ্তরে রাখা আছে। আমি নিজে এ বিষয়ে আপাততঃ আর কিছু বলতে চাই না ; তবে কেবল আর দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

গ্রন্থের তিনটি খণ্ড সমাপ্ত করার জন্যে বোর্ড থেকে সরকারের কাছে ১৯৫৮ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়। ভারত সরকার তাতে রাজী হননি। আমি বোর্ড তুলে দিয়ে এক বছরে বই শেষ করব, এই শর্তে আমার উপর এই বই লেখার ভার দেওয়ার প্রস্তাব করায় বোর্ড ও সরকার সকলেই আপত্তি করেন ; অথচ আমার পদত্যাগের পর বোর্ড তুলে দিয়ে সরকার ডঃ তারাচাঁদকে এই বই লেখার ভার দেন। এর পর ষোল বছর কেটে গেছে ; কিন্তু এখনও (১৯৭৩) ডঃ তারাচাঁদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৯৬১ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র কয়েক বছর আগে বেরিয়েছে ; তাতে ১৯০৫ সন পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। কিন্তু যে তৃতীয় খণ্ডে ১৯০৫ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সময়কার বিবরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত বিবরণ আছে, সেই খণ্ড ১৯৭৩ সনে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ শুনতে পাই ভারত সরকার এই গ্রন্থ রচনার জন্য প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন ; এ কতদূর সত্য জানি না।

দ্বিতীয়তঃ, ডঃ তারাচাঁদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় জনাব হুমায়ুন কবীর বোর্ডের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা যে কতদূর অসত্য তা পূর্বোক্ত বিবরণ পড়লেই বোঝা যাবে। শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারীর মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি যে এভাবে সত্যের অপলাপ করতে পারেন এটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। আজ তিনি পরলোকগত। কিন্তু তাঁর জীবিত কালেই ১৯৬২ সনে প্রকাশিত আমার *History of the Freedom Movement in India* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষভাগে একটি পরিশিষ্টে আমি তাঁর এই অসত্য ভাষণের কথা উল্লেখ করেছি এবং তার প্রমাণও দিয়েছি। এরপরও বহুদিন তিনি জীবিত ছিলেন ; কিন্তু কোনদিন তিনি এর প্রতিবাদ করতে ভরসা পান নি।

তৃতীয়তঃ, ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার মতামত পূর্বেই বলেছি। তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হবার কিছুদিন পরেই আমার *History of the Freedom Movement in India* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। *American Historical Review* পত্রিকায় এই দুই গ্রন্থের সমালোচনা একই সঙ্গে করা হয়। ডঃ তারাচাঁদের বই সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন যে এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের পক্ষে অগৌরবজনক এবং আমার বই সম্বন্ধে প্রশংসা করা হয়। তারাচাঁদের বই সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনা এদেশেও বেরিয়েছে। *Bengal Past and Present* পত্রিকায় ডঃ এন. কে. সিংহ লিখেছেন যে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস যে Adam and Eve-এর সময় থেকে আরম্ভ হয়নি এটা আমাদের সান্ত্বনার বিষয়। নিজের বই সম্বন্ধে নিজের মুখে কিছু বলা আমার শোভা পায় না। যেসব সমালোচনা আমি পড়েছি তাতে দেখেছি ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনার চেয়ে আমার পরিকল্পনাকেই পণ্ডিতমণ্ডলী অধিকতর উপযোগী বলে মনে করেছেন। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

আমার বইয়ের তিন খণ্ডেরই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ তারাচাঁদের বই কত কপি বাজারে বিক্রী হয়েছে আর কত কপি বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে—ভারত সরকার সে বিষয় অনুসন্ধান করে করদাতাদের মোট কত টাকা এই বইয়ের জন্য খরচ হয়েছে তা জানালে সে সম্বন্ধে জনসাধারণ একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই স্মৃতিকথায় লেখা আবশ্যক। যে সময় আমি এই বই লেখার ভার গ্রহণ করি তার পূর্ব পর্যন্ত আমার ইচ্ছা ছিল যে নানা কাজে বিব্রত থাকায় *Indian Colonies in the Far East* Series-এর যেসব গ্রন্থ এতদিন প্রকাশ করতে পারিনি, তা এবার শেষ করব। চম্পা (Vietnam) ও যবদ্বীপে (Java) হিন্দু উপনিবেশের কথা তিন খণ্ডে আমি লিখেছিলাম। কম্বোজ সম্বন্ধে ছোট একখানি বই কয়েকটি বক্তৃতার সংকলন হিসেবে প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু কম্বোজ, শ্যাম বা ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস লেখার সংকল্প কাজে পরিণত করতে পারিনি। হিন্দু

উপনিবেশের ইতিহাস এবার সম্পূর্ণ করব ভেবেছিলাম ; স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লেখা শুরু করার পর সে সংকল্প আমায় ত্যাগ করতে হল। তার প্রধান কারণ সারা জীবন আমি কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসই চর্চা করেছি ; আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চা বিশেষ করিনি। স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করে ইংরেজ আমলের ইতিহাস ভাল করে পড়তে হয় ; বিশেষ করে সিপাহীযুদ্ধের কথা লিখতে গিয়ে আমায় অনেক দিন ধরে বহু বই ও দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। ইচ্ছে ছিল স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লেখা শেষ হলেই আবার হিন্দু উপনিবেশ সম্পর্কে আমার সংকল্প কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করব। কিন্তু ১৯৫৫ সালের শেষ ভাগে যখন এই কাজ থেকে ছুটি পেলাম তখন দুটি কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। প্রথম কারণ এই যে, এই কাজ থেকে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিদ্যাচর্চা বিভাগে (College of Indology) অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত হই। এর একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা দরকার।

আমি যখন দিল্লীতে স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজে ব্যস্ত সেই সময় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি নূতন বিভাগ খোলার প্রস্তাব করেন এবং ভারত সরকারের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করেন। সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছেই এই প্রস্তাব করা হয়। তাঁরা এই সাহায্য দেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আমাকে নাগপুরে গিয়ে সব দেখে একটি রিপোর্ট দেবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমি নাগপুর যাই ; সেখানে কয়েকদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী দেখি এবং ইতিহাসের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ করি। নাগপুরে এমন একটি বিভাগ খোলা আবশ্যক—এমন অভিমত আমার রিপোর্টে ব্যক্ত করি ; কারণ দক্ষিণ ভারতে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে অধ্যাপনা বা গবেষণা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমার রিপোর্ট অনুমোদন করেন এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দিতে রাজী হন।

এর কিছুদিন পরে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার আমাকে একটি চিঠিতে লেখেন যে নাগপুরের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁর নিজের বৃহৎ বাড়ি এবং কিছু টাকা College of Indology-র জন্য দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন ; তাঁর ইচ্ছা, আমি এর প্রথম অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে এই বিভাগটি চালু করি। তাঁর সেই বিশাল বাড়িতে কলেজ হবে এবং আমার থাকার ব্যবস্থাও হবে। উত্তরে লিখলাম যে দিল্লীতে আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখবার ভার নিয়েছি, কাজেই এখন আর কোন নতুন কাজ নেওয়া সমীচীন হবে না।

এর কিছুকাল পরেই স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজ থেকে বিদায় নিতে হয়, তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই সংবাদ পেয়ে অথবা অন্য

যে-কোন কারণে নাগপুরের ভাইস্-চ্যান্সেলার College of Indology-র অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আমাকে আবার আমন্ত্রণ করেন। অনেক দিক ভেবে এই কাজ আমি গ্রহণ করি। যে কারণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলাম, এখানেও ঠিক সেই কারণে এই পদ গ্রহণ করলাম। মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রটি গড়ে তোলা। বেনারসে আমারই তত্ত্বাবধানে Indology বিভাগ প্রথম খোলা হয়; নাগপুরেও তাই।

তখনও হিন্দু উপনিবেশের বাকী ইতিহাস লেখার সংকল্প একেবারে ত্যাগ করিনি। কিন্তু নাগপুরে গিয়ে আমার মত পরিবর্তিত হল। যে দু'বছর আমি ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত ছিলাম সে-সময়ে আমাকে যে ইংরেজ যুগের ভারতের ইতিহাস অনেক পড়তে হয়েছিল, একথা পূর্বেই বলেছি। বইগুলি পড়বার সময় মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে ভাল বই লেখা দরকার। *Cambridge History of India*-ই এ বিষয়ে প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থ। ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের যে খণ্ডে ইংরেজ যুগের কথা লিখিত হবে সেই খণ্ড লেখার সময় উপস্থিত হল। এর পূর্বে যে ছয় খণ্ড বই বেরিয়েছিল তার বিভিন্ন অধ্যায় লেখার জন্য বিভিন্ন লেখক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাতে অনেক দেরী এবং আরও অনেক অসুবিধা হয়েছিল। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা ইংরেজ আমলের ইতিহাস পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে এর সমগ্র ইতিহাস একজন না লিখলে এর পারম্পর্য বজায় থাকবে না এবং এ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হবে না। সুতরাং মনে মনে স্থির করেছিলাম যে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস আমি একাই লিখব; কেবল দু' একটি বিষয়ে যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—যেমন প্রাদেশিক সাহিত্য, শিল্প ও অর্থনীতি—তার জন্য অন্য লেখক নিযুক্ত করব।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখলাম সেখানকার লাইব্রেরীতে ব্রিটিশ যুগের প্রচুর বই আছে; হিন্দু আমলের বই তেমন নেই! সুতরাং নাগপুরে গিয়ে ব্রিটিশ যুগের বই অধ্যয়ন ও লেখা আরম্ভ করি। তারপর প্রায় দশ বারো বছরে এই সিরিজের ব্রিটিশ যুগের যে তিন খণ্ড বই (নবম, দশম, একাদশ) প্রকাশিত হয় তার প্রায় সম্পূর্ণই আমার লেখা। স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস রচনার সম্পাদক-সমিতির সঙ্গে পরিণামে আমার সম্বন্ধ যতই অপ্রীতিকর হোক, তাঁদের কাছে আমি একটি বিষয়ে বিশেষভাবে ঋণী। এই ইতিহাস রচনা উপলক্ষেই ইংরেজ যুগের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং তারই ফলে আমি ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের তিনখণ্ড ইংরেজ যুগের ইতিহাস এবং পৃথকভাবে তিনখণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস লিখতে সমর্থ হই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে দিল্লী ছাড়বার পরে ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের উক্ত তিন খণ্ড ছাড়াও ষষ্ঠ খণ্ড লেখার অনেকটা দায়িত্বও আমাকে

নিতে হয়। ষষ্ঠ খণ্ডে মুসলমান যুগের কথা লেখা হয়। তখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল মুসলমান অধ্যাপকদের লেখা দেবার কথা ছিল তাঁরা লিখতে রাজী হলেন না। আমি তখন ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ এবং কালিকারঞ্জন কানুনগোকে ঐসব অধ্যায় লেখার জন্য অনুরোধ করি। কে. এম. মুন্সী তখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল। কোন কারণে এঁরা দুজনেই তাঁর উপর অপ্রসন্ন ছিলেন এবং যেহেতু মুন্সীজী ভারতীয় বিদ্যাভবনের পরিচালক বা পৃষ্ঠপোষক সেজন্য তাঁরা লিখতে রাজী হলেন না। তখন অনন্যোপায় হয়ে আমি যতদূর সম্ভব মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠ করে এই খণ্ডের অনেকগুলি অধ্যায় লিখি। সুতরাং যদিও আমি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় অতিবাহিত করেছি তথাপি কতকগুলি অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত কারণে আমাকে ভারতের মধ্যযুগের এবং বর্তমান যুগের ইতিহাসও গভীরভাবে চর্চা করতে হয়েছে। এইরূপে দিল্লী ছাড়বার পর প্রায় বারো বছর (১৯৫৬-১৯৬৮) আমি একাজে নিযুক্ত থাকায় প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ সিরিজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি। তবে এর ফলে আমার ধারণা হয়েছে যে ভারতের ইতিহাসের তিনটি যুগের ইতিহাস জানা না থাকলে কোন যুগ সম্বন্ধেই একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। বিদ্যাভবন সিরিজে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের লেখা বইগুলির খুব প্রতিকূল কোন সমালোচনা আমি দেখিনি; বরং অনেক প্রশংসামূলক সমালোচনা বেরিয়েছে।

এর জন্য স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসের সম্পাদক-সমিতির নিকট আমার ঋণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই সমিতির যে সম্পাদকের সঙ্গে মনোমালিন্যবশতঃ আমাকে বিদায় নিতে হয়, তিনিই বিশেষ আগ্রহে আমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করেন এবং পণ্ডিত নেহরু মৌলনা আজাদ সাহেবকে দিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে পূর্বে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছি; উপসংহারে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

মানুষের জীবনে এমন অনেক গুরুতর ঘটনা অথবা পরিবর্তন ঘটে যা দৈব বলেই মনে হয়। এম. এ. পরীক্ষা পাশ করার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসই আমার ঐতিহাসিক গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল। জীবনের অপরাহ্নে প্রায় সত্তর বছর বয়সে যে আমি নূতন কোন বিষয়ের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করব—এটা কখনও ভাবিনি; আমার কল্পনায়ও কখনও আসেনি। স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস রচনা উপলক্ষে আমার ঐতিহাসিক গবেষণা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হল—এটা আমার কাছে দৈব ঘটনা বলেই মনে হয়। তবে এর ফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তার বিচার করবার ভার আমার উপর নয়, শক্তিও আমার নেই। একদিকে যেমন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ করতে পারিনি, অন্যদিকে তেমনি মধ্য ও আধুনিক যুগের সম্বন্ধেও অনেক বই ও প্রবন্ধ লিখেছি। এর ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতির হিসাব ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি।

ইউনেস্কোর অধিবেশন

১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি; ১৯৫২ সন পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫—এই দু' বছর আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার যে সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তার ডাইরেক্টর ছিলাম। সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৯৫৫ সনে আমি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। এই পাঁচ বছরে (১৯৫০-১৯৫৫) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতির বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এই পাঁচ বছরে এ ছাড়াও আমার জীবনে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, নাগপুরের কথা লেখার পূর্বে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ, ১৯৫০ সনে UNESCOর (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) এক অধিবেশনে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন; আমি এই দলের অন্যতম সভ্য ছিলাম। আরও কয়েক জন সভ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব ডঃ তারাচাঁদ, বৈজ্ঞানিক কৃষ্ণাণ, এফ. আর. এস. এবং খুশবন্ত সিং-এর নাম আমার মনে আছে। ১৯৫০ সনের ১৯শে মে থেকে ১৭ই জুন পর্যন্ত ফ্লোরেন্স শহরে এই অধিবেশন হয়। সকাল বিকাল দুবেলাই অধিবেশন হত। স্যার রাধাকৃষ্ণণ সব সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না; পালা করে আমরা দু' তিনজন সভ্য প্রত্যেক সভায় যোগ দিতাম।

একদিন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র দুজন—খুশবন্ত সিং ও আমি উপস্থিত আছি, এমন সময় অকস্মাৎ এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হল যে চীন দেশের কমিউনিস্ট সরকারকে এই সভার অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করা হোক। এ নিয়ে প্রথমে কিছু তর্ক-বিতর্কের পর বিষয়টি ভোটে নির্ধারণের প্রস্তাব হল। এখানে ভোট দেবার নিয়ম হল—প্রত্যেক দেশের একটি করে ভোট; উপস্থিত সদস্যদের একজনের ভোটই সেই দেশের ভোট বলে গণ্য করা হবে। আমরা স্থির করলাম চীনের পক্ষেই ভোট দেব; কারণ আমরা ভালভাবেই জানতাম ভারত সরকারের মত কমিউনিস্ট চীনকে গ্রহণের অনুকূলে। তর্ক-বিতর্কের পর যখন ভোট নেবার সময় এল তখন সেই প্রকাণ্ড হলের একধার থেকে

সভাপতি মহাশয় ফরাসী ভাষায় কি বললেন আমি ঠিকমত বুঝতে পারলাম না। আমার ভোট দেবার পর আর একদল যখন হাত তুলল তখন আমার খেয়াল হল পূর্বের ভোট বোধ হয় চীনের বিরুদ্ধে ভোট। পাশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও তাই বললেন। তখন আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সভাপতি মহাশয়কে বললাম যে ভোট দেবার সময় ব্যাপারটি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি ; তবে ভারতবর্ষের ভোট হচ্ছে চীনকে সভ্যরূপে গ্রহণ করার পক্ষে। বলা বাহুল্য আমার ভোট চীনের পক্ষেই রেকর্ড করা হয়েছিল।

পরদিন সংবাদপত্রে এই মর্মে খবর বেরল যে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রথমে চীনের বিপক্ষে ভোট দেবার পর নানারকম চিন্তা করে চীনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এর একটা কারণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ তখন চীনের বিরুদ্ধে ; সুতরাং আমার এই ভোট দেওয়ার ব্যাপারটি একটু ফলাও করেই বেরিয়েছিল। ডঃ তারাচাঁদ যে আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন সেকথা পূর্বেও বলেছি। শুনেছি তিনিও এই ব্যাপারটি ভারত সরকারের কাছে অতিরঞ্জিত করে বলেছিলেন। অথচ যে সংবাদপত্রে এই খবরটি বেরিয়েছিল তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে আমার ভোট চীনের পক্ষেই রেকর্ড করা হয়েছে।

আর একদিনও এই রকম একটা ব্যাপার ঘটল। সেদিন প্রস্তাব হল প্রাচীন সভ্যজাতির যে-সব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে (classical works) সেগুলি নানা ভাষায় অনুবাদ করা হোক—যাতে জগতের সব দেশের লোকেই তাদের পরিচয় পেতে পারে। প্রস্তাবটিতে গ্রীক, রোমান, আরবী, চীনা ভাষা ছাড়াও আরও দু'-একটি ভাষায় লেখা গ্রন্থের নাম ছিল ; সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থের নাম কিন্তু ছিল না। সেদিনও স্যার রাধাকৃষ্ণণ উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বই যাতে অনুবাদ করা হয় সেটাও এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হোক—একথা আমাদের বলা উচিত। ডঃ তারাচাঁদ বললেন, আমাদের প্রতিনিধি দলের নেতা স্যার রাধাকৃষ্ণণকে না জানিয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনা সঙ্গত নয়। আমি বললাম যে এই প্রস্তাব একবার গৃহীত হলে আর কিছু করার থাকবে না। সুতরাং আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ঋগ্বেদই জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এ ছাড়া ভারতে আরও এমন অনেক গ্রন্থ আছে যা রোমান বা আরবী ভাষায় লেখা গ্রন্থের চেয়ে পুরনো ; সেগুলির অনুবাদ হওয়া বিশেষভাবে দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপনিষদ, কালিদাসের কাব্য ও নাটক প্রভৃতির উল্লেখ করেছিলাম। দু'একজন আমাকে সমর্থন করলেন, কয়েকজন আপত্তিও তুললেন। আপত্তির কারণ ছিল এই যে UNESCOর এক কমিটি অনেক চিন্তার পর এই প্রস্তাব এনেছেন ; সুতরাং এই সাধারণ সভায় তার অদল বদল করা উচিত হবে না। সভাপতি মহাশয় বললেন যে প্রস্তাবটি যেমন আছে তেমনি থাকুক ; একটি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, পরবর্তীকালে যে সকল ভাষা থেকে অনুবাদ করা হবে সংস্কৃত ভাষা তাদের

অন্যতম বলে গ্রহণ করা হবে। সভাপতির এই নির্দেশ গৃহীত হল। তার ফলে সংস্কৃত ভাষার নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সভার পরে স্যার রাধাকৃষ্ণকে আমি সব কথা বললাম, তিনি আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন।

এই সভায় আরও দু'একবার নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি; সেসব আর এখন আমার মনে নেই।

ফ্লোরেন্সে প্রায় এক মাস ছিলাম। এই সময় এর অনেক জায়গা ঘুরে প্রাচীন ইটালীর অনেক শিল্প নির্দর্শন দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে যীশু খ্রীষ্টের 'লাস্ট সাপার' (শেষ ভোজ) নামে বিখ্যাত ছবিটি এখানেই আছে। সেটি দেখতে গিয়েছিলাম। এখন ছবিটির রং অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। (ছবিটি ফ্লোরেন্স না অন্য কোন শহরে আছে ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তবে ছবিটি আমি দেখেছি।) ফ্লোরেন্সে অনেক গীর্জা ও মিউজিয়ামে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু ছবি আছে, সেগুলি দেখেছিলাম। মেডিচিদের রাজপ্রাসাদও দেখেছিলাম। ফ্লোরেন্স মধ্যযুগের ইটালীর একটি অতি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এই ঐতিহাসিক নগরীর স্মৃতি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

UNESCO-র অধিবেশন যখন হয় তখন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি। মিটিং শেষ হবার পর সরাসরি দেশে না ফিরে আমি ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গায় ১২/১৩ দিন ঘুরে বেড়াই। এই দেশ ভ্রমণের কথা কিছু অন্যত্র লিখেছি; এখানে আর তা উল্লেখ করব না। ৩০শে জুন বোম্বাই বিমান বন্দরে নেমে দেখি, ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস-এর সহকারী সম্পাদক ডঃ এ. ডি. পুসলকর দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন যে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সবাই ভাল আছেন। আমি একথার কোন অর্থ বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। এবার আমার বিদেশে যাবার সময় স্থির ছিল যে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দার্জিলিং যাবেন, সেখানে আমার একটি বাড়ি ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে সাধারণতঃ আমরা সকলে দার্জিলিংএ থাকতাম। এবার আমি না থাকলেও বাড়ির অন্য সকলের দার্জিলিং যাওয়ার কথা ছিল। আমি পুসলকরকে বললাম, আপনার কথার তো কোন অর্থ বুঝতে পারছি না; তাঁদের কি কোন অসুখ হয়েছিল? পুসলকর বললেন যে আপনি শোনেননি দার্জিলিং-এ ধ্বস নেমে (land slide) বহু বাড়ি ভেঙ্গে গেছে, অনেক লোক মারা গেছে। আপনার স্ত্রী মুন্সিজীকে জানিয়েছেন যে এই দুর্ঘটনার খবর বিদেশী কাগজেও বেরিয়েছে, হয়তো আপনার চোখে পড়েছে। আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে হয়তো বোম্বাই থেকে সোজা দার্জিলিং চলে যাবেন—সেজন্যে মুন্সিজী আপনাকে সঠিক খবর দেবার জন্যে আমাকে বিমানবন্দরে পাঠিয়েছেন।

কলকাতায় এসে দেখলাম স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সবাই ফিরে এসেছেন। তাঁদের কাছে যে ভয়াবহ বর্ণনা শুনলাম তাতে তাদের যে প্রাণ রক্ষা হয়েছে—এটা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহই বলতে হবে। আমার বাড়ির কিছু উপরে এক

ভদ্রলোক ইটের একটি প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করেছিলেন। শুনলাম সেই বাড়িটি ধ্বসে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে শুধু ধ্বংস নয় একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। এর পরের বার দার্জিলিং গিয়ে দেখি সেই বাড়িটির চিহ্নমাত্র নেই। আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম সারাদিন বৃষ্টি হবার পর সন্ধ্যাতেও যখন তা থামল না—এত বৃষ্টি যে পাহাড়ের উপর ঢালু রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—আমাদের দু'জন প্রতিবেশী সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে একটি হোটেলে আশ্রয় নেন। অনেক বাড়ি ভেঙ্গে পড়ায় বহু পাহাড়ী লোক এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হয়, আমার স্ত্রী তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। একে এই দুর্যোগ, তার উপর খাওয়ার কষ্ট। কি ভীষণ বিপদেই না ক'দিন কাটাতে হয়েছিল!

বৃষ্টি বন্ধ হতে শোনা গেল রাস্তা এমন খারাপ যে বাগডোগরা যাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাগডোগরা থেকে প্লেন ছাড়ে। আমার বাড়ির লোকেরা খানিকটা হেঁটে, খানিকটা ট্যাক্সিতে—এই ভাবে রাস্তা পার হয়ে বাগডোগরা পেঁছে প্লেন ধরে কলকাতায় আসতে সমর্থ হয়।

এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর পূর্বে দার্জিলিং-এ কখনও ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখনও আমার মনে আছে। শুনলাম যে যখন ঝড়বৃষ্টি থামল, ধ্বস নেমে রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য কিছুই শহরে আসার উপায় ছিল না। এই সুযোগে দোকানীরা জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বাড়িয়ে দেয়। আমাদের বাড়িতে যেসব পাহাড়ী লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল খাদ্যসঙ্কটের সময় আমার স্ত্রী তাদের বললেন যে তিনি টাকা দিতে রাজী আছেন; কিন্তু জিনিসপত্র তো সহজে মিলছে না, কাজেই খাবার ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করতে হবে। এই কথা শুনে তারা দোকানীদের কাছে গিয়ে বলল—তোমরা এই মাল তো অনেক আগে কিনেছ। এখন সাবেক দামে যদি না দাও তো আমরা মালপত্র লুট করে নিয়ে যাব। আরও কিছু পাহাড়ী লোকেরা নাকি অন্য দোকানীদেরও এই ভাবে শাসিয়েছিল। তাতেই অবশ্য কাজ হল।

১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বরে কনস্ট্যান্টিনোপলে International Congress of Orientalists-এর অধিবেশন হয়। আমি নিমন্ত্রিত এবং ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলাম। আমি ছাড়া আরও কয়েকজন ভারতীয় সরকারী প্রতিনিধিরূপে এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জনের নাম মনে আছে; তাঁরা হলেন মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে এবং ডঃ ডি. আর. ভণ্ডেকার। ১২ই সেপ্টেম্বর আমরা একসঙ্গে কনস্ট্যান্টি-নোপলে পেঁছিলাম।

কনস্ট্যান্টিনোপলের কথা ইতিহাসে বহু পড়েছি, মধ্যযুগের ইতিহাসে এই শহরটির বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। যে গ্রীকো-রোমান সভ্যতা বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরেও বহুকাল পাশ্চাত্যের সভ্যতার ধারক ছিল, তার স্নায়ু-কেন্দ্র হল কনস্ট্যান্টিনোপল। এই স্থানটি প্রকৃতির দ্বারা এমনভাবে সুরক্ষিত

যে তুর্কীরা এশিয়া মাইনর পর্যন্ত জয় করেও সংকীর্ণ জলাশয়ের অপর পারের এই শহরটি বহুদিন পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও দখল করতে পারেনি। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা এই শহর জয় করতে সমর্থ হয়। এই তুর্কী বিজয়ের ফলেই গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত বহু গুণী ব্যক্তি কনস্ট্যাণ্টিনোপল ছেড়ে পশ্চিম ইয়োরোপে চলে আসেন ; ফলে ইয়োরোপে এক নূতন যুগ—Renaissance-এর সূচনা হয়। কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতন ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্য যুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে ধরা হয়।

তুর্কীদের দখলে আসার পর কনস্ট্যাণ্টিনোপলের নূতন নামকরণ হয় ইস্তাম্বুল। তুর্কীর সুলতান মুসলমানদের খলিফা হওয়ার ফলে ইস্তাম্বুল শহর মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইস্তাম্বুলের অনেক মসজিদ প্রাচীন ও নবীনের সংযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সবচেয়ে বড় রোমান ক্যাথলিক গীর্জাটির কিছু পরিবর্তন করে মসজিদ করা হয়েছে ; সেটি এখনও অনেকটা অক্ষতভাবেই আছে। সেটি দেখলে এখনও মধ্যযুগের স্থপতি-শিল্পের কতকটা ধারণা করা যায়। কনস্ট্যাণ্টিনোপলে এই রকম অনেক পুরনো স্মৃতি আছে।

International Congress of Orientalists একটি বহুকালের পুরনো প্রতিষ্ঠান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই সভায় একবার যোগ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর নানা জায়গায় এর অধিবেশন হয়। এবারের অধিবেশনে ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রতিনিধি এসেছিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনের পরেই ব্যবস্থা হল যে অনেকগুলি শাখা-অধিবেশন হবে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যে শাখা-অধিবেশন হয় আমি তার সভাপতি ও মূল কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশের Oriental Conference-এর মতনই এখানে সাধারণতঃ লিখিত প্রবন্ধ পড়া হল এবং সে বিষয়ে কিছু আলোচনাও হল। এই অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পরে ছাপা হয়েছে ; সুতরাং এখানে সবিস্তার তা উল্লেখ করার দরকার নেই। এবারেও ঐ কংগ্রেস শেষ হলে সোজাসুজি ভারতে ফিরে না এসে আমি ইয়োরোপের অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

ঐ কংগ্রেসে যোগদানের ফলে আমি Bureau of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies-এর সভ্য নির্বাচিত হই এবং পর বৎসর প্যারিস শহরে এই Council-এর দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করি (২২শে থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

দেশভ্রমণ ও অন্যান্য কর্ম—পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা

১৯৫৫ সনে আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন কলকাতায় আমার দৌহিত্রীর বিবাহ স্থির হয়। এই বিবাহে যোগ দেবার জন্য আমি ও আমার স্ত্রী মোটরে কলকাতায় আসব স্থির করলাম। এই মোটরভ্রমণে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। উত্তর ভারতের প্রায় হাজার মাইল পথ মোটরে আসার সময় ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে যে একটি স্পষ্ট ধারণা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, রেলভ্রমণে তা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

দিল্লী থেকে বিকেলে যাত্রা করে,আলিগড়ে রাত্রিযাপন করি; এক ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করা ছিল। সেখান থেকে কনৌজ দেখতে যাই; জায়গাটি বড় রাস্তা থেকে বেশী দূরে নয়। প্রাচীন কান্যকুব্জ ভারতের ইতিহাসে বিশেষ একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। সেখানে অনেকগুলি বড় বড় ঢিবি দেখলাম; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে সেগুলি খননের কোন ব্যবস্থা নেই; এমন কি তাদের পরিচয়-লিপিও কোথাও লেখা নেই। কত প্রাচীন গৌরব-কীর্তি এই ধ্বংসাবশেষগুলি মাটির নীচে গোপন করে রেখেছে!

কনৌজ থেকে কানপুর; এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে আমার থাকার ইচ্ছা ছিল। মিশনের কর্তৃপক্ষকে চিঠিও লিখেছিলাম। তাঁরা আমার পরিচিত। গিয়ে শুনলাম আশ্রমের নিয়ম অনুসারে কোন স্ত্রীলোক সেখানে রাত্রে থাকতে পারবেন না। সেজন্যে আশ্রমের অধ্যক্ষ আশ্রমের ঠিক পাশেই এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, সেখানে আমাদের আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি।

কানপুর থেকে রওনা হয়ে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে বিখ্যাত রেসিডেন্সি বিল্ডিংটি দেখলাম। আরও দু' একটি জায়গা দেখে এলাহাবাদে এসে পৌঁছলাম দুপুরবেলা। সেখানে এক বাঙালী জজ, আমার বিশেষ বন্ধুর জামাতা, পূর্বেই আমন্ত্রণ করেছিলেন। এলাহাবাদ শহর পূর্বেই আমার দেখা ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে কাশীতে রাত্রিযাপন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে তখন আমার পুরাতন ছাত্র অর্থনীতির অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত থাকত। আমরা সেই বাড়িতেই উঠলাম। পুরনো অনেক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল।

এরপর ডেহরি-অন-শোণ এ এসে শোণ নদ পার হতে হয়। সব সময় মোটর পারাপার হয় না। সরকারী কর্মচারীদের অনুমতি দরকার, টাকা জমা দিতে হয়। আমি অফিসে গিয়ে দেখা করলাম। ছোট অফিস, একজন বেহারী ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তিনি আমাকে একটি কাগজে সই করতে বললেন। আমার সই দেখে তিনি বললেন—আপনি কি Brief History of India বই লিখেছেন? আমি ঐ বই পড়ে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছি। আমি 'হ্যাঁ' বলাতে তিনি তৎক্ষণাৎ আমার গাড়ী পার করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমার স্ত্রী বললেন, বড় বই লিখে যা কাজ না হয় স্কুলের বই লিখে দেখছি তার চেয়ে বেশী উপকার হয়।

শোণ নদ পার হয়ে একটি সরকারী ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা ছিল। ক্যানালের ধারে অতি চমৎকার বাড়ি। সেই ডাকবাংলোর কথা আজও আমার মনে আছে।

পরের দিন রাত্রে যে জায়গায় এক ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিলাম তার নাম বারি। এখান থেকে মাইথন ও তিলাইয়া—দামোদর পরিকল্পনার এই দুটি বাঁধ দেখতে গেলাম। পথে আরও এক জায়গায় থেমেছিলাম—তোপচাঁচি লেক। এটি একটি নাতিবৃহৎ হ্রদ, চারধারে রাস্তা; মোটরে ঘুরে দেখলাম।

সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন। এখানে তখন আমার কন্যা জামাতা ছিল। একদিন বিশ্রাম করে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম দিল্লী ছাড়ার ঠিক ছয় দিন পরে।

এই সময়কার আর একটি ঘটনার কথা এবার বলছি। ভারত সরকার হঠাৎ আমাকে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্য নিযুক্ত করলেন। এর কিছুদিন পরেই আমাকে নাগপুরে চাকরি নিয়ে চলে যেতে হয়। তবে গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটিতে যে কয়মাস কলকাতায় থাকতাম তখন ফিল্ম শো থাকলে নিয়মিত তা দেখতে যেতাম।

ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্যদের কাজ হল নতুন তৈরি কোন ফিল্ম জনসাধারণের কাছে দেখান যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে মতামত দেওয়া। ফিল্ম তৈরি হলেই আগে সেটি সেন্সর বোর্ডের সভ্যদের কাছে দেখান হয়। সভ্যরা কোন আপত্তি করলে ফিল্মের প্রযোজক সেটি সংশোধন করবেন—এই নিয়ম। এই সংশোধিত ফিল্মটি আবার সভ্যদের দেখাতে হবে; তাঁদের কাছে থেকে ছাড়পত্র পাবার পরে সেটি সাধারণের কাছে দেখান যাবে। নতুন তোলা ছবি দেখতে গিয়ে দেখলাম সভ্যদের বিভিন্ন মত। প্রধানতঃ শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন, এ ছাড়া পোষাক ও নানা আনুষঙ্গিক ছোটখাট বিষয়ে মতভেদ। একজন বললেন বেশী আপত্তি করলে প্রযোজকরা ছবি বোম্বাই সেন্সর বোর্ড থেকে পাশ করিয়ে আনবে। তখন নিয়ম ছিল ভারতের যে কোন ফিল্ম সেন্সর বোর্ড পাশ করলেই সে ছবি দেশের সর্বত্র দেখান যেত। আমাদের আপত্তিতে মাঝ থেকে বরং বাঙালী প্রযোজকদের টাকা কিছু বেশী খরচ হবে। এ সত্বেও আমরা প্রয়োজন

হলে আপত্তি জানিয়েছি। দু'একবার এ নিয়ে বেশ হাঙ্গামা বাধে, আমার বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখিও হয়।

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে একটি ছবিতে দেখান হয় এক যুবতী রমণী মহাপ্রভুর সামনে নৃত্য করছেন, শ্রীচৈতন্য তা উপভোগ করছেন। আমি এতে আপত্তি করলাম, বললাম, এ'টি ইতিহাসের বিরুদ্ধে। কারণ শ্রীচৈতন্য পরস্ত্রীর মুখ পর্যন্ত কখনও দর্শন করেননি; তিনি ঐ ভাবে নর্তকীর নৃত্য দেখবেন এটা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। ইতিহাসে কোথাও এর সমর্থন নেই। এ দৃশ্য ছবিতে থাকলে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের মনে ভীষণ আঘাত লাগবে; আমি কিছুতেই এ ছবি দেখানর অনুমতি দিতে পারি না।

আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন সভ্য ঐ অংশটি বাদ দিতে হবে বলে আপত্তি জানালেন। এই ছবির প্রযোজক ছিলেন কলকাতার একজন মস্ত ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তি। নৃত্য অংশ বাদ দেওয়াতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। আমার নাম করে তিনি বোর্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে লিখলেন আমার কথার প্রমাণ কি? উত্তরে আমি জানালাম যে চৈতন্য ভাগবতে আছে যে শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ ছিল তিনি বা তাঁর ভক্ত কেউ স্ত্রীমুখ দেখবেন না। তাঁর প্রিয় ভক্ত হরিদাসকে মহাপ্রভু এই অপরাধে শাস্তিও দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এই—একদিন খেতে বসে শ্রীচৈতন্য দেখলেন খুব ভাল চালের অন্ন পরিবেশন করা হয়েছে। তিনি বললেন, আজকের চাল কি উৎকৃষ্ট! কোথা থেকে পাওয়া গেল? হরিদাস বললেন, আমার এক ভক্ত নারী আছেন। তিনি এই চাল দিয়েছেন। মহাপ্রভু বললেন, কে দিয়েছে তুমি জানলে কি করে? তুমি তাকে দেখেছ? হরিদাস বললেন—হ্যাঁ। মহাপ্রভু বললেন, তবে তো তোমাকে আর আমার সঙ্গে রাখতে পারি না।

"হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ
হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন।"

এর পর থেকে সত্যিই তিনি আর হরিদাসের মুখ দেখতেন না। মনের দুঃখে ভক্ত হরিদাস গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।

আমার এই আপত্তির বিস্তারিত কারণ বোর্ড ছবির প্রযোজকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রযোজক উত্তরে বললেন যে ভাগবতে আছে শ্রীচৈতন্য নারীর স্কন্ধে চেপে জগন্নাথদেব দর্শন করেছিলেন, কাজেই শ্রীচৈতন্য নারীর মুখ দেখেননি—একথা ঠিক নয়।

চৈতন্য ভাগবতের সংশ্লিষ্ট অংশটির প্রতি আমি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীধাম পুরীতে শ্রীচৈতন্য যখন এসে পৌঁছেছেন তিনি তখন খুবই শ্রান্ত। পৌঁছেই তিনি জগন্নাথদেব দর্শন করবেন বলে অস্থির হয়ে উঠলেন। তখনই তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল। মন্দিরে তখন খুব ভীড়। তাঁরা এসে সবার পিছনে দাঁড়ালেন। ভালভাবে দেবদর্শনের জন্য মহাপ্রভু সামনে যিনি ছিলেন (একজন রমণী) তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে উঁচু

হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাগবতকার ঘটনাটি বর্ণনা করেই লিখেছেন যে মহাপ্রভু তখন দেবদর্শনের জন্য ব্যাকুল। সামনে পুরুষ কি স্ত্রী কে দাঁড়িয়ে আছে, এ জ্ঞান তাঁর ছিল না। ভাগবতকারের ব্যাখ্যা যে আমার আপত্তির অনুকূলেই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার এই আপত্তির কথা বাইরে কি ভাবে প্রকাশ পায়। বহু বৈষ্ণবের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র সরকারের কাছে এসে পৌঁছয়। তাতে লেখা ছিল, এ ছবি দেখান হলে বৈষ্ণব ধর্মে আঘাত দেওয়া হবে; এটা বৈষ্ণবেরা সহ্য করবেন না। দরকার হলে তাঁরা বলপ্রয়োগ করে এ ছবি দেখান বন্ধ করবেন।

এই রকম ইতিহাস-বিরোধী ঘটনা দেখানর জন্যে আরও কয়েকবার আমি আপত্তি তুলেছিলাম। সেই সব অংশ পরিবর্তন করা হয়েছিল। তিন বছর আমি এই ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্য ছিলাম। মেয়াদ শেষ হলে যখন চলে আসি বোর্ডের অধিকর্তা বললেন, এখন বুঝতে পারছি সেন্সর বোর্ডে একজন ঐতিহাসিক সভ্য থাকা কি রকম দরকার।

ইতিপূর্বে দেশ-বিদেশে নানা স্থানে ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেছি। রাজগীরের কথা সে-সময়ে বলা হয় নি। কয়েকটি কারণে আমার রাজগীর-ভ্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে এবার সে-কথা বলা হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় প্রায় সাত-আট বছর ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমি সপরিবারে রাজগীর যাই; সেখানে প্রায় দু'মাস ছিলাম। রাজগীর উষ্ণ জলধারার জন্য বিখ্যাত। পাহাড়ের গা থেকে উষ্ণ জলধারা সারাক্ষণ প্রবাহিত হয়। স্নানের জন্য সংকীর্ণ সমতল জায়গায় পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি নল বসান আছে; এই নলের ভিতর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তার নীচে বসে পালাক্রমে একজনের পর আর একজন স্নান করে। লোকের বিশ্বাস, এই জলে স্নান করলে শারীরিক অনেক ব্যাধি দূর হয়। এর কিছু নীচে কুণ্ড; বড় একটা চৌবাচ্চার মত। কুণ্ডের গরম জলে ডুব দিয়ে স্নান করা যায়। এই সব স্থানে স্নান করার জন্য বহু যাত্রী প্রতি বছর রাজগীরে আসেন। আমিও স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানরূপেও রাজগীরের বিশেষ খ্যাতি আছে। রাজগৃহ বা রাজগীর ছিল প্রাচীন মগধের রাজধানী। সপ্তগিরিবেষ্টিত রাজগীরের উল্লেখ ও বর্ণনা বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সাতটি পাহাড় এখনও একটি বিস্তৃত প্রান্তরকে ঘিরে রয়েছে। এই প্রান্তরের মধ্যেই প্রাচীন রাজগৃহ ছিল এবং তার মধ্যে দুটি পাহাড়ের সংযোগস্থলে সম্ভবতঃ অনুচ্চ ও অপ্রশস্ত খানিকটা পাহাড় কেটে ঐ প্রান্তরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ প্রাচীন রাজগৃহ নগরে যাওয়ার যে রাস্তা তৈরী হয়েছিল তা এখনও বর্তমান। সেই পথ দিয়েই প্রান্তরে প্রবেশ করতে হয়।

দীর্ঘ দু'মাস ওখানে থাকার সময় আমি তন্ন তন্ন করে রাজগীরের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। এর ফলে ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত অনেকগুলি স্থান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়।

প্রথমে সপ্তপর্ণী গুহা দেখতে যাই। এখানে বুদ্ধদেবের দেহাবসানের অনতিকাল পরেই তাঁর শিষ্যরা সমবেত হয়ে বুদ্ধের উপদেশাবলী সঙ্কলন করেন। বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণনা আছে যে, এ সময় পাঁচ ছয় শত বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে উপস্থিত ছিলেন। গুহাটি আয়তনে বড় হলেও তার মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের বেশি লোকের বসে থাকা সম্ভব নয়। এই গুহার সামনে পাহাড়ের গায়ে একটি অপ্রশস্ত বারান্দার মত জায়গা আছে। সেখানেও কুড়ি পঁচিশ জনের বেশি লোক বসতে পারে না। সুতরাং এই সপ্তপর্ণী গুহায় বা তার নিকটে যে বৌদ্ধ সঙ্গিতী বা ধর্মসভার অধিবেশন হয়েছিল তা বিশ্বাস করতে হলে বলতে হয় যে, এই সভায় শতাধিক লোকের সমাগম হয়নি। তবে অসম্ভব নয় যে, এই গুহার নীচে কোন এক স্থানে এই মহাসভার অধিবেশন হয়েছিল। কিন্তু যদি তা হয় তবে সে স্থানটি এই গুহা থেকে বেশ কিছু দূরে হবে। কারণ বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে ঐ গুহার কাছে এমন কোন সমতল জায়গা নেই যেখানে পাঁচ ছ'শ লোকের অধিবেশন হতে পারে।

শোণভাণ্ডার গুহা বলে আর একটি গুহা আছে, সেটি অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু সেখানেও কোন বৃহৎ সভার অধিবেশন সম্ভব নয়। সুতরাং বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের অব্যবহিত পরেই বৌদ্ধ গ্রন্থে বৌদ্ধভিক্ষুগণের মহাসভার অধিবেশনের খুঁটিনাটি যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সত্যতা সম্পর্কে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিল।

রাজগীরের আরও কয়েকটি গুহা দেখেছি। রণভূম নামে এক স্থানে একটি গুহার দেয়ালে যে শিলালিপিটি পরিষ্কার ভাবে খোদিত আছে তার যতদূর পাঠোদ্ধার করেছিলাম তা এই: "নির্বাণ লাভায় তপস্বীযজ্ঞে (?) শুভে গুহে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আচার্য রত্নমুনী বৈরদেব বিমুক্তয়ে" ইত্যাদি।

এই পাঠ যে একেবারে বিশুদ্ধ তা মনে হয় না। আমার কাছে শিলালিপির স্ট্যাম্প নেবার কোন উপকরণ ছিল না; পরে আর তা ভালভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয় নি। কিন্তু এই লিপির মোটামুটি তাৎপর্য এই যে, এই সমস্ত গুহা নির্বাণলাভের জন্য তপস্যার উপযুক্ত স্থান এবং সে কারণেই তপস্বীদের জন্য এগুলি নির্মিত হয়েছিল। এবং কোনকালে এখানে কোন দেবদেবীর প্রতিমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থে উক্ত পিপ্পলবন, বিপুলাগিরি, বৈভবগিরি, গৃধ্রকূট প্রভৃতি স্থান এখনও বেশ চেনা যায়। এর মধ্যে গৃধ্রকূট স্থানটি একটি সুউচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। প্রসিদ্ধি আছে যে স্থানটি গৌতম বুদ্ধের খুব প্রিয় ছিল। বহু কষ্টে পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠেছিলাম। সেখানে আমও

কয়েকটি গুহা দেখা যায়। এই শীর্ষদেশ থেকে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম।

রাজগীর থেকে ফিরে আসার পর শুনেছিলান যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একজন জাপানী সেনাপতি বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে রাজগীরে ছিলেন। রাজগীরে আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেটি দোতলা ; একতলায় আমরা থাকতাম। দোতলায় একটি বুদ্ধমূর্তির পূজা হত। পূজার ব্যয় নির্বাহ হত বিড়লাদের সাহায্যে। বিশ্বানন্দ নামে এক বাঙ্গালী সাধুর উপর এই পূজার ভার ছিল। ঐ জাপানী ভিক্ষুটি পূজাকক্ষের পাশে দোতলায় একটি ঘরে থাকতেন এবং মাঝে মাঝে গৃধ্রকূট পাহাড়ে যেতেন। পরে জানা গেল যে তিনি গৃধ্রকূট থেকে বেতারযোগে কলকাতা এবং ভারতবর্ষের সমস্ত খবর জাপান সরকারকে পাঠাতেন। এই সংবাদ জানার পর ভারত সরকার সাধু বিশ্বানন্দকে গ্রেপ্তার করে। তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। গৃধ্রকূট তপস্যার পক্ষে যেমন উপযুক্ত স্থান, বেতারে গোপন সংবাদ পাঠানর পক্ষেও তেমনি। কালের ব্যবধানে একই স্থান কিভাবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে উক্ত কাহিনী শোনার পর আমার তা মনে হত।

বেণুবন ও পিপ্পলবন প্রভৃতি স্থানেও অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন চোখে পড়েছে। প্রাচীন কয়েকটি মূর্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকতে দেখেছি। যে সাতটি পাহাড় রাজগীরকে ঘিরে আছে তার দু' একটির উপরে উঠে এক সুদৃঢ় প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। নগরটি যে সুগঠিত ও সুরক্ষিত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। এর নিকটে বানগঙ্গা নামে একটি নদী। সেটি দেখতে যাওয়ার পথে একটা জঙ্গলা জায়গায় হঠাৎ হোঁচট লেগে পড়ে গেলাম। খোঁজ করে দেখলাম স্থানটি এক প্রাচীন জলাধারের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এবং বিশেষ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে পাহাড়ের গা থেকে স্বাভাবিক একটি প্রস্রবণের জল নেমে এখানে জমা হত। এটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, রাজগীরে অনেক প্রাচীন স্থানের ধ্বংসাবশেষ এখনও লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছে। অনেক প্রাচীন স্থান এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, যথাযোগ্য অনুসন্ধান করলে সেগুলির আবিষ্কার হতে পারে। ফিরে এসে আমি পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করি।

এই প্রান্তরের অনতিদূরে নূতন রাজগীর নির্মিত হয়েছে এবং তারই চারপাশে বর্তমান রাজগীর নগরী গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মদেশের একটি বড় মন্দির ও সাধুদের আশ্রম তখন এখানে ছিল ; হয়ত এখনও আছে।

রাজগীরে উষ্ণ প্রস্রবণের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যে ছোট পাহাড়ে এই জলধারা প্রবাহিত তার এক কোণে যে কয়েকটি মূর্তি আমার চোখে পড়েছে সেগুলি প্রাচীন ও গুপ্তযুগের স্মৃতিচিহ্ন বলেই আমার মনে হয়। কয়েকটি লিপিও পাহাড়ে খোদিত আছে। এগুলির পাঠোদ্ধার করতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে

অনুরোধ করেছিলাম ; কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কাজে পরিণত হয়েছে কিনা জানি না।

রাজগীর থেকে নালন্দা খুব বেশি দূর নয়। মোটরে কয়েকবার নালন্দা গিয়েছি। নালন্দার বিস্তৃত বিবরণ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে ছাপা হয়েছে ; তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

এখান থেকে পাটনা গিয়ে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখি। এই স্থানটি বর্তমানে কুমরাহার নামে পরিচিত। এর কাছে বুলন্দিবাগ। প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তারও বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

রাজগৃহ থেকে ফিরে এলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৯)। আসবার পর সবচেয়ে বড় কাজ হল পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে যে সব বাস্তুহারা কলকাতা এসেছিল তাদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে কিছুদিন আগে থেকেই জড়িয়ে পড়েছিলাম। স্বাধীনতার প্রথম বলিদান পূর্ববঙ্গের অসংখ্য নরনারী, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু। যেভাবে এরা প্রথমে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও প্রহৃত এবং পরে বিতাড়িত হয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় একবস্ত্রে ভারতের সীমান্তে পৌঁছেছিল, তা চিরদিন স্বাধীন ভারতের কলঙ্ক ও নেহরু সরকারের পরম ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার চরম নিদর্শনরূপে ভারতের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে। আর এই অবস্থা একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবার ঘটেছে—কিন্তু ভারত সরকার চিঠিতে প্রতিবাদ জানান ছাড়া আর কিছুই করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ঠিক সেই নীতির অনুসরণ বা অনুকরণ করেন। দক্ষিণ কলকাতায় এই বাস্তুহারাদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়—আমি তার একজন সদস্য ছিলাম। লীলা রায়, মেঘনাদ সাহা এবং আরও কয়েকজন এর সভ্য ছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা বাহুল্য ; আমার নিজের দুটি অভিজ্ঞতার কথা শুধু বলব।

১৯৪৯ সনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাস্তুহারাদের দুর্দশা এবং তাদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে অনেক অভিযোগের কথা শুনে নিজে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য কলকাতায় এলেন। আমাদের সমিতির কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন ; কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা সেটা বন্ধ করবার বহু চেষ্টা করেন। অনেক কষ্টে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া গেল। ১৪ই জুলাই সকালে আমরা দু'তিন জন পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি আরও দু'জন লোক সেখানে বসে আছেন—একজন গান্ধীজির পরম ভক্ত এবং বাংলা দেশের সুপরিচিত নেতা, দ্বিতীয় জন এক ভদ্রমহিলা—তিনি মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়া। এঁদের দু'জনের উপরেই বাস্তুহারাদের তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছিল। অবশ্য তাঁদের অধীনে আরও বহু তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং সরকারের টাকাও ব্যয় (অপব্যয় ?)

হয়েছে যথেষ্ট ; অথচ সুব্যবস্থার অভাবে বাস্তুহারাদের দুর্দশার অবধি ছিল না। পণ্ডিতজীর কাছে আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে এসব অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতেই এঁরা তার প্রতিবাদ করলেন। আমি পণ্ডিতজীকে বললাম যে আমি জানতে চাই এই ভদ্রমহিলা ক'টি মেয়েদের ক্যাম্প নিজে দেখে এসেছেন। নেহরু তাঁর দিকে চাইলেন, তিনি মাথা নীচু করে রইলেন। তখন আমি বললাম যে সাক্ষাতের সময় মাত্র পনেরো মিনিট, এরই মধ্যে আমি কয়েকটি রিফিউজি ক্যাম্পে নিজে যা দেখেছি তাই আপনাকে জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে আমাদের সমিতির রিপোর্ট ছিল—তার সাহায্যে কোন তারিখে কোন ক্যাম্পে গিয়ে কি দেখেছি তার বর্ণনা করলাম। গান্ধীশিষ্য ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললাম যে এ বিষয়ে কতটুকু সংবাদ উনি নিজে জানেন বা খোঁজ নিয়েছেন তাও জানতে চাই। তিনি বললেন—আমি বহু ক্যাম্প দেখেছি—দুঃখ দুর্দশা আছে—কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি কয়েকটি ক্যাম্পের উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলাম—এদের সম্বন্ধে আপনি কি করেছেন? অথচ এসব ক্যাম্পের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ তো আপনার কাছে পাঠান হয়েছে। তিনি বললেন, তাঁর কিছু মনে পড়ছে না! আমি পণ্ডিতজীকে বললাম—আপনি যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে চান, তবে চলুন এখনই কোন নোটিশ না দিয়ে কয়েকটি ক্যাম্পে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব। এমন সময় পণ্ডিতজীর সেক্রেটারী এসে জানালেন যে আমাদের সাক্ষাৎকারের নির্ধারিত সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। পণ্ডিতজী বললেন, না, আমার আরও অনেক কথা জানবার আছে। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। পণ্ডিতজী বললেন—আপনি যা যা বললেন, এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে আমার সেক্রেটারীকে দেবেন। সেক্রেটারীকেও ডেকে তিনি সেকথা বললেন। বেরিয়ে এসে ঘড়ি দেখলাম—পনেরো মিনিটের জায়গায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমি সেক্রেটারী ভদ্রলোককে বললাম যে সমিতির পক্ষ থেকে বিবরণ লিখে টাইপ করতে হবে, আজকের মধ্যে পেরে উঠব না—কাল কোন সময় কিভাবে এটা পাঠাব? এই সব কথা বলছি এমন সময় পূর্বোক্ত ভদ্রমহিলাটি ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে বললেন—আপনারা যদি বলেন তবে আমি পদত্যাগ করতে রাজী আছি। আমি বললাম—আমার যা বলা কর্তব্য আমি তা বলেছি। এবার আপনার যা কর্তব্য তা আপনিই ঠিক করবেন ; আমার কিছু বলবার নেই।

এবারে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথাটি বলি। যখন দলে দলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লোক আসতে লাগল তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তাদের মাথা গুঁজে থাকবার ব্যবস্থা করা। গত মহাযুদ্ধের সময় ঢাকুরিয়া লেকের ধারে আমেরিকান সৈন্যদের থাকবার জন্য অনেকগুলি টালি ও ইটের বাড়ি তৈরি হয়েছিল (তার কিছু কিছু এখনও আছে)। সমিতির পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব করলাম যে ঐ বাড়িগুলি

উদ্বাস্তুদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হোক। মুখ্যমন্ত্রী রাজী হলেন না; যুক্তি দেখালেন যে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসবে এটা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে। বললাম যে নীতির চেয়ে বাস্তব ঘটনা অনেক বড়। লোক দলে দলে দেশ ছেড়ে আসছে এবং আরও আসবে—এদের থাকবার ব্যবস্থাটা করাও শাশ্বত মানব-নীতির অনুমোদিত। আমরা টাকা পয়সা যেভাবে হয় যোগাড় করব, কিন্তু বাসস্থান যোগাড় করা শক্ত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই রাজী হলেন না।

এই প্রসঙ্গে অর্থ-মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলাম। কিন্তু তাঁরও নীতি ঠিক একই। তবে তাঁর একটি উক্তি তিরিশ বছর পরে আজও আমার মনে আছে। তিনি আমার জেলারই লোক—যেখানে শতকরা সত্তর জন বাসিন্দা মুসলমান। আমি বলেছিলাম এ অবস্থায় যে-হিন্দুরা ওখানে থাকবে তাদের বেশীর ভাগই মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি অম্লান বদনে বললেন—হয় হবে। এর উপর টীকা অনাবশ্যক।

এ প্রসঙ্গ আর বাড়াব না। দীর্ঘকাল সংবাদপত্রে এবং সাময়িক পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি এবং প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছি যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বিনিময় (exchange of population) ছাড়া এর প্রতীকারের আর কোনও উপায় নেই। দু'বছর আগে যখন বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্রোহ চলছিল এবং লক্ষাধিক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল, তখনও আমি এই মত ব্যক্ত করে সংবাদপত্রে লিখেছি এবং বলেছি এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ—বাংলাদেশ এখন ভারতবর্ষের সাহায্যপ্রার্থী—সাহায্য না পেলে তাদের উদ্ধার নেই। এ সময়ে যদি প্রস্তাব করা যায় যে সীমান্তের খানিকটা অংশ হিন্দুদের বসবাসের জন্য তারা ভারতকে ছেড়ে দিক এবং তার বদলে পশ্চিম বঙ্গের যেসব মুসলমান বাংলাদেশে যেতে চায় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করুক, তবে বাংলাদেশ তাতে মোটামুটি রাজী হতে পারে। কিন্তু এসব কথায় অন্য লোক দূরে থাকুক বাঙ্গালী রাজনীতিক ও পুরানো বিপ্লবী দলেরও সমর্থন পাইনি। তখন তারা সকলেই মনে মনে এই আশা পোষণ করছেন যে এইবার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন হল তা 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ'—অর্থাৎ আকাশে যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন বজায় থাকবে। এর জন্যে অনেক সভা সমিতি অনুষ্ঠান হয়েছে—আমাকে তাতে আমন্ত্রণ করতে এসেছে। আমি বলেছি—পাঁচটা বছর অপেক্ষা করুন। দু'একজন মন্তব্য করেছে—আপনি বিশ বছর ঢাকায় থেকেও এই কথা বলছেন? আমি বলেছি—আমি একুশ বছর ঢাকায় ছিলাম বলেই একথা বলছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী বন্ধুর ন্যায় পাশাপাশি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে, কিন্তু ভাই ভাই হয়ে এক বাড়িতে বা এক রাজ্যে বাস করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তা চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে—অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবারের ভাব দূরের কথা প্রতিবেশীসুলভ বন্ধুত্বও বজায় থাকবে না।

ছ'-সাত মাস আগে (১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি) আমার বাড়ির খুব কাছেই একটি বাড়িতে ভূতপূর্ব প্রবীণ বিপ্লবীদের একটি সম্মেলন হয়েছিল। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গ নিয়ে সেখানে অনেক আলোচনা হয়। আমার পূর্বোক্ত মত আমি যুক্তিতর্ক দ্বারা সমর্থন করলাম। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেরই জন্ম পূর্ববঙ্গে। যে কয়েকজন এখনও পূর্ববঙ্গে বসবাস করছেন তাঁরা সকলেই আমার মতের সমর্থন করলেন। কিন্তু যাঁরা বহুদিন যাবৎ কলকাতায় আছেন এবং পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই তাঁরাই বিরুদ্ধ মত দিলেন যে হিন্দুদের বাংলাদেশেই বসবাস করা উচিত। তাঁদের ভাবটা মনে হল এই যে, যদি আমরা ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা আনতে পেরে থাকি তবে মুসলমানদের কাছে ন্যায্য অধিকারের দাবী জানাতে ও তা আদায় করতে পারব না কেন। আমি খুব মৃদুস্বরে এর উত্তরস্বরূপ নিবেদন জানালাম যে আশা করি তাঁরা এবার বাংলাদেশে গিয়ে বসবাস করবেন। সভার শেষে কুমিল্লাবাসী একজন প্রবীণ হিন্দু বিপ্লবী আমাকে বললেন যে তিনি আমার মত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং বাংলাদেশে যে-সব হিন্দুরা এখনও আছেন তাঁদেরও এই মত! কলকাতায় বসে যাঁরা আপনার বিরোধিতা করলেন তাঁরা দেশের খাঁটি খবর রাখেন না এবং দেখে নেবেন তাঁরা কখনও বাংলা-দেশে ফিরে যাবেন না।

ইতিহাসের শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মুজিবর রহমান যত চেষ্টাই করুন এবং সংবিধানে সাম্প্রদায়িক ভেদ বিলোপ করে এক-জাতীয়তা স্থাপনের আদর্শ প্রচার করুন—হিন্দু-মুসলমান তুল্য অধিকার নিয়ে সুখে শান্তিতে একত্রে বাংলাদেশে বসবাস করতে পারবে—এ আশা খুবই কম। মুজিবর রহমানের উদ্দেশ্য মহৎ এবং তিনি যে আন্তরিকতার সঙ্গেই এই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হবেন—এ বিষয়ে আমি কোন সন্দেহ করি না। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান। সুতরাং তিনি যে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন ঘটাতে পারবেন—এরূপ আশা সুদূরপরাহত। অন্ততঃ দশ বছর না গেলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গে যে ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমানের চিরন্তন ঐক্য ও মিলনের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এর:মধ্যেই তা বেশ কিছুটা ম্লান হয়ে এসেছে। যে-সব হিন্দু এখনও বাংলাদেশে আছেন তাঁদের যে কজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে বাংলাদেশে হিন্দুরা মান সম্মান ও তাদের ন্যায্য রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিয়ে থাকতে পারবে না। যদি তা সম্ভব হয় তবে সেটা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয় হবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কতদূর সম্ভব, অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সেটির আলোচনা আবশ্যক।

পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর পঁচিশ বছর যাবৎ হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার বিস্তৃত কাহিনী আজও প্রকাশিত হয়নি। স্বনামধন্য বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) তাঁর "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ তিনি নিজে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেও জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ছিলেন এবং মৃত্যুর অল্প কয়েক মাস আগে কলকাতায় এলেও আবার ঢাকায় ফিরে যাবেন এই সংকল্পই করেছিলেন। বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি হিন্দুদের প্রতি মুসলমান সরকার ও সম্প্রদায়ের যে অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন—তার জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরাই যে দায়ী এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে হয়তো উদাসীন ছিলেন; এবং তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পরোক্ষ সহানুভূতি ছিল তথাপি মূলতঃ যে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের মুসলমানেরাই এ বিষয়ে যথার্থ অপরাধী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে কারণে তারা তখন হিন্দুদের দূর করে দিতে ব্যস্ত ছিল সে কারণ আজও বর্তমান আছে এবং বহুদিন পর্যন্ত থাকবে। সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ। অর্থাৎ, হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই তাদের বাড়িঘর জমিজমা নগদ টাকা পয়সা সব অনায়াসে দখল করা যাবে, চাকরি বাকরির সম্বন্ধেও মুসলমানদের সুবিধা, ইত্যাদি। যে সব বাড়িঘর জমিজমা মুসলমানেরা দখল করেছে আজ মুজিবর রহমানের নির্দেশে তারা তা স্বেচ্ছায় বা সহজে ছেড়ে দেবে—এ আশা করা যায় না। কারণ মনুষ্যত্বের দাবিতে নিজের স্বার্থের দাবি বলি দেবে এরূপ মানুষের সংখ্যা সর্ব দেশে সর্ব সম্প্রদায়েই খুব কম। পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানদের কাছে এটা প্রত্যাশা করা যায় না। আইন করে শতকরা নব্বই জনের স্বার্থের হানিকর কোন ব্যবস্থা চালু করাও সম্ভব নয়। সুতরাং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থাকবে।

১৯৪১ সনের কথা বলতে বলতে বর্তমানে এসে পৌঁচেছি; আবার ১৯৪১ সনে ফিরে যাই। এই বছরে (১৯৪৯) পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে অনেক কমিটি ও কনফারেন্স হয়েছিল, তাতে আমি যোগ দিয়েছিলাম। East Bengal Minority Welfare Committee-র একাধিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছি। বিশেষ কোন ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। যতদূর খবর সংগ্রহ করেছি তাতে আমার বিশ্বাস, বাস্তুহারাদের অশেষ দুর্গতি হয়েছিল এবং তার প্রধান কারণ সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা ও সততার অভাব। সরকারের যে টাকা খরচ হয়েছে তার অন্ততঃ অর্ধেক (সম্ভবতঃ বেশি) বাস্তুহারাদের দুর্গতি দূর করার জন্য ব্যয় হয়নি, কর্মচারীরাই আত্মসাৎ করেছে। আর কর্মচারীরা প্রকৃত কাজে খুবই উদাসীনতা দেখিয়েছে। কেবল কর্তব্য কাজে

অবহেলা নয়, মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও তাদের এই কাজে উৎসাহ বা সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তবে দুঃখের সঙ্গে সত্যের খাতিরে এর আর একটি দিক সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। যে সব বাস্তুহারা বাঙ্গালী এ দেশে এসেছিল তাদের চরিত্রবলের যথেষ্ট অভাব ছিল। দুর্দশা স্বীকার করে নিয়ে নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার আগ্রহ খুব কমই দেখা গেছে—অন্ততঃ আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তাই মনে হয়। বাস্তুহারা একজনকে আমার বাড়িতে কাজ করতে নিযুক্ত করেছিলাম। একদিন কাজ করেই সে বাসনপত্র চুরি করে পালাল। স্বর্গীয়া লীলা রায় খুব পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে দুঃস্থদের, বিশেষতঃ মহিলাদের, দুঃখ দূর করবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁকে একদিন বললাম, আপনার ক্যাম্প থেকে আমার বাড়ির জন্য একজন রাঁধুনী যোগাড় করে দিন। খাওয়া পরা, থাকা এবং মাসিক ২০/২৫ টাকা মাইনে—যে কোন জাতি হলেই চলবে। তিনি খুব খুশী হলেন, কয়েকদিন পরে আমাকে জানালেন, আশ্চর্য ব্যাপার—যাকে যাকে বলেছি কেউ কাজ করতে রাজী হয়নি। তাদের উক্তি হচ্ছে—'আমরা কি পরের বাড়ি রান্ধিবার জন্য আইছি—দ্যাশ ভাগ করলেন কেন—এখন আমাগো খাইতে পরতে দেওনের ভার আপনাদের।'

এর সঙ্গে তুলনার জন্যে পাঞ্জাবের বাস্তুহারার একটি উদাহরণ দিই। এই সময় দিল্লী গিয়ে আমি এই ঘটনাটি দিল্লীর এক অধিবাসীর (অবাঙ্গালী) মুখে শুনি। তিনি একজন পাঞ্জাবী বাস্তুহারার মেয়েকে বাড়ির ঝি-গিরি করবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। মেয়েটি বাসন মাজা থেকে আরম্ভ করে সব কাজই করত, কথাবার্তায় খুব ভদ্র। গৃহকর্তা খুশী হয়ে তার মাইনেও কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একদিন তিনি প্রাতর্ভ্রমণ সেরে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরে দেখেন যে বৈঠকখানায় ঐ মেয়েটি খুব মন দিয়ে ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ছে। ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ইংরেজী জান? সে বললে—হ্যাঁ। তারপর কথাবার্তায় টের পেলেন যে মেয়েটি বি. এ. পড়ত, সেই সময় বৃদ্ধা মা ও ছোট বোনকে নিয়ে পাঞ্জাব থেকে কোনমতে দিল্লীতে এসেছে, দু'তিন বাড়ি কাজ করে কোনমতে চালাচ্ছে। ভদ্রলোক তখন তাকে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য অনেক বেশী মাইনেয় নিযুক্ত করলেন।

অবশ্য দুটি একটি দৃষ্টান্ত থেকেই কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান উচিত নয়। তবে এই ঘটনাটি শোনবার পর আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি যে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নানা রকমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে এবং মোটের উপর সেখানকার বাস্তুহারা সমস্যা অল্প সময়ের মধ্যেই মিটে গেছে। কারও কারও মুখে শুনেছি যে ভারত সরকার নাকি এ বিষয়ে পূর্ববাংলার বাস্তুহারাদের চেয়ে পাঞ্জাবী বাস্তুহারাদের প্রতি অনেক বেশী

সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, এবং শীঘ্র ও সহজে যে তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে এটাও তার একটা কারণ। এ সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য আমি জানি না তবে সংবাদপত্রে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা দেখেছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এর কোন প্রতিবাদ করেছেন এবং পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ নীতি দাবী করেছেন এমন কোন সংবাদ পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব কি মূল্য দিয়েছে সে সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব ঃ "ছয় হাজার মৃত, এক কোটি চল্লিশ লক্ষ গৃহচ্যুত ও বিতাড়িত ; এক লক্ষ যুবতী ধর্ষিতা, অপহৃতা, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতা বা বিক্রীতা"। এই উক্তিটি ভুলতে পারি না। আর যখনই মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এই মূল্য দিয়ে আমরা কি পেয়েছি ?

পরিশিষ্ট

জীবনে যে কয়েকজন বিশিষ্ট মাননীয় লোকের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেছিল তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত ভাবে পূর্বে কিছু লিখেছি। নানা কারণে তাঁদের ও অন্য দু একজনের সম্বন্ধে আরও কিছু লেখা দরকার মনে করি। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন দাশ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রথম পরিশিষ্টে দিলাম। যে সব দেশ ঘুরেছি তার সম্বন্ধেও পূর্বে কিছু লিখেছি। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে আরও কিছু যোগ করলাম। তৃতীয় পরিশিষ্টে আমার জীবনে যে সমুদয় সম্মান লাভ করেছি তার উল্লেখ এবং আমার প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা দিলাম। সম্প্রতি জয়শ্রী পত্রিকার ১৩৮৫ বৈশাখ সংখ্যায় এই সব বিবরণ ও আমার সম্বন্ধে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি অবলম্বন করে ইংরেজী ভাষায় লিখিত তৃতীয় পরিশিষ্ট যোগ করলাম।

পরিশিষ্ট—১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢাকায় আগমন

আমি এই গ্রন্থের ৮৩-৯০ পৃষ্ঠায় এর বিবরণ দিয়েছি। কি কারণে এই পরিশিষ্ট যোগ করতে হল তাও ৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছি। 'বেতার জগৎ' পত্রিকার ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূজা সংখ্যায় (১৫৫-১৬০ পৃঃ) যা লিখেছিলাম তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী দিনে (৭ই আগষ্ট ১৯৭২) আমি কলকাতা বেতার ভাষণে তাঁর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি-কথা নিবেদন করেছিলাম। সেই ভাষণটি 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ১৯৭৩ সনের ২২শে এপ্রিল সংখ্যায়। আমার ভাষণ দেবার অল্প কিছুদিন পরেই শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথমে 'গ্রন্থকারের নিবেদন' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—কিভাবে আমার কাছে থেকে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের কর্মসূচী, ও এই উপলক্ষে আমার নিকট লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রভৃতি এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করে ১৯৬৮ সনে নভেম্বর মাসে একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা (সম্ভবতঃ আনন্দবাজার) পর পর তিন সংখ্যায় 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' এই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি আমি দেখেছি। কিন্তু 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানি পড়ে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে শুনে, চিঠিপত্র দেখে গোপালবাবু

ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকায় যা লিখেছিলেন অনেক স্থলে, বিশেষতঃ আমার বাড়িতে যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সম্পর্কে এই গ্রন্থে যা লিখেছেন এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং গ্রন্থের উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। বইখানি পড়ে আমি এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি বলেন, তিনি সে সময়কার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লিখিত বিবরণই এই গ্রন্থে অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার থেকে নামলেই আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করি এবং আমার গাড়িতে তাঁকে ঢাকায় আমার বাড়ি নিয়ে যাই, সেখানে ক'দিন থেকে তাঁর শরীর অসুস্থ হাওয়ায় ঢাকার নবাবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাঁর 'তুরাগ' নামক বৃহৎ নৌকা-গৃহে বুড়ীগঙ্গা নদীর বক্ষে কয়েকদিন তাঁকে রাখি এবং এখানে থাকার ব্যবস্থাও আমিই সব করি। তারপর আবার আমার বাড়িতে ফিরে এসে ক'দিন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা ত্যাগ করেন। 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধে গোপালবাবুও ঠিক তাই লিখেছেন। কিন্তু 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমন সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার মর্ম এই ঃ

"ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়" (৩১ পৃষ্ঠা)। ৭ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ সদলবলে গোয়ালন্দ পেঁছিলেই "তাঁদের জন্য রাখা স্পেশাল ষ্টীমার সকলকে নিয়ে যাত্রা করল এবং বেলা ১১টা নাগাদ ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জে পেঁছিল" (৪২ পৃঃ)। অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ষ্টীমার থেকে তাঁকে নিয়ে একটি সুসজ্জিত মোটরে করে ঢাকা রওনা হলেন। ঢাকা শহরে প্রবেশের মুখে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক, এক বিরাট স্কাউট দল ও শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এখান থেকে "এক বিরাট শোভাযাত্রা কবিকে নিয়ে বুড়ীগঙ্গার উপর ভাসমান ঢাকার নবাব বাহাদুরের 'তুরাগ' হাউসবোটের কাছে গেল। নদীর উপর এই হাউসবোটে কবির তখন থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল" (৪২-৪৪ পৃঃ)। তারপর গোপালবাবু ঐদিনেই বিভিন্ন স্থানে কবির অভিনন্দনের সুবিস্তৃত বিবরণ দেন। তারপর ৯ই-১০ই কবি অনেকগুলি সভায় যোগ দেন এবং ২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। এই ক'দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে যে কবির কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল বা এইসব অনুষ্ঠানে যে আমিই কবিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছি এমন একটি কথাও গোপালবাবু উল্লেখ করেন নি। তারপর লিখেছেন, "ঢাকায় আসা অবধি কবি এতদিন বুড়ীগঙ্গার উপর হাউসবোটে বাস করছিলেন। এদিন ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভার পর কবি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের রমনার বাড়িতে গিয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং হাউসবোট ছেড়ে তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন"। এরপরই লিখেছেন, "রমেশবাবু বলেন—আগের ক'দিন কবি

আমার বাড়িতে না থাকলেও আমার বাড়ি থেকেই প্রতিদিন হাউসবোটে কবির আহার যেত” (৫৭ পৃঃ)।

ঢাকার অভ্যর্থনা সমিতি গোয়ালন্দ থেকে স্পেশাল স্টীমার করে কবিকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে গেল, তারপর বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে এল এবং পূর্ব ব্যবস্থামত (৪৪ পৃঃ) বেলা ৩টার সময় 'তুরাগ'-বোটে তুলল এবং কবি ৩।৪ দিন সেখানে থেকে বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। এগুলির প্রসঙ্গে গোপালবাবু আমার নামও উল্লেখ করেন নি—অথচ “প্রত্যহ আমার বাড়ি থেকেই খাবার যেত” এটা যে কতটা অস্বাভাবিক ব্যাপার সেটা গোপালবাবুর একবারও মনে হল না।

গোপালবাবু তারপর যা লিখেছেন সেটি আরও অপূর্ব! ১০ই তারিখ বিকালে কবি আমার বাড়িতে এলেন, কিন্তু ১১ই তারিখ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন (৬২ পৃঃ)। তখন কবি “দু-একদিনের জন্য আবার তুরাগবোটে গিয়েছিলেন” (৬৪ পৃঃ)। তারপরে গোপালবাবু লিখেছেন, “মনে হয় ১২ই তারিখের পরে ১৩ই বা ১৪ই তারিখে কবি আবার বোটে বাস করছিলেন” (৬৫ পৃঃ)। অথচ “১৪ই ফেব্রুয়ারী বা ২রা ফাল্গুন তারিখে সকালের দিকে কবি আবার রমেশবাবুর বাড়িতে ফিরে আসেন”। “১৫ই ফেব্রুয়ারী ৩রা ফাল্গুন বেলা এগারোটার সময় তিনি (কবি) ঢাকা ত্যাগ করে সদলে ময়মনসিংহ রওনা হন” (৭৪ পৃঃ)।

অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় কবি ২৪ ঘণ্টাও আমার বাড়িতে বাস করেন নি। এবং “১৪ই তারিখে বোটে বাস করছিলেন” অথচ সকালে আমার বাড়িতে ফিরে এলেন।

গোপালবাবুর 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের এই সমুদয় কাল্পনিক কাহিনী থেকে এবার প্রকৃত ঘটনার কথা গোপালবাবু যা ঐ সাপ্তাহিকে লিখেছিলেন তার থেকে উদ্ধৃত করছি।

“কবি নারায়ণগঞ্জ গিয়ে পৌঁছলে সেখানে অপেক্ষমান এক বিরাট জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ঢাকার রবীন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির কিছু সদস্যও নারায়ণগঞ্জে এসেছিলেন। রমেশবাবুর বাড়িতে কবির থাকা স্থির হয়েছিল বলে রমেশবাবু তাঁর মোটর এনেছিলেন কবিকে তা'তে করে নিয়ে যাবার জন্য। কবি রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে এবং কবির দলের অন্যান্যরা অন্য অন্য গাড়িতে করে ঢাকায় এলেন···রবীন্দ্রনাথ ঢাকা শহরের সীমান্তে এসে পৌঁছলে সেখানে স্কাউট দল ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে স্বাগত জানাল এবং তারা সেখান থেকে শোভাযাত্রা সহকারে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের ঢাকায় রমনা পল্লীতে রমেশবাবুর বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। কবির সঙ্গীদের মধ্যে ফার্মিক ও তুচ্চি ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলির বাড়িতে এবং রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অপর সকলে অপূর্ব চন্দের বাড়িতে গেলেন। কারণ ঐ দুই জায়গায় এঁদের থাকবার ব্যবস্থা

হয়েছিল”—এইটিই হল প্রকৃত ঘটনা। আমার বাড়ি ও উক্ত অন্য দুটি বাড়িই খুব কাছাকাছি। সেইজন্যই এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৩৭৫ সনে লিখিত এই বর্ণনার সঙ্গে 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' (১৩৭৯) গ্রন্থের বর্ণনার তুলনা করলে এ দুটি যে একই লোকের লেখা তা বিশ্বাস করা কঠিন। চার বৎসরের ব্যবধানে গোপালবাবু যদি অন্য কারও কাছে এই পৃথক্ কাহিনী শুনে থাকেন তবে এই গুরুতর বৈষম্যের কথা আমাকে জানান তাঁর উচিত ছিল—কারণ আমারই কাছ থেকে কতক মুখে শুনে এবং বেশীর ভাগ চিঠিপত্রাদি নিয়ে তিনি ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। অথচ এই বইতে সম্পূর্ণ নূতন কথা লেখার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক মনে করেন নি। ইতিহাসের একটি মূলসূত্র এই যে যদি কোন বিষয়ে দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ মত দেখা যায় তবে তার কোন্‌টি সত্য এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান না করে একটি মত গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। গোপালবাবুর ঐতিহাসিক জ্ঞানের যে যথেষ্ট অভাব, তাঁর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তুলনা করলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু শুধু ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব নয়, এর মধ্যে যে বেশ একটু দুরভিসন্ধিও আছে সেটা আমি প্রথমে বুঝিনি, কিন্তু তা পরে বুঝেছি। গোপালবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে মোটা মোটা বই লিখেছেন যাতে তাঁর এইসব বই-এর প্রকৃত মূল্য বুঝে পাঠকেরা তা পড়ে বিভ্রান্ত না হন, সেইজন্য তাঁব সাহিত্যিক সাধুতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। কারণ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিকের সম্বন্ধে তাঁর বই পড়ে পাঠকের মনে মিথ্যা ধারণা জন্মে এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

গোপালবাবুর গ্রন্থ পড়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে পূর্বে ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকায় যা লিখেছিলেন সেটা পরিবর্তন করে অন্য বিবরণ দেবার কারণ কি? তিনি বললেন যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পড়ে তাঁর এই নূতন ধারণা হয়েছে। আমি বললাম যে, আমি বেতার ভাষণে যে-কথা বলেছি এবং ঐ সাপ্তাহিকে আপনি আমার কাছে শুনে সব লিখেছেন এই কথা লেখার পর আমাকে আপনার এই গ্রন্থে মিথ্যাবাদী বলেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আমাকে এইভাবে অপদস্থ করার আগে আপনি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করাও সঙ্গত মনে করলেন না? তিনি বললেন এটা তাঁর ত্রুটি হয়েছে। তখন আমি বললাম যে রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান তখনকার দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখনও কলকাতায় আছেন এবং রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় ভ্রমণ সম্বন্ধে দুজনেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি। একজন প্রফুল্লকুমার গুহ, ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আর একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার মন্মথ রায়—তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বেচ্ছাসেবকদল রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যা করত, তাদের নায়ক ছিলেন। আমার কাছ থেকে তাদের ঠিকানা নিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এসে বললেন যে ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমি যা

লিখেছিলাম তাই ঠিক—'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে একটি শুদ্ধিপত্র যোগ করে এবং পত্রিকা মারফতে আমি আমার ভ্রান্তি স্বীকার করব। এক বছর হয়ে গেল—বারে বারে তাঁকে স্মরণ করিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্তও এই ভুল সংশোধন করেন নি।

এর কারণ বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় যাওয়া উপলক্ষে যে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধে এর বিস্তৃত বিবরণ গোপালবাবু নিজেই দিয়েছেন এবং এই সংক্রান্ত অনেকগুলি চিঠিপত্র উদ্ধৃত করেছেন। এগুলি উদ্ধৃত করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। আগ্রহশীল পাঠক ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকায় এগুলি পড়তে পারেন। এগুলি আমার কাছেই ছিল। সেই পত্রিকায় গোপালবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর বিশ্বভারতীর উপাচার্য অনুরোধ করায় আমি এইসব চিঠিপত্র টেলিগ্রাম প্রভৃতি বিশ্বভারতীকে দান করেছি। সেখানেই এগুলি রক্ষিত আছে।

রবীন্দ্রনাথকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ করা হল এবং তিনি তুচ্চি ও ফার্মিকি এই দুই সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন বলে লিখলেন, তখন ভাইস চ্যান্সেলার ও আমি পরামর্শ করে স্থির করলাম যে সাহেব দুজন ভাইস চ্যান্সেলারের বাড়িতে এবং রবীন্দ্রনাথ আমার বাড়িতে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পূর্বেই পরিচয় ছিল—সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবেই তাঁকে আমার বাড়িতে থাকবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখলাম। তখন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের এক নাতনী তাঁর সরকারী কর্মচারী স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকতেন। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ তাঁর বাড়িতে না থেকে আমার বাড়িতে থাকতে একটু সংকোচ বোধ করেছিলেন। সে যাই হোক, আমার চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন—"কল্যাণীয়েষু, এই কথাই পাকা রইল। তোমার ওখানেই আশ্রয় নেব। নাতনীর অভিসারে যদি কখনো কখনো যাত্রা করি আশা করি তা হলে কোনো কথা উঠবে না।"—চিঠির তারিখ ১২ই পৌষ ১৩৩২।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার বাড়িতে থাকবেন শুনে তাঁর কয়েকজন ভক্ত খুব বিচলিত হলেন এবং রবীন্দ্রনাথ যাতে সাধারণের অতিথিরূপে ঢাকায় অন্যত্র থাকেন তার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন ও লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন যে আমার বাড়িতে থাকায় ঢাকার জনসাধারণের আপত্তি। এটা কতদূর সত্য তা রবীন্দ্রনাথের পরম অনুগত বিশ্বস্ত ভক্ত প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে যে চিঠিখানি লেখেন তা থেকেই বোঝা যাবে। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আসার এক সপ্তাহ পূর্বে) চারুবাবু লিখছেন ঃ

"কাল সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হয়ে গেল। আমি উপস্থিত ছিলাম। কবিগুরুকে রমেশবাবুর বাসায় পাবলিক গেস্টরূপেই

রাখা হবে এই ধারণাই সমস্ত লোকের ছিল দেখলাম। রমেশবাবুর বাসায় কবীন্দ্র থাকলে কারো আপত্তি এখনো নেই বোঝা গেল। কেবল পাবলিক নামের দোহাই দিয়ে বিশ্বভারতী সম্মিলনের সম্পাদক অপূর্ব ও মনোরঞ্জন আপত্তি করলেন। আপনি মনোরঞ্জনের কথায় গুরুদেবের অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা অনুমোদন করে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের নিতান্ত নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম করে দিয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন, "ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে দূত এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়েছি। ৬ই তারিখ রাত্রে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ থেকে তাঁদেরই জলযানে ভেসে পড়ব।" এই চিঠি পেয়ে আমি তাঁকে চিঠি লিখে ও টেলিগ্রাম করে জানাই, "প্রোপোজাল জেনারেটেড নট ফ্রম পাবলিক বাট ফ্রম ইন্টারেস্টেড ইন্ডিভিজুয়াল্‌স্‌ ফর হিউমিলিয়েটিং মি"। এরপর চারুবাবর চিঠি দেখে তিনি ঢাকার জনসাধারণের মতামত জানবার জন্য শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে ঢাকায় পাঠালেন। নেপালবাবু ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কি বলেছিলেন সে সম্বন্ধে গোপালবাবু সেই বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছেন: "নেপালবাবু ঢাকায় গিয়ে সব দেখে শুনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন—ঢাকায় গিয়ে আগাগোড়াই রমেশবাবুর অতিথি হিসাবে আপনার থাকাই ভাল। তবে ইচ্ছা করলে আপনি দু-একদিন নৌকোয় থাকতে পারেন। কিন্তু তখনও আপনাকে রমেশবাবুর অতিথি হিসাবেই থাকতে হবে এবং ঐ নৌকোতেও তিনিই আপনার দেখা শোনা করবেন। রবীন্দ্রনাথ নেপালবাবুর কথাই মেনে নিলেন।"

আশ্চর্যের বিষয় এই যে "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে গোপালবাবু নেপাল-বাবুর মুখে এই কথাগুলিই বসিয়েছেন—কেবল 'মাঝে' এই শব্দটির পরিবর্তে 'প্রথমে' এই শব্দটি বসালেন অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্যটি দাঁড়াল—"তবে ইচ্ছা করলে প্রথম দু-তিন দিন নৌকোয় থাকতে পারেন।"

নৌকোয় থাকার কথা নেপালবাবু আদৌ কিছু বলেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে গোপালবাবু কর্তৃক উদ্ধৃত তাঁর দুটি উক্তির মধ্যে একটি যে নিছক মিথ্যা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম উক্তিটির মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে, অর্থাৎ কবি আমার বাড়িতে উঠে দিনকয়েক পরে দু-একদিন নৌকায় থেকে আবার আমার বাড়িতে ফিরে আসবেন এবং এর সব ব্যবস্থাই আমায় করতে হবে।

কিন্তু পরবর্তী উক্তিটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। অর্থাৎ "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে জনসাধারণ তাঁকে নারায়ণগঞ্জ থেকে অভ্যর্থনা করে সোজা নৌকায় নিয়ে গেল—সেখানে তিনি কয়েক দিন রইলেন—এর মধ্যে কোথাও আমার নামগন্ধও প্রত্যক্ষভাবে নেই। অথচ তিনি

আমার অতিথি এবং আমিই তাঁর দেখাশোনা করছি। এ ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। বিশেষতঃ, আমি পূর্বে যে সুদীর্ঘ টেলিগ্রামের কথা বলেছি এবং যেটি গোপালবাবু উদ্ধৃত করেছেন তার উপসংহারে আমি লিখেছিলাম "মাই আর্নেস্ট প্রেয়ার দ্যাট ইউ সিলেক্ট ওয়ান রেসিডেন্স ফর দি হোল পিরিয়ড অব স্টে। ইফ ইউ প্রেফার রিমেনিং ইন টাউন অ্যাজ পাবলিক গেস্ট আই রিলিজ্ ইউ ফ্রম অবলিগেশান্স্ বিকামিং মাই গেস্ট"।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসেই সাধারণের অতিথি হয়ে শহরে ৩।৪ দিন থাকবেন কিন্তু দেখা শোনা আহারাদির ব্যবস্থা করব আমি—এরূপ অদ্ভুত প্রস্তাব নেপালবাবু করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তা মেনে নিলেন এটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সুতরাং গোপালবাবু তাঁর গ্রন্থে যে রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় পৌঁছান ও তার কয়দিন পরের ঘটনার অলীক বিবরণ দিয়েছেন সেটা সমর্থনের জন্য নেপালবাবুর মুখের কথা বেমালুম পাল্টে দিয়েছেন। যে কোন সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিকের পক্ষেই এইরূপ ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা রচনা অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু একবার মিথ্যা দিয়ে আরম্ভ করলে পর পর অনেক মিথ্যার অবতারণা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় পৌঁছে আমার বাড়িতে-ওঠার ৩।৪ দিন পরে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন। বলাবাহুল্য সংবাদ পেয়ে কয়েকজন বড় ডাক্তার আসেন—আমার অনুরোধে সিভিল সার্জেনও আসেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করলেন—তারপর সিভিল সার্জেন আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন—ওঁর অসুখ বিশেষ কিছু নয়, তবে উনি নিজে মনে করেন উনি খুব অসুস্থ এবং নদীর হাওয়ায় ভাল থাকবেন, মনে এই বিশ্বাস পোষণ করেন। ওঁর মত ব্যক্তির এ বয়েসে হঠাৎ যদি সত্যিই অসুখ বেড়ে যায় তাহলে আমার খুবই দুর্ণাম হবে। সুতরাং আমি বা আপনি এ দায়িত্বভার নিয়ে ওঁকে এখানে রাখা সঙ্গত মনে করি না। আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে ঢাকার নবাবকে অনুরোধ করে তাঁর বৃহৎ হাউসবোট তুরাগে রবীন্দ্রনাথের থাকার ব্যবস্থা করি। আমি এবং আমার স্ত্রী প্রায় সারাদিনই ওখানে থাকতাম, আর জগন্নাথ হলের (আমি যার প্রভোস্ট ছিলাম) একদল ছাত্র মন্মথ রায়ের নেতৃত্বে কবিকে দেখাশোনার ও পরিচর্যার জন্য হাজির থাকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে গিয়ে এ কয়দিন তাঁর বাড়িতেই রাখেন।

এই ঘটনাটি এত সুপরিচিত যে গোপালবাবু একে উপেক্ষা করতে পারেন নি। ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রবন্ধে তিনি মোটামুটি সঠিক বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসে সোজা 'তুরাগ' হাউস বোটে গিয়ে জনসাধারণের অতিথি হিসেবে সেখানে থাকেন এবং চতুর্থ দিনে আমার বাড়িতে আসেন। সুতরাং তাঁকে কল্পনা করতে হয়েছে যে আমার বাড়িতে আসার পরদিন বা তার পরদিন রবীন্দ্রনাথ আবার 'তুরাগ' হাউস

বোটে ফিরে যান—সেখানে ২।৩ দিন থেকে আমার বাড়িতে ফিরে আসেন এবং তারপর দিনই ঢাকা পরিত্যাগ করেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আমার বাড়িতে মোটের উপর দুই দফায় দুই-তিন দিনের বেশী ছিলেন না।

পূর্বেই বলেছি অপূর্ব চন্দ ও মনোরঞ্জন প্রভৃতি জনকতক রবীন্দ্রনাথের গোঁড়া ভক্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসে আমার বাড়িতে না থাকেন। যখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হল তখন যে কোন উপায়েই হোক আনন্দবাজার পত্রিকায় এমনভাবে রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় থাকাকালীন ঘটনাগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করলেন যাতে রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমনের সঙ্গে আমার যে কোন সম্বন্ধ আছে একথা কেউ না মনে করে। এর ফলে কেবল গোপালবাবু বিভ্রান্ত হন নি, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন চরিত লিখেছেন—তিনিও ঐ বিশাল গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় ভ্রমণের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাতে রবীন্দ্রনাথ যে কোনদিন আমার বাড়িতে ছিলেন বা আমার সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল তার উল্লেখমাত্রও করেন নি—ঢাকার নবাব বাহাদুরের তুরাগ নামক নৌকাগৃহে কবি ছিলেন কেবল এইটুকুই আছে। তিনিও যে গোপালবাবুর ন্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র উপর নির্ভর করেই এই বিবরণ লিখেছিলেন পাদটীকায় ঐ পত্রিকার উল্লেখ থাকায় তা বোঝা যায়। মজার কথা এই যে, এমন কি গোপালবাবুও এতে বিস্মিত হয়ে তাঁর গ্রন্থে লিখেছিলেনঃ "আরও আশ্চর্য এই যে, রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়ার একরূপ মূলে যিনি এবং রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে যাঁর বাড়িতে কয়েকদিন ছিলেন, সেই রমেশবাবুর নাম প্রভাতবাবু তাঁর বইয়ে কোথাও উল্লেখ করেন নি। তুরাগ বোটে কবির থাকার কথাই কেবল প্রভাতবাবু বলেছেন। রমেশবাবুর বাড়িতে কবির থাকার কথা আদৌ বলেন নি।" (৭২ পৃষ্ঠা, ২নং পাদটীকা)।

এটা মজার কথা বলছি এইজন্যে যে এ বিষয়ে প্রভাতবাবু ও গোপালবাবু এ দুজনের মধ্যে তফাৎ উনিশ-বিশ বললেই চলে। দুজনেই রবীন্দ্র-ভক্তদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে সত্যের অপলাপ করেছেন। দৈবাৎ আমার কাছে শুনে গোপালবাবু আমার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের থাকার কথাটা একেবারে গোপন করেন নি। ২।৩ দিন অবস্থানের কথা বলেছেন। প্রভাতবাবু সেটুকুও বাদ দিয়েছেন। প্রভাতবাবুর সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়—আমি যে কবির ঢাকা যাওয়ার সময় সেখানে ছিলাম তাও জানেন, তথাপি আমার নিকট থেকে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহের কোন চেষ্টাই করেন নি। গোপালবাবু সে চেষ্টা করেছিলেন এবং আমার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে একটি সাপ্তাহিকে তিনটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছিলেন। পরে কি কারণে তিনিঃ -ভক্তদের চক্রান্তে যোগ দিলেন তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি। অন্ততঃ একটা কথা তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল—রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসবার পূর্বেই ৭ই ফেব্রুয়ারী

থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাঁর কর্মসূচী আমিই তৈরি করেছিলাম এবং তার যে মুদ্রিত কপিটি এখন আমার কাছে আছে তা তিনি আমার কাছ থেকে নিয়ে সেই সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপিয়েছেন। এই কর্মসূচী থেকেই বোঝা যায় যে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বন্দোবস্ত আমার হাতেই ছিল। এর মধ্যে তুরাগে থাকার কোন উল্লেখ নেই, কারণ তখন তুরাগে যাবার কোন কথাই ওঠে নি। গোপালবাবুই লিখেছেন, কবি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই কর্মসূচীর অনেক অনুষ্ঠান বাদ দিতে হয়েছিল। সুতরাং এই ছাপা কর্মসূচী যে আগেই তৈরী হয়েছিল এবং 'তুরাগ' নৌকা-গৃহে কবির অবস্থান সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই কবির ঢাকায় এসে অসুস্থ হবার আগে হয় নি, তা সহজেই বোঝা যায়।

গোপালবাবু অনেকটা বিচারশক্তির অভাবেই যে এইসব কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন করে 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পূর্বে দেশ পত্রিকায় প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন তার ঠিক উল্টোটি বলেছেন—প্রথমে আমি এই বিশ্বাসই মনে পোষণ করতাম। কিন্তু আমার বাড়িতে তাঁর যথেষ্ট যাতায়াতসত্ত্বেও তিনি কোনদিন আমাকে ঘূণাক্ষরেও জানান নি যে তিনি এ বিষয়ে বই লিখছেন এবং তাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করেছেন—এতে আমার মনে একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যখন আমার নির্দেশমত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ ও শ্রীমন্মথনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাকে বললেন যে, তাঁর বিষম ভুল হয়েছে এবং তাঁর গ্রন্থে একটি সংশোধনী যোগ করে এবং সংবাদ-পত্রিকার মারফত এই ভুলের সংশোধন করবেন তখন আমার সন্দেহ কমল। কিন্তু তারপর আমি বারবার তাঁকে এবিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়াসত্ত্বেও এক বছরের মধ্যে তাঁর প্রতিশ্রুত সংশোধনী নানারকম ওজর আপত্তি করে কিছুতেই ছাপলেন না—তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রবীন্দ্রনাথের যে শ্রেণীর ভক্তেরা ঢাকায় আমার বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের থাকার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল সেইরূপে এক শ্রেণীর চাপে পড়ে নিজের লেখা প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা লিখে গ্রন্থ ছাপিয়েছেন। কিন্তু এতে তিনি বাংলা সাহিত্যের যে গুরুতর অনিষ্ট করলেন তা একবারও ভেবে দেখেন নি। এরপর এই শ্রেণীর গ্রন্থের এবং তাদের লেখার উপর কেউ নির্ভর করবেন না এবং তাদের কোন সাহিত্যিক মূল্য দেবেন না। গোপালবাবুর কাহিনী একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, আপনি জানেন না উনি এইরূপই করেন এবং ওঁর বই কেউ নির্ভরযোগ্য মনে করে না।

গোপালবাবুর কথা এখানেই শেষ করি। ১৯২৬ সনে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের কার্যাবলী নানা কারণেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে মানুষ রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পেয়েছি তা আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমার বেতার ভাষণে কিছু বলেছিলাম এবং এই গ্রন্থে তা বিশদভাবে আলোচনা করব।

তা বলবার আগে ঢাকার জনসাধারণের দিক থেকে তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি।

রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় অবস্থানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর বক্তৃতাগুলি। যেমন সচরাচর ঘটে থাকে বহু প্রতিষ্ঠানে তাঁকে বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ করে, এবং তিনি দিনে এক দুই বা ততোধিক ভাষণ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবগুলিই ররীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক এবং অপরূপ সুললিত ভাষায় সমুজ্জ্বল। তাঁর অসুস্থতাবোধ করার এটাই সম্ভবত একটি কারণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দুটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "দি মিনিং অব আর্ট" এবং "দি রুল অব দি জায়ান্ট"। এ দুটি বক্তৃতাই পুরাপুরি ছাপা হয়েছে। এছাড়া তাঁর আর যে কয়টি বক্তৃতার কথা মনে পড়ে সেগুলি নিম্নলিখিত স্থানের অভিনন্দনের উত্তরে তাঁর ভাষণ। এগুলি সবই মৌখিক এবং তার কিছু বিবরণ সাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গোপালবাবুর 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' এবং প্রভাতবাবুর 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থে এর বিবরণ আছে তবে তা কতটা সত্য বলতে পারি না।

১। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে নর্থব্রুক হলে।
২। ঢাকা করোনেশন পার্কে।
৩। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে।
৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুস্লিম হলে।
৫। দীপালি সঙ্ঘে।

বোধ হয় আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—কিন্তু তা আমার ঠিক স্মরণ নেই।

ঢাকায় থাকতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। দুটির কথা আমি জানি। আমার বড় মেয়ে—তখন তার বয়স বার-তের বছর—কবিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি নাকি কবিতা লেখেন? কবি বললেন, হ্যাঁ আমার সে দুর্ণাম আছে। তখন আমার মেয়ে ছোট একটা নোটবই তাঁর সামনে ধরে বলল, আমার নামে একটা কবিতা লিখে দিন না।—কবি তার নাম জিজ্ঞেস করতেই বলল, ডাক নাম সুষমা—ভাল নাম শান্তি। কবি তৎক্ষণাৎ ঐ নোটবইতে লিখে দিলেন:

"আয়রে বসন্ত হেথা, কুসুমের সুষমা জাগা রে
শান্তি-স্নিগ্ধ মুকুলের হৃদয়ের নিস্তব্ধ আগারে।
ফলেরে আনিবে ডেকে
সেই লিপি যায় রেখে
সুবর্ণ তুলিকাখানি পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে॥"

২ ফাল্গুন ১৩৩২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কবিতাটি রবীন্দ্র-রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কবে কোথায় কার উদ্দেশে কবি এই কবিতাটি লিখেছিলেন তার কোন উল্লেখ নেই। 'সুষমা' ও 'শান্তি' এই দুটি নামই কবিতায় আছে।

আমি তখন জগন্নাথ 'হল' অর্থাৎ হোস্টেলের অধ্যক্ষ (প্রভোস্ট)। হলের ছেলেরা এসে অনুরোধ করায় কবি বেশ বড় একটি কবিতা লিখে দিলেন—তার প্রথম চার লাইন এই :

"এই কথাটি মনে রেখো
তোমাদের এই হাসি-খেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম
জীর্ণপাতা ঝরার বেলায়।"

এটি 'গীতবিতানের' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু কোথায় কার উদ্দেশে লেখা তার পরিচয় কোথাও দেখিনি বলে এখানে উল্লেখ করলাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতামাত্রেই বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য নিধি। সুতরাং কোন্ উপলক্ষে কোথায় ও কবে কোন্ কবিতা তিনি লিখেছিলেন যতদূর সম্ভব তা সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই জন্যই তাঁর আর একটি কবিতার উল্লেখ করি। কবি যখন ঢাকায় আমার বাড়িতে ছিলেন তখন আমার মেজ মেয়ের বয়স পাঁচ বছর। কবি তাকে স্নেহ করতেন। তার বিয়ের সময় আমি সেই সংবাদ জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদবাণী চেয়েছিলাম—উত্তরে কবি স্বহস্তে একটি কবিতা লিখে পাঠান। যতদূর জানি এটি কোথাও ছাপা হয় নি। তাই কবিতাটি উদ্ধৃত করছি।

ওঁ

কল্যাণীয়া সুজাতা—

আজি তোমাদের শুভ পরিণয় রাতে
সপ্ত ঋষির স্বর্গের আঙ্গিনাতে
চিরমিলনের উজ্জ্বল-শিখা আশীর্বাদের মঙ্গললিখা
তারায় তারায় লিখিল দোঁহার তরে।
অরুন্ধতীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি করি দিল আজ পুণ্য বৃষ্টি
প্রণতিনম্র যুগল ললাট পরে।
আজি নন্দন মন্দার বনে রজনীগন্ধা-গন্ধের সনে
পৌঁছিল বুঝি মর্তের হাসিখানি
শচীর প্রেমের মধু রাগিণীতে ধরার প্রেমের সাহানার গীতে
মিলিয়া বাজিল আলোকবীণার বাণী॥

২৮শে বৈশাখ
১৩৪৫

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ যখন আমার বাড়িতে ছিলেন তখন তাঁকে নিভৃতে নিরালায় দেখবার ও কথাবার্তা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম, যা সহজে ঘটে না। এর ফলে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের অর্থাৎ মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটু যে পরিচয় পেয়েছিলাম প্রায় ৫০ বছর পরে আজও তা স্পষ্ট মনে আছে—যদিও তাঁর অনেক কথাই আজ একেবারে ভুলে গেছি। যা মনে আছে কতক তা পূর্বেই লিখেছি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঢাকায় আগমন

[এই গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠা—শেষের দিক থেকে অষ্টম পংক্তি দ্রষ্টব্য]

বাংলা ১৩২০ সন, ইংরেজী ১৯১৩ সাল। আমি তখন ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক। পূজার ছুটিতে কলকাতা এসেছি। আমাদের বাসা তখন ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চাটার্জীর স্ট্রীটে। এর কাছেই একটি ছোট অফিস থেকে যমুনা নামে ছোট একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হত। পাড়াপড়সী হিসাবে আমার দাদা ঐ পত্রিকাখানি রাখতেন। আমি যেদিন কলিকাতা পৌঁছি সেই দিনই কথাপ্রসঙ্গে দাদা বললেন, যমুনা পত্রিকায় চন্দ্রনাথ নামে একটি বড় ধারাবাহিক উপন্যাস ও আরও কয়েকটি ছোট গল্প প্রকাশিত হচ্ছে—পড়ে দেখো। কাগজখানার চেহারা দেখে খুব ভক্তি হল না। যাহোক, দুপুরে আহারাদি করে পড়ব স্থির করলাম। ছুটির দিনে দিবানিদ্রার আরাম উপভোগ করা চিরকালের অভ্যাস। নিদ্রার উপকরণ হিসাবে শুয়ে শুয়ে গল্পকয়টি পড়তে আরম্ভ করলাম। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গেলাম। যখন গল্পগুলি সব শেষ করলাম তখন মনে হল অপূর্ব, এমনটি বুঝি আর শীঘ্র চোখে পড়ে নি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক অজ্ঞাত অখ্যাত লেখককে নীরবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম। অজ্ঞাতসারে দুইটি কবির দুইটি পংক্তি মনে পড়ে গেল। প্রথমটি একটি ইংরেজী কবিতার অংশ—"আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখিলাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছি।" দ্বিতীয়টি হেমচন্দ্রের—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।" আমার ন্যায় অনেকেই যে প্রথম পরিচয়েই মনে মনে শরৎচন্দ্রের ললাটে রাজটীকা ও কণ্ঠে জয়মাল্য দিয়েছিলেন তা এখন সুপরিচিত সত্য।

তারপর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনলাম। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে শরৎচন্দ্রের জীবনের যে চিত্র আমার নিকট ব্যক্ত করলেন তা উপন্যাসের উপযুক্ত বটে। কিন্তু পরে জেনেছি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পক্ষে তার অধিকাংশই অমূলক। সাধারণত বড়লোকদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত আজগুবি কাহিনী রটে—ইংরেজীতে যাকে বলে myth বা legend। শরৎচন্দ্রের খ্যাতি-প্রতিপত্তির মতন এও অকস্মাৎ শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠল।

এর বহুদিন পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্বর্গীয় বন্ধুবর

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে, কিন্তু খুব অল্পক্ষণের জন্য—বিশেষ কোন কথাবার্তা হয় নি। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য তারপরও বহুদিন হয় নি। কিন্তু ১৩৩২ সালের প্রথমে (ইং ১৯২৫) মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে এই সুযোগ ঘটল। এই সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র, আর ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলাম আমি। কর্তৃপক্ষ একটি স্কুলবাড়ীর (অথবা ছাত্রাবাসের) এক কক্ষেই আমাদের উভয়ের বাসস্থান নির্দেশ করেছিলেন। সুতরাং আলাপ পরিচয় বেশ জমে উঠল।

আহারাদির পর সভাস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, শরৎবাবুও কাপড় চোপড় পরেছেন এমন সময় এক গোলযোগ ঘটল। শরৎবাবু সভাপতির অভিভাষণ লিখে এনেছিলেন, কিন্তু এখন আর তা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রথমে বাক্স বিছানা, পরে জামার পকেট প্রভৃতি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কোথাও তা মিলল না। এদিকে সভার সময় অতীত হয়ে গেল, সম্মেলনের পক্ষ থেকে কয়েকজন আমাদের নিতে এসেছেন। শরৎবাবু মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, এই একটু আগে আমি এই খাটে বসে তা পড়েছি, কোথায় গেল? তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে-কিছুক্ষণ পূর্বে শরৎচন্দ্র তামাক খাবার সময় কলকেটা গরম ছিল বলেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক খানিকটা কাগজ হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরে ব্যবহার করেছিলেন, পরে তামাক খাওয়া হলে তা দূরে ফেলে দিয়েছিলেন। চেয়ে দেখলাম ঘরের এক কোণে বেনের পুঁটুলির মত সেই কাগজের মোড়কটি পড়ে আছে। আমি সেটি কুড়িয়ে এনে খুলে দেখি, খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা একটি সাহিত্যিক সন্দর্ভ। আমি শরৎবাবুকে সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কি? তিনি আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে দেখেই বললেন, আ রে, এইত আমার অভিভাষণ! কোথায় পেলে? আমি হাসতে হাসতে তাঁকে সকল কথা বললাম। উপস্থিত সকলেই হাসতে লাগলেন, কিন্তু শরৎবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ হলেন না।

এই সময় শরৎবাবু দিনে কিছু খেতেন না, ঘন ঘন তামাক ও চা পেলেই চলত। রাত্রে আহারাদির পব পাশাপাশি দুই খাটে দুই বিছানার উপর বসে অনেক কথাবার্তা হল। সরস বাক্যালাপে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ পটুতা এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সেই দিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম। রাত্রি ১০টা কি ১১টার সময় শরৎচন্দ্র বললেন, চল বাইরে যাই। আমার সঙ্গে আমার বালক পুত্র ছিল, সে ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে দেখিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন যে, ওর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। বলেই উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরা দুইজনে বাইরে এলাম। চারিদিকে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। ঘাসের উপর একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি ছিল তাতেই দুজনে পাশাপাশি

বসলাম। সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি কত কথা বললেন; মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। ক্রমে রাত্রি প্রায় একটা কি দুটো বাজল, কিন্তু ঘুমের কথা মনেও হল না। এখন দুঃখ হয় যে সে সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে এইসব কথাবার্তার সারমর্ম লিখে রাখি নি কেন। কারণ এখন আর তার প্রায় কিছুই মনে নেই। কেবল দুটি কথা আমার মনে খুব গভীর রেখাপাত করেছিল তা এখনও ভুলি নি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার উপন্যাসগুলির মধ্যে কোনখানা আপনি সবচেয়ে ভাল মনে করেন? শরৎবাবু কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—গৃহদাহ, আর্টের দিক দিয়ে এ একেবারে নিখুঁৎ'। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, 'জবাবটা বুঝি মনের মত হয় নি? আমি স্বীকার করে বললাম যে তাঁর অনুমান সত্য। তারপর অনেকক্ষণ এ বিষয়ে আলাপ হল।

আর একটি কথা মনে আছে। প্রসঙ্গক্রমে আমি বললাম, অনেকে মনে করে যে আপনার বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেকটা একই ধরনের এবং এই বৈচিত্র্যের অভাব আপনার উপন্যাসের অঙ্গহানি করেছে। তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, সৈন্যরা যখন প্যারেড করে তখন দূর থেকে সকলকে একই রকম দেখায় অথচ প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে সেই স্বাতন্ত্র্য দেখানই আর্টের বৈশিষ্ট্য।

সেদিনকার সুদীর্ঘ আলাপের মধ্যে শরৎবাবুর এই দুইটি উক্তিই কেবল মাত্র আমার মনে আছে। পরবর্তী কালে এর সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

মুন্সীগঞ্জের সম্মেলন শেষ হলে আমি শরৎবাবুকে ঢাকা যাবার জন্য আমন্ত্রণ করলাম। তিনিও সম্মত হলেন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'জগন্নাথ হল' নামক ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ। পূর্বেই আমি এই সংবাদ ঢাকায় পাঠিয়ে দিলাম যাতে শরৎবাবুর অভ্যর্থনার সমুচিত বন্দোবস্ত হয়। বলা বাহুল্য, ছাত্রদল এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হল, এবং এই সময় গ্রীষ্মের ছুটি থাকা সত্ত্বেও শরৎবাবু ঢাকায় গেলে বিপুল সমারোহ সহকারে তাঁর অভ্যর্থনা হল। এই উপলক্ষে তাঁর দরদী হৃদয়ের প্রথম পরিচয় পেলাম। পূর্বেই বলেছি তিনি দিনে কিছু খেতেন না। আমার বাড়ির মধ্যে একটি পুকুর ছিল। তার বাঁধান ঘাটের ওপরে দুই রোয়াকে বসে আমাদের মজলিস জমত। আমার স্ত্রী শরৎবাবুর নিকট অতি অল্পকালের মধ্যেই চিরপরিচিত বান্ধবের ন্যায় হয়ে উঠলেন। নিজের পান ও আহারাদি সম্বন্ধে শরৎবাবু অকপটে সমস্ত ফাইফরমাস সেখানেই পেশ করতেন। ফলে দেখতাম ঘাটের মজলিসে তিনি আসর জমিয়ে বসতেন আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসত এবং ঘন ঘন হুঁকোর কলকে বদলি হত। এক রাত্রে আহারাদির পর আমি তিনি ও আমার স্ত্রী যখন এই তিন জন মাত্র ছিলাম তখন তিনি নিজের জীবনের

অনেক কথা বললেন এবং অকপটে অনেক বিষয়ে যে সকল মন্তব্য করলেন তাতেই তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দীন দরিদ্র উৎপীড়িতের প্রতি গভীর দরদের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলাম। বুঝতে পারলাম, কি গুণে তার সৃষ্ট চরিত্র এমন মর্মস্পর্শী হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেই তাঁর অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছিল সব চেয়ে বেশী। কয়েকটি কাহিনী বলে আমার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন—দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনও সুবিচার করে নি, আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবনভোর তারই প্রতিবাদ করব। অনেক সময় এমনি আরও অনেক কথা বলতেন—বলতে বলতে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হতেন। এই প্রসঙ্গে একদিন গল্প করে বলেছিলেন যে বহু নারীর জীবনকথা সংগ্রহ করে তিনি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখেছিলেন, কিন্তু তা পুড়ে গিয়েছে। ঢাকায় তিনি বেশীদিন ছিলেন না। তাঁর কয়েকটি পোষা কুকুর তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে ছিল। খবর পেলেন তার একটির কি অসুখ হয়েছে। অমনি কলকাতায় ফিরবার জন্য ব্যস্ত হলেন। এই উপলক্ষে শুনলাম কুকুরের প্রতি তাঁর অদ্ভুত অনুরাগের কথা। তাদের খাবার শোবার যে বিশেষ বন্দোবস্ত করেছেন সে কথা সবিস্তারে বললেন। ফিরে আসার পরে তাঁর একটি কুকুর মারা যায়—সে বিষয়ে দুঃখ করে তিনি একখানি চিঠি লিখেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার স্ত্রী একদিন তাঁকে বলেছিলেন যে কুকুর বিড়ালের প্রতি যাঁর এত দরদ বাংলার পাঠক পাঠিকার প্রতি তিনি এত অকরুণ কেন? শরৎবাবু একটু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। তিনি বললেন, মাসিক পত্রে আপনার ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস যখন মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে তখন আপনার পাঠক পাঠিকার কিরূপ কষ্ট হয় তা কি আপনি জানেন না? শরৎবাবু শুনে হেসে উঠলেন এবং খানিকক্ষণ বেশ জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। পরে বললেন, তুমি তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলে, না জানি কি গুরুতর অভিযোগই শুনতে হবে। আমার লেখা যে সব সময়ে নিয়মমত বার হয় না তার কারণ আমি বড় অলস লোক। আচ্ছা, এবার থেকে ঠিক নিয়মমতই বার হবে। তাঁর এ প্রতিশ্রুতি তিনি অনেকটা রক্ষা করেছিলেন।

এর কয়েক বছর পরে যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎবাবুকে একটা 'অনারারী ডিগ্রী—ডি. লিট' দেওয়া হয় আমি সেজন্য চেষ্টা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইরূপ সম্মান দিলেই সেটা সুশোভন হত, কিন্তু তা যখন হোল না তখন অন্তত বাংলার একটা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে তাঁর গুণের উপযুক্ত সম্মান করে সেইজন্যই আমি এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলাম। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সৌহৃদ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে শরৎবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার সম্মানের জন্যই যে এরূপ ডিগ্রী দেওয়া উচিত তা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেও সেদিন একথাটা প্রমাণ করতে আমাকে কম বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু, আজ সে সকল

কথার সবিস্তারে আলোচনা অনাবশ্যক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং এই উপলক্ষে কনভোকেশনের সময় শরৎবাবু আবার ঢাকায় এলেন।

প্রথমবার ঢাকায় আসবার পর ১০।১১ বৎসর কেটে গেছে। এই কয় বৎসরে শরৎবাবুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং তিনি ঢাকায় আসবেন শুনে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁকে সংবর্ধনা করবার জন্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি ব্যবস্থা করেছিলাম যে তিনি যেদিন ঢাকায় পেঁছিবেন সেদিনই জগন্নাথ হলে ছাত্রগণের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা করা হবে। শরৎবাবু এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং আমার উপরেই সকল ব্যবস্থার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আসবার ঠিক আগের দিন সংবাদ এল যে নারায়ণগঞ্জের একদল সাহিত্যিক স্থির করেছেন যে ষ্টীমার থেকে নামলেই তাঁকে নিয়ে গিয়ে এক সভা করবেন। এর ফলে আমাদের ব্যবস্থা ও আয়োজন সবই গোলমাল হয়ে যাবে। শরৎবাবু নারায়ণগঞ্জ-ওয়ালাদের কাছে কোন কথা দেন নাই, কিন্তু তিনি যে তাদের অনুরোধ উপরোধ এড়াতে পারবেন না তা বেশ জানতাম। সুতরাং এটা বন্ধ করবার জন্য একদল বাছাই ছাত্র নিয়ে আমার সহযোগী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী নারায়ণগঞ্জ গেলেন এবং ষ্টীমার থেকেই শরৎচন্দ্রের চারিদিকে ব্যূহ রচনা করে তাঁকে নামিয়ে মোটরে করে একেবারে ঢাকায় নিয়ে এলেন। তিনি ঢাকায় এসেই আমার স্ত্রীকে বললেন, আজ থেকে তোমার স্বামীকে আমি বলব গুণ্ডা। কারণ ঠিক গুণ্ডার মতই আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। সত্য সত্যই তিনি এর পর থেকে আমাকে গুণ্ডা বলেই ডাকতেন।

জগন্নাথ হলে যে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁর অভ্যর্থনা হয়েছিল তা আজও মনে পড়ে। শরৎবাবু সংবর্ধনার উত্তরে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছিলেন যে শীঘ্রই তিনি মুসলমান সমাজ অবলম্বন করে একখানি উপন্যাস লিখবেন। কিন্তু তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

পূর্ববারের ন্যায় এবারেও রাত্রে আহারাদির পর বহুক্ষণ পর্যন্ত নিরালা আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। তিনি ঢাকা থেকে চলে আসবার কয়দিন পরে যে যে বিষয়ে তিনি বলেছিলেন আমি সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত নোট করে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, অবসরমত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখব। দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর হয়ে ওঠেনি। সুতরাং অনেক বিবরণই এখন আর মনে নেই। তবে সেই নোটের সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মতামত যথাসাধ্য লিখছি।

(১) বিজয়া নাটকের প্রধান অভিনেত্রী সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেন। যতদূর স্মরণ হয়, তাঁর মতে বিজয়ার প্রকৃত ভাবটি অভিনয়ে ফুটে ওঠে নি বলে তিনি আক্ষেপ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে

বিজয়া নাটকে বিলাসের চরিত্রের ভাল দিকটা তেমন দেখান হয়নি কেন ? তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছেন। বিলাসের প্রতি দর্শকের মনে সহানুভূতি জাগলে নাটকের মূল প্রস্তাব থেকে তাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে নাটকের উদ্দেশ্য বিফল হবার এবং নাটকের মধ্যে যে কেন্দ্রগত ঐক্য থাকা আবশ্যক তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা।

(২) স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। তিনি বলেন, আমরা মনে মনে এবিষয়ে যে আদর্শ পোষণ করি বর্তমান সমাজের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় থাকলে বুঝতে পারব তা কতটা ভুয়ো। এটা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি নামধাম সহকারে কয়েকটি কাহিনী বলেন। বাস্তব জগতে যে কিরণময়ীর অভাব নাই এগুলি তারই দৃষ্টান্ত। এবিষয়ে বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

(৩) ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকের বাঙ্গালী পতির প্রতি ভক্তি, এবং পক্ষান্তরে বাঙ্গালী স্বামীর বর্মী স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের কয়েকটি কাহিনী (নামধাম সহকারে) বলেন। এক বাঙ্গালীর বর্মাদেশীয় স্ত্রী তার বাঙ্গালী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করছে এরূপ একটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে টীকেন্দ্রজিতের স্ত্রী জুতো সেলাই করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন, পরে গভর্ণমেণ্ট তাকে মাসিক ১০ টাকা করে বৃত্তি দেন।

(৪) রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে তিনি খুব বিরুদ্ধ মত পোষণ করতেন। তাঁর ভ্রাতা প্রভাস এই মিশনে যোগদান করেন এবং (তাঁর মতে) একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করেন। এই নিয়ে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হয়।

(৫) অর্থাভাবে পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে না পারায় তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি। (এইখানে আমার নোটে লেখা আছে পাঁচকড়িবাবু তাঁর শিক্ষক ছিলেন—ইনি নায়কের সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু না আর কেউ স্মরণ নাই।)

(৬) তাঁর জীবনে এমন দিনও গিয়েছে যখন তিনি শনিবার হতে বুধবার পর্যন্ত মদ্যপান করতেন।

(৭) "পথের দাবী"র প্রচার যখন গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করেন তখন তিনি এবিষয়ে প্রতিবাদ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তা না করায় তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন।

(৮) ব্রহ্মদেশে গোপনে কোকেনের ব্যবসা চালাত এরূপ একটি দলের কথা তিনি শুনেছিলেন। দলের কর্ত্রী ছিল একটি স্ত্রীলোক। এরা সুমাত্রা ও যবদ্বীপে ব্যবসা করত। এই সংবাদ থেকেই "পথের দাবী"র সুমিত্রার সৃষ্টি।

(৯) সিঙ্গাপুর হতে দুইজন রাজদ্রোহী পালিয়ে বর্মায় শরৎবাবুর আশ্রয়ে কিছুদিন থাকে। এইজন্যেই তিনি পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং তাঁকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করতে হয়। এই উপলক্ষে কলসন নামে এক পুলিশ

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে অনেক জেরা করেন। "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত হলেও গভর্ণমেণ্ট তাঁকে জেলে দেয় নি কেন এর কারণ বলেন। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর সুপারিশেই গভর্ণমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নি। এই কর্মচারীটি এখনও জীবিত। সন্ত্রাসবাদী (terrorist) দলের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁদের জীবনের ভিত্তির উপরই সব্যসাচীর সৃষ্টি।

(১০) মহাত্মা গান্ধীর মতামত তিনি নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করেন। পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও অনেক মন্তব্য করলেন। এই সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উক্তি আমার নোটে লেখা আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তার উল্লেখ সমীচীন নয়।

আমার সংক্ষিপ্ত নোটের সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তাঁর কয়েকটি মাত্র কথা লিখলাম। যে বিষয়ে তিনি নিজের মতামত কোনদিন প্রকাশ্যে কিছু ব্যক্ত করেছেন বলে শুনি নি সে সম্বন্ধে বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে অনেক স্থলেই বিস্তারিত আলোচনা সঙ্গত মনে করি নি—সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি মাত্র।

ঢাকা থেকে ফিরবার কিছুকাল পর তাঁর শরীর অসুস্থ হয়। এই সম্বন্ধে তাঁকে পত্র লিখি। উত্তরে তিনি যে চিঠি লেখেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

"ভাই ছায়েব, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবা। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে নমস্কার দিবা ও চারুর* সহিত যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবা।

এদিকে আমার জ্বর ত সারিল না। শ্রীবিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নির্ণয়ে অক্ষম।

'নানান ছাপের জমলো শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো
ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে বড় করলে যখন অস্থি জরজর,
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।'

অতএব, দুই তিন দিনেই স্থানত্যাগের বাসনা। নিজের নয় অন্যদের। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্যসহচর ৯৯° জ্বর, তুমি আর একটুখানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরব্ধ কাজটুকু চটপট সেরে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই। ইতি ১১ই পৌষ ১৩৪৩

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এঁর সঙ্গে শরৎবাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ঢাকায় তাঁর বাড়ীতেই শরৎবাবু এবার ছিলেন।

এর পর আর মাত্র এক বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু শরীর কখনও সুস্থ হয় নাই। ২রা মাঘ ১৩৪৪ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক রচনা তাঁকে অমর করে রাখবে। আমার বিশ্বাস আছে যে বহুকাল পর্যন্ত "গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" কিন্তু তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অকপট স্নেহ ও সৌহার্দ, সরস বাকপটুতা, আন্তরিক বন্ধুবৎসলতা ও শিশুসুলভ সরলতার কথা অচিরেই কালসাগরে বিলীন হয়ে যাবে। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য যাতে এর একটু ছবিও ধরে রাখতে পারা যায় এই উদ্দেশ্যেই এই স্মৃতিকথা লিখলাম।

চিত্তরঞ্জন দাশ

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের নাম ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল—যেদিন অরবিন্দ ঘোষ আলিপুর বোমার মোকর্দমায় মুক্তিলাভ করলেন। উপসংহারে বিচারককে সম্বোধন করে অরবিন্দের ভবিষ্যৎ খ্যাতি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন তা বঙ্গদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর পর ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি অনন্যপূর্ব খ্যাতি লাভ করেন এবং তখন তাঁর মাসিক আয় প্রায় বিশ ত্রিশ হাজার টাকা হয়। তিনি সাহিত্য-চর্চাও করতেন এবং তাঁর "সাগর সঙ্গীত" খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আমরা দূর হতে তাঁকে সম্ভ্রমের সহিত দেখতাম।

তিনি 'নারায়ণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। একদিন ঐ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখবার অনুরোধ করে তিনি আমাকে এক পত্র লেখেন। আমি খুবই বিস্মিত হলাম এবং একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠালাম। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হলে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে একখানি চিঠি লেখেন এবং পনেরোটি টাকা পাঠিয়ে দেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টাকা কয়টি ফেরৎ দিলাম এবং বললাম যে তাঁর সম্পাদিত কাগজে আমার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়াই আমি যথেষ্ট সম্মান মনে করি। এর কিছুদিন পরে তিনি আমাকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁর ভোজন-বিলাসিতার পরিচয় প্রথম দিনই পেয়েছিলাম। একদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি তিনি চা-পান করছেন। চায়ের এক তৃতীয়াংশ পান করবার পরেই ভৃত্য নূতন আর এক পেয়ালা চা নিয়ে এল এবং এই ভাবে তিন পেয়ালা সদ্য সদ্য গরম চা পান করে চা-পান-পর্ব শেষ করলেন। নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখলাম দেশী, বিলাতী, মোগলাই প্রভৃতি সকল রকম খাদ্যই প্রস্তুত, যে যে রকম খাদ্য চাইল তাকে তাই দেওয়া হল।

তাঁর দানশীলতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। আমার জানা তিনটি

দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমার একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয় লেখাপড়া বিশেষ করে নি, কিন্তু গণিতশাস্ত্রে তার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। এম. এ. পাশ ছাত্রেরা ও অধ্যাপকগণও এর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতেন। আত্মীয়টি খুবই গরীব এবং তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাকে চিত্তরঞ্জনের নিকট নিয়ে গেলাম। সকল বিবরণ শুনে তিনি তাকে মাসিক পনেরো টাকা দেবার ব্যবস্থা করলেন। আমার সহপাঠী ও বিশিষ্ট বন্ধু গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীকে চিত্তরঞ্জন খুব স্নেহ করতেন এবং আমরা তাকে চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যিক সেক্রেটারী বলতাম—কারণ সে চিত্তরঞ্জনের ভাষণ প্রভৃতি লিখতে সাহায্য করত। একদিন গিরিজা এসে তাঁকে বলল, ঐ যে কতকগুলি ট্রামের কন্ডাকটর একটি বাড়ী ভাড়া করে থাকে এবং দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে মাসে মাসে আপনার কাছ থেকে টাকা নেয় আজ আসার সময় শুনলাম তারা গানবাজনা করছে। আপনি ওদের টাকা দেওয়া বন্ধ করুন। চিত্তরঞ্জন হেসে বললেন—গিরিজা, ওরা গরীব বলে কি একটু আমোদ প্রমোদও করতে পারবে না? বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন টাকা দেওয়া বন্ধ করেন নি।

তৃতীয় ঘটনাটি আমার বাড়ীর কাছেই ঘটে। চিত্তরঞ্জন একদিন একটু বেলায় ভ্রমণ করতে করতে শুনলেন একটা ছোট পুরানো একতলা বাড়ীর ভিতরে কে একটি স্ত্রীলোক কান্নাকাটি করছে, আর অনেক লোক সেখানে জড় হয়েছে। চিত্তরঞ্জন কান্নার শব্দ শুনে দাঁড়ালেন—সঙ্গীদের বললেন, মনে হচ্ছে যেন এই ভাঙ্গা বাড়ীটাতে আমার এক পুরাতন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি তখন দু একবার তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা করেছি। চল, ভিতরে যাই। গিয়ে দেখলেন তাঁর অনুমানই ঠিক। বৃদ্ধ শিক্ষক অধোবদনে বসে আছেন; দেনার দায়ে ডিক্রীদার ঘরের জিনিসপত্র উঠানে এনে নিলামে বিক্রীর ব্যবস্থা করছে—একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করছেন, ছেলে মেয়েরাও কাঁদছে। চিত্তরঞ্জন শিক্ষককে প্রণাম করে বললেন—আমি স্কুলে আপনার ছাত্র ছিলাম, আমার নাম চিত্তরঞ্জন দাশ। ব্যাপার কি বলুন। শিক্ষকটি বিস্মিত হয়ে চিত্তরঞ্জনকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বললেন। চিত্তরঞ্জন কর্মচারীটির কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। কর্মচারীটি জোড় হাতে বলল—আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। চিত্তরঞ্জন বললেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন দেনার টাকা আমি মিটিয়ে দেব—আপনি সমস্ত জিনিসপত্র ঘরে তুলে দিন। কর্মচারীটি তাই করল। গৃহস্থ পরিবার ও দর্শকদের মনের অবস্থা বলাই বাহুল্য। টাকার সংখ্যা সঠিক আমার মনে নাই—তবে সুদে আসলে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে চিত্তরঞ্জন শিক্ষকের বাড়ীটি রক্ষা করলেন।

চিত্তরঞ্জন তাঁর কন্যার বিবাহে যে জাঁকজমক করেছিলেন এখনও তা আমার স্মৃতিপট হতে একেবারে মুছে যায় নি। চিত্তরঞ্জন যখন দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিলেন তখন তাঁর মাসিক আয়

ছিল দশ পনেরো হাজার টাকা। শুনেছি এর পর তাঁর স্ত্রী স্বহস্তে রন্ধন করতেন। কারণ চাকর ঠাকুর সবই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পর ছুটিতে ঢাকা হতে কলকাতায় এসে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন মেয়ের বাড়ীতে থাকতেন, কারণ তাঁর বসতবাড়ীও দেশকে দান করেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম চিত্তরঞ্জন এক তলায় একটি ময়লা ছিন্ন শতরঞ্চির উপরে একখানি আধময়লা কাপড় পরে বসে আছেন। আমার চোখে জল এল, আমি দেখা না করেই ফিরে এলাম। জীবনে আর তাঁকে দেখি নি।

পরিশিষ্ট—২

দেশভ্রমণ

পঞ্চাশ বছর আগে আমি প্রথম ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে ভ্রমণ করি। পূর্বে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে জগতের সব দেশেই গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি মোটামুটি ভাবে এই ভ্রমণকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে রেখেছিলাম। তার সাহায্যে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের একটু বিস্তৃত বর্ণনা দিচ্ছি।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিল আমি লণ্ডন পৌঁছি এবং ঐ বৎসরেরই শেষ ভাগে (১২ই ডিসেম্বর) কলকাতায় ফিরে আসি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে আমি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখেছি। এই পরিশিষ্টে ইউরোপ ভ্রমণ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখব।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

কয়েক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। এঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের কথা আজও মনে আছে—স্যাডলার, টমাস, কুসে, লুডার্স, ক্রোম, ভোগেল, জুলস্ ব্লক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ভারত সরকার যে একটি কমিটি স্থাপন করেন সার মাইকেল স্যাডলার তার সভাপতি ছিলেন। এই কমিশন যে রিপোর্ট দেন তদনুসারে ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কমিটির সদস্য ছিলেন এবং আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলাম। আমার পরিচয় দিলে স্যাডলার খুব আদর আপ্যায়িত করলেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল। সব শুনে তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা

করলেন স্যার আশুতোষের কোন ভাল জীবনচরিত বের হবার আয়োজন হচ্ছে কিনা।

সেই দিনই রাত্রে ডিনারের পর টমাস সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অধ্যাপক ডাক্তার টমাস বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী আমাকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে নিজেই আমাকে একটি পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। ঘাসের উপর বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁদের বাড়ী ফিরে দেখি টমাস তখনও ফেরেন নি। আরও কিছুক্ষণ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা এবং ভারতবাসী ইংরেজদের সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর কথাও বলতে হল। প্রায় দশটার সময় আমরা ডাক্তার টমাসের লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে বসলাম। কতক বই অগোছালভাবে এদিক ওদিক পড়ে আছে। মিসেস টমাস বললেন যে ডাঃ টমাস তাঁকে বইতে হাত দিতে দেন না কারণ তাতে সব গোলমাল হয়ে যায়, সুতরাং নিজেই গুছিয়ে রাখেন। মিসেস টমাস বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। রাত্রি এগারোটার সময়ও যখন টমাস ফিরলেন না তখন আমি বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। সারা পথ এই ক্ষুদ্র ইংরেজ পরিবারের ভদ্রতা ও সৌজন্যের কথাই শুধু ভেবেছি।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় পরিচারিকা (maid) একখানা চিঠি হাতে এনে দিল। চিঠিখানা পড়ে আমি তো অবাক। ডাঃ টমাস দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন যে কাল তাঁর বাড়ী ফিরতে দেরী হওয়ায় আমার সঙ্গে দেখা হয় নি—আজ তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিছুক্ষণ পরে এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ এসে উপস্থিত। ইনিই ডাঃ টমাস। অনেক কথাবার্তা হল। বোর্ণিও, সেলিবিস্ প্রভৃতি স্থানে হিন্দু প্রভাবের পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা হল।

লণ্ডনে পৌঁছে আমার প্রধান কাজ হল ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করা। এই লাইব্রেরীটির মতন আর কোন লাইব্রেরী জীবনে দেখিনি। কেবল পুস্তকের সংখ্যায় নয়, পাঠকদের প্রতি যত্ন ও মনোযোগ এই লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য। আমি ছোট একটি ব্যাগের মধ্যে খাতাপত্র নিয়ে যেতাম— দরজায় কেউ কিছু বলতো না। কিন্তু প্যারিসে লাইব্রেরীর দ্বাররক্ষক প্রতিদিন সেটি খুলে দেখত। এদের সুব্যবস্থার আর একটি পরিচয় পাই আমি যখন ২৫।৩০ বৎসর পরে আর একবার এই লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। আমি যখন প্রবেশের জন্য কার্ড চাইলাম আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি পূর্বে কখনও এ লাইব্রেরীর কার্ড নিয়েছি কিনা। আমি বললাম অনেক বছর আগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি এখানে নিয়মিত এসে পড়াশোনা করতাম। সে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে আমার নামটা লিখে নিয়ে আর এক ঘরে গেল। দু তিন মিনিট পরেই আমার সই করা পুরানো কার্ডখানা এনে আমাকে দেখাল। আমি তো অবাক।

অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই লাইব্রেরীতে আছে। বাংলা দেশের প্রথম মুদ্রিত পুস্তকখানি আমাদের দেশে কোথাও পাওয়া যায় না—ওখানে দেখে এসেছিলাম। দেশে ফিরে এসে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষকে এই বইয়ের একটি ফটোস্টাট কপি আনতে অনুরোধ করেছিলাম। বলা বাহুল্য, কোন ফল হয় নি।

লণ্ডনে পৌঁছে প্রথম ১০।১২ দিনের মধ্যেই National Gallery, Royal Academy of Arts, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Mall, Strand প্রভৃতি দেখলাম। এই সময় একদল ভারতীয় সাইকেল চড়ে ভূ-প্রদক্ষিণ করছিলেন—তাঁদের সঙ্গেও দেখা হল।

একদিন আমার ও আর দুই জনের প্রণীত "An Advanced History of India" প্রকাশের ব্যবস্থা করতে ম্যাকমিলান কোম্পানির অফিসে গেলাম। কাজের কথাবার্তা শেষ হলে এর অধ্যক্ষ Harold Macmillan আমাকে House of Commons—অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টে যাবার জন্য একখানি কার্ড দিলেন (তিনি তখন এর সদস্য ছিলেন)। যে মহাসভা থেকে জগৎজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসিত হচ্ছে তা দেখতে গেলাম। কক্ষটি খুব বড় নয়; কিন্তু বক্তৃতা বেশ শোনা যায়। এই বিখ্যাত Westminister Hall দেখে অনেক বিস্মৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ল। এখানে প্রাচীন রাজাদের ও পার্লামেণ্টের বড় বড় বক্তাদের প্রস্তরমূর্তি আছে, দেয়ালে অনেক ঐতিহাসিক ছবি আছে। প্রাচীন যুগের প্রতি এই জাতির কি শ্রদ্ধা তা এখানে এলে বোঝা যায়।

লণ্ডনে অনেক চিত্রশালা ও জগৎপ্রসিদ্ধ অনেক ছবি আছে—তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। অমরাবতী স্তূপের প্রায় সকল মূর্তিই এখানকার মিউজিয়মে আছে। এক ঘরে হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি আছে। কয়েকখানি সরস্বতীর মূর্তি আছে। তা ছাড়া মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহেরও মূর্তি আছে। কোন-কোনটির গায়ে লিপি উৎকীর্ণ আছে। দুঃখের বিষয়, এই মূর্তিগুলির কোন ক্যাটালগ নাই।

Victoria and Albert Museum-এর একটি ঘরে Griffith ও Mrs. Harrington কর্তৃক অঙ্কিত অজন্তা গুহার চিত্রগুলি আছে। সাঁচী স্তূপের পূর্বদ্বারের cast এবং সাঁচী ও অন্যান্য স্থানের কয়েকটি মূর্তিও আছে। তাজমহলের একটি হস্তীদন্তে নির্মিত প্রতিকৃতি আছে।

এক রাত্রে ডিনারের পর London University Union ভারতীয় ছাত্রদের মজলিসে গেলাম। চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কয়েকটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করল। মিসেস মেহতা নামে একটি গুজরাটি মহিলা বেশ সুন্দর গান করলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে পি. কে. বসু (এইচ. ডি. বসুর পুত্র) বেশ গান গাইলেন। মজলিস শেষ হলে Gower Street-এর আড্ডায় গেলাম। অনেক বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে আলাপ হল।

২৪শে মে থেকে ৩১শে মে—এই এক সপ্তাহ Oxford ছিলাম। বিশ্ববিখ্যাত এই বিদ্যালয়টির কথা বহু শুনেছি। কিন্তু অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনে হতাশ হলাম। Sir Verney Lovett লেকচার দিলেন। বিষয়বস্তু 'Indian famine' এবং সেটা শেষ হলে Relation with Afghanistan. আগাগোড়া লিখিত নোট পড়ে গেলেন—একটি কথাও নিজস্ব মৌখিক নয়। ২৬শে মে All Souls College-এ Sir Charles Oman-এর লেকচার শুনতে গেলাম। দরোয়ান একটি শুক্লকেশ হৃষ্টপুষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলল, উনিই Oman. আমি তাঁকে বললাম যে তাঁর লেকচার শুনতে চাই। তিনি বললেন—'বেশ, তবে যদি ছাত্র কেউ আসে'। নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে দেখি যে দুটি ছেলে বসে আছে। তারা বলল যে এ লেকচারে বেশী ছাত্র হয় না—কারণ এ বিষয় থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসে না—আর লেকচারও ভাল হয় না। আমি বসলাম। কিছুক্ষণ পরে আর দুটি ছাত্র এল—অধ্যাপক ওম্যান ঘরে ঢুকলেন এবং চেয়ারে না বসে আমাদের সামনে একটা উচু বেঞ্চের উপর বসলেন। একখানি বই খুলে একটা ম্যাপ ছেলেদের সামনে রাখলেন—তারপর এক তাড়া কাগজ বের করে পড়ে যেতে লাগলেন—বেশ তাড়াতাড়ি ঠিক ছাপা বই পড়ে যাওয়ার মত। আগাগোড়া এক ঘণ্টা শুধু এইভাবে পড়া চলল—একটি ছেলে মাঝে মাঝে নোট নিতে লাগল—আর তিনজন বসেই রইল—এইভাবে বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের অধ্যাপনা শেষ হল।

একদিন Regius Professor Davis-এর লেকচার শুনতে গেলাম। ইনিও লেখা নোট আস্তে আস্তে পড়ে গেলেন—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। Oxford-এর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা ছিল, কিন্তু সব দেখেশুনে তা পরিবর্তন করতে হল। পরদিন Gladstone Professor of Politics অধ্যাপক অ্যাডামস্-এর লেকচার শুনলাম। ইনিই একমাত্র অধ্যাপক যিনি নোট না পড়ে বক্তৃতা দিলেন।

এক রাত্রে আহারাদির পর Oxford Students Union-এর মিটিং-য়ে গেলাম। এটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষত্ব। ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোক ছাত্র অবস্থায় এখানে বক্তৃতা দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন—তাঁদের অনেকে এখনও এখানে আসেন। প্রত্যেক Term-এ এর একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদে নির্বাচিত হওয়া একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়। অনেকে পড়াশুনা শেষ হলেও এই পদে নির্বাচনের আশায় দুই তিন বৎসর এখানে থাকেন। আমি যেদিন যাই সেদিন তর্কের বিষয় ছিল "This House should rather have taken Quebec than written Gray's Elegy". সেনাপতি Wolfe-এর একটি উক্তি উল্টে দিয়ে এই বিষয়টি নির্বাচিত হয়েছিল। প্রত্যেক দিকেই তিনজন করে বক্তা—এদের প্রায় সকলেই Ex-Student ও Ex-President. বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন Sir Ian Hamilton. প্রস্তাবের

পক্ষে তাঁর বক্তৃতা অনেকটা কাঠখোট্টা সৈন্যের ন্যায়। কিন্তু বাকী পাঁচজনের বক্তৃতা শুনে বাহবা দিতে হয়। বিষয়টি তো কিছুই না, কিন্তু ঐটি উপলক্ষ করে বক্তারা কি চমৎকার বললেন—যেমন হাস্য-পরিহাস-রসিকতা—তেমনি বলবার কায়দা ও নূতন নূতন যুক্তির উদ্ভাবন। এরকম উঁচুদরের সাহিত্যিক তর্ক বিতর্ক কখনও শুনেছি বলে মনে হল না। বুঝলাম, কেন Oxford-এর এত নাম। বক্তৃতা-কক্ষের চার দেয়ালে অনেক ছবি আছে—ভূতপূর্ব ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা পরে যশস্বী হয়েছেন সম্ভবতঃ তাঁদেরই ছবি।

তিনমাস পরে—২৬শে আগস্ট—International Oriental Congress উপলক্ষে আবার Oxford এসেছিলাম। ২৭শে থেকে ৩০শে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রবন্ধ হিসাবে কংগ্রেস খুব সফলতা লাভ করে নি। তবে সন্ধ্যার পরে Lantern Slides সহযোগে মধ্য এসিয়া এবং Foucher আফগানিস্তান ও বাক্ত্রিয়া সম্বন্ধে যে লেকচার দেন তা খুব ভালই লাগল। এদেশে ঐরূপ সম্মেলনে যেমন, ও-দেশেও তেমনি ভোজের আয়োজন ছিল। আমিও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম—ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ও পরিবর্তন সম্বন্ধে। প্রবন্ধটি না পড়ে আমি সংক্ষেপে তার সারমর্ম বলি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক বোর্ডে অক্ষরের ক্রমপরিবর্তন দেখাই। এতে অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। আমার বক্তৃতার শেষে Foucher আমাকে অনেক সাধুবাদ দিলেন, Luders-ও খুব প্রশংসা করলেন। শশীভূষণ ও পৃথ্বীশ যে দুটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিল আমি তার সারমর্ম বললাম। এ নিয়ে কিছু তর্ক বিতর্কও হোল। প্রথম দিন কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতীয় বিষয়ে যে সকল সদস্য ছিলেন Thomas তাদের লাঞ্চ দিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টও একদিন লাঞ্চ দিলেন। আমার পাশে বসেছিলেন Sten Konow। বুড়ো বেশ আমুদে লোক, পরিচয় ও অনেক কথাবার্তা হল। আমি মদ খাচ্ছি না দেখে বললেন, এরপর যখন মদ নিয়ে আসবে তুমি 'না' করো না—গ্লাস ভর্তি করে নেবে আমি ওর সদ্ব্যবহার করব। সিগারেটের বেলাতেও সেই ব্যবস্থা হল। বুড়ো ডবল ডোজ চালিয়ে গেল। কথায় কথায় বুড়ো জিজ্ঞেস করল, রাখালদাস ও ভাণ্ডারকরের মধ্যে ঝগড়া মিটল কিনা। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের অধ্যাপক Sir Denison Ross ও Blagden-এর সঙ্গে আলাপ হল। Ross আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা ছাত্র লণ্ডনে না পাঠিয়ে Oxford পাঠাই কেন? আমি বললাম, ছাত্রেরা Oxford, Cambridge ছেড়ে লণ্ডনে যেতে চায় না। তিনি তখন লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গুণের এক লম্বা তালিকা দিলেন এবং বললেন যে Oxford-এ খালি বড় বড় কলেজের বাড়ীই আছে—কিন্তু ওদের মাথায় কিছু নেই। Sir Theodor Morrison ও Lady Rhys Davis-এর সঙ্গেও আলাপ হল।

প্রথমবার Oxford থেকে ৩১শে মে লণ্ডন ফিরে ছিলাম। ২রা জুন aeroplane-এ প্যারিস যাত্রা করলাম। জীবনে আকাশ ভ্রমণ এই প্রথম—কিছুক্ষণ পরেই অস্বস্তি বোধ হল, বমি করলাম। সৌভাগ্যের বিষয় অল্প সময়ের মধ্যেই প্যারিস পেঁছিলাম।

এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য Louvre Museum, যেমন বাইরের প্রাসাদটি বিরাট ও বিশাল, ভিতরের মিউজিয়মটিও তেমনি প্রকাণ্ড। ছবির ঘরগুলি দেখতেই বহুদিন লাগে। Louvre থেকে বেরিয়ে Concorde নামে বিশাল প্রাঙ্গণ দেখলাম। প্রধান দর্শনীয় একটি রমণীমূর্তি—ফ্রান্সের একটি প্রদেশ Strasbourg-এর প্রতীক। ১৮৭০ সালে জার্মানী যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করে এই প্রদেশটি কেড়ে নিয়েছিল, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মানীকে হারিয়ে সেই প্রদেশটি পুনরায় দখল করে। ১৮৭০ সালে এই মূর্তিটি কালো কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়—১৯১৮ সালে সেই কালোকাপড় খুলে নেওয়া হয়। কেবল এই কথা কয়টি খোদিত আছে—Conquered (বিজিত)—১৮৭০—মুক্ত—১৯১৮।

Foucher-এর সঙ্গে দেখা হল—প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন কিনা এবং কেন আনি নাই তার কৈফিয়ৎ চাইলেন। বললেন, এটা ম্যাডাম Foucher জানতে চেয়েছেন। তারপর অনেক আলাপ হল—আমার Champa বই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল।

Musee Guemet-এর Director-এর নামে চিঠি দিলেন। এই চিঠি নিয়ে সেখানে গেলাম—আমার পড়ার খুব ভাল ব্যবস্থা হল। Foucher একদিন চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী ও অনেক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হল।

প্যারিসে প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চ Eiffel Tower দেখলাম। এটাকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা যেতে পারে। আরও অনেক প্রাসাদ মন্দির ও মূর্তি দেখলাম।

প্যারিস, বার্লিন, রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জিনেভা প্রভৃতি ইউরোপের প্রসিদ্ধ স্থানে ঘুরেছি কিন্তু তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই সব জায়গাতেই মিউজিয়মে সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও ভাস্কর্যের নমুনা আছে। আমার ইউরোপ ভ্রমণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ফরাসী ও ওলন্দাজ অধিকৃত প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশগুলি ভ্রমণ করা। সুতরাং লাইডেনে কিছুদিন থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। ডাচ ভাষা শিখবার সুবিধা হবে এই জন্য একটি পরিবারের অতিথি (Paying Guest) হয়ে সেই বাড়ীতেই ছিলাম। Vogel সাহেব ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন—তিনিই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং জার্মানীতে কয়েকদিন নানা জায়গায় ঘুরে ২৮শে জুন লাইডেনে পেঁছে Dr. Horst-এর বাড়ীতে কয়েকদিন ছিলাম। এখানকার Kern Institute-এ খুব ভাল লাইব্রেরী আছে। ২৯শে জুন সেখানে গিয়ে

দেখলাম আমার পড়াশুনোর জন্য একটি পৃথক টেবিল রাখা হয়েছে। সেক্রেটারী আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন। Vogel সাহেবের জন্যই এই সব ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন Vogel-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। যবদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Dr. Krom-এর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাকে Kern Institute-এ সব ঘুরিয়ে দেখালেন এবং বড় বড় কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। Vogel সাহেবও Kern Institute-এ এসে আমার সব ব্যবস্থা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি কি খেতে ভালবাসি তা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন যে, যদিও সাড়ে পাঁচটায় তাঁদের খাবার সময় তথাপি আমার মত মাননীয় অতিথির (honoured guest) জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে, তাই ছয়টা সময় ধার্য করলেন। বলা আবশ্যক যে এ সব দেশে প্রফেসর (Professor) পদের সম্মান খুব বেশী। এখানকার কয়েকটি কথা এখনও মনে আছে। প্রথমতঃ, রাস্তার দুই ধারে প্রশস্ত খাল—নৌকা করে পার হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ চিত্রশালাগুলি। তৃতীয় এবং সর্বপ্রধান Vogel ও Krom সাহেবের সৌজন্য ও ভদ্রতা। Krom তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধের reprint দিলেন এবং বললেন যে কোন বিষয়ে কিছু জানার প্রয়োজন হলে চিঠি লিখলেই তিনি বিস্তারিত জবাব দেবেন।

Amsterdam বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখানকার Colonial Museum-এ যবদ্বীপের অনেক মূর্তি এবং মন্দিরগাত্রে relief-এর সুন্দর cast আছে।

২৮শে জুন থেকে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত লাইডেনে ছিলাম, তারপর প্যারিসে আসি। প্যারিসের কথা পূর্বে কিছু লিখেছি এবং অনেকেই লিখেছেন ; আর কিছু লিখবার প্রয়োজন নাই। ওখান থেকে Franco-British Congress-এ যোগ দেবার জন্য লণ্ডনে গেলাম। Oxford-এ Oriental Congress-এর মত বক্তৃতা ভোজ প্রভৃতি সবই অনুষ্ঠিত হল।

সংক্ষেপে আর দু একটি কথা বলেই ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী শেষ করব।

১২ই মে ন্যাশনাল গ্যালারী গেলাম। এখানে ইউরোপের নানা দেশের বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবি আছে। এদেশে বিখ্যাত ছবি কেনা একটা ফ্যাসনের মত হয়েছে। সম্প্রতি র‍্যাফেলের বিশ বৎসর বয়সে আঁকা Madona and Child ছবিটি এক ভদ্রলোক ১৭৫,০০০ পাউণ্ড দিয়ে কিনেছেন। Murillo অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি সেদিন প্রত্যেকটি পাঁচ ছয় হাজার গিনিতে বিক্রী হল। Madam Tussaud-এর Exhibition দেখতে গেলাম। এটি একটি অদ্ভুত জিনিস। ইংলণ্ডের রাজা রানী, রাজপুরুষ এবং পৃথিবীর নানা বড়লোক ও অনেক ঐতিহাসিক দৃশ্য এখানে মোমের পুতুলের নকশায় জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

ইউরোপের অন্য দেশ—জার্মানি ইটালী প্রভৃতি দেখে ঈজিপ্ট হয়ে পূর্ব এশিয়ায় সুমাত্রা যবদ্বীপ আনাম কম্বোডিয়া শ্যাম ব্রহ্ম দেশ ঘুরে ১২ই

ডিসেম্বর ১৯২৮ কলকাতায় ফিরলাম। উপসংহারে প্যারিসের একটি জুয়াচোরের কাহিনী বলব।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রসঙ্গে প্যারিসের লাইব্রেরীতে ঢোকবার সময় সকলের attache case পরীক্ষা করে দেখবার কথা বলেছি। এতে এই দুই দেশে লোকের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণার প্রভেদ বোঝা যায়। এর হয়ত যথেষ্ট কারণ আছে। আমি বহুদেশ ঘুরেও মাত্র একটি অসাধুতার দৃষ্টান্ত দেখেছি, সেটিও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ওরা জুন প্যারিসে একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হল। বলল, তার দেশ অস্ট্রেলিয়া। আমারই মত দেশভ্রমণে বেরিয়েছে, ফরাসী ভাষা ভাল জানে না। তার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে Are de tromphe দেখতে গেলাম। এটি নেপোলিয়নের বিজয়যাত্রার স্মৃতিফটক—এত বড় উঁচু ফটক পৃথিবীতে আর নাই। আরও অনেক জায়গা সে taxi করে আমাকে নিয়ে ঘুরল। কথা হল পরদিনও সে আবার আসবে।

পরদিন দুজনে Luxembourg উদ্যানে ঘুরছি, এমন সময় দেখলাম আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়া একটি বৃদ্ধের পকেট থেকে একটা চাবি পড়ে গেল। আমরা তাকে ডাকায় সে ফিরে দাঁড়িয়ে চাবি কুড়িয়ে আমাদের খুব ধন্যবাদ দিল। তারপর সে বলল, আমি সম্প্রতি এক নিকট জ্ঞাতির মৃত্যুতে অনেক টাকা পেয়েছি। পোপ এই চাবিটা দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, লক্ষ টাকা দিলেও এই চাবিটা হাতছাড়া করব না। আমাদের একটা কাফেতে নিয়ে গেল, একটা পুরানো খবরের কাগজ বের করল। তাতে আর কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়ার বিবরণ আছে। পকেট থেকে তিন-চার হাজার পাউন্ডের এক তাড়া নোট বার করল। আমি ও সঙ্গী Thompson বললাম, আমাদের দেশের গরীবদের জন্য কিছু টাকা দাও। সে বলল, তোমরা যে অবস্থাপন্ন লোক তার পরিচয় দাও। Thompson পকেট থেকে এক হাজার পাউন্ডের letter of credit বার করল। আমার ভিতরের জামার পকেটে টাকা ও letter of credit ছিল। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হল—আমি বললাম, আমার সঙ্গে টাকা নাই। তোমরা লাঞ্চের পর আমার হোটেলে এস। ওরা দুজন taxi করে চলে গেল। আমি হোটেলে অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কিন্তু দুজনের একজনও এল না। আমার খুব বিশ্বাস যে এই দুজনই ষড়যন্ত্র করেছিল—আমি টাকা বের করে দেখাতে গেলেই টাকাটা নিয়ে নেবে। এই সন্দেহ সত্য কিনা জানি না। কিন্তু এই অদ্ভুত কাহিনী দিয়েই আমার ভ্রমণ বিবরণ শেষ করলাম।

Appendix

BIOGRAPHICAL DATA OF R. C. MAJUMDAR

Permanent Address : 4, Bepin Pal Road, Calcutta-26.

Date of Birth : 4, December, 1888.

Place of Birth : Village of Khandarpara in the District of Faridpur, now in Bangladesh.

Academic Career : M. A. in History, First Class ; Premchand Roychand Scholar ; Griffith Prizeman ; Doctor of Philosophy (Calcutta University), Doctor of Literature, Honoris Causa, (Calcutta, Jadavpur, the Rabindra Bharati and Burdwan Universities) ; Desikottama of Visvabharati Santiniketan (1972) ; Vidyabaridhi of Nava Nalanda Mahavihara, and Bharatatatva-Bhaskara (Saskrit College, Calcutta) ; Lecturer, Calcutta University ; Professor of History, and later Vice-Chancellor, Dacca University ; Principal, College of Indology, Hindu University, Benaras and the University of Nagpur ; Visiting Professor of Indian History, Universities of Chicago and Pennsylvania (U.S.A), Sheriff of Calcutta, 1967-68.

Distinction : President, All-India History Congress, All-India Oriental Conference, and Institute of Historical Studies—Annual Conference 1968 ; President of the Section of Indology in the XXII International Conference of Orientalists held at Istambul in 1951, and a member of its Executive Committee ; A member of the Bureau of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies ; A Vice-Peesident of the International Commission for publishing a "History of Mankind—Educational Cultural and Scientific Development" sponsored by UNESCO ; President, Asiatic Society, Calcutta and the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta ; Honorary Fellow

of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland and the Asiatic Society of Bombay; Honorary Member of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; Awarded Campbell Gold Medal by the Asiatic Society Bombay; Sir William Jones, B. C. Law and Jagattarini Gold Medals by the Asiatic Society Calcutta; Delivered the Maharaja Sayajirao Gaekwad Honorarium Lectures, Adhar Mookherjee Lectures, and Sir William Meyer Lectures at the invitation respectively, of the Universities of Baroda, Calcutta and Madras. These were published, respectively, under the title "Ancient Indian Colonisation in South-East Asia", "Maharaja Rajballabh", and "Kambujadesa". Also delivered the first series of "Birla Endowment Lectures" at the Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay and the "Extension Lectures" at the Visva Bharati, Bolpur, published respectively, under the titles "Three Phases of India's Struggle for Freedom" and "Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century". Appointed Kamala Lecturer by the University of Calcutta and delivered four lectures on the "Culture of Medieval Bengal" which have been published by the University. Delivered three lectures at the Patna University published by me under the title "Swami Vivekananda". Delivered Rai Bahadur C Ghosh and Vidyasagar Lectures in the Calcutta University, respectively, on "Indian Religion", "Prose Literature in Bengal" and "Womanhood in India." Autombapu Lectures at Imphal, Manipur, on "Expansion of Aryan Culture in Eastern India", three lectures at B. J. Research Institute, Ahmedabad, and three lectures on Historiography at Heras Institute, Bombay, all of which have been published. Delivered six Rabindranath Tagore Endowment Lectures in the Kerala University on "British Impact on Hindu Culture" (1973). Awarded Rabindranath Tagore Birth Centenary plaque by the Asiatic Society, Calcutta.

Literary Works : General Editor of the "History and Culture of the Indian People", in eleven volumes, planned by the Bharatiya Vidyabhavan, Bombay. Editor of the "History of Bengal" Volume 1, published by the University of Dacca. Joint-Editor of two Sanskrit Texts—"Rama-Charita" and "Rajavijay Nataka". Edited "Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" published by Chuckervertty Chatterjee & Co., Calcutta (1960). Edited History of Bengal in Medieval Age and wrote the History of Ancient and Modern Bengal (in Bengali). Author of more than 300 articles published in Antiquarian Journals and of the following works :

1. Corporate Life in Ancient India. (4 editions). 1919
2. Early History of Bengal.
3. Ancient India (revised and enlarged edition of "The Outline of Ancient Indian History and Civilization." (4 editions)
4. Ancient Indian Colonies in the Far East.! 1944
   Volume I—Champa.
   Volumes II and III—Suvarnadvipa.
5. Hindu Colonies in the Far East (2 editions).
6. Greater India.
7. Inscriptions of Kambuja.
8. Classical Accounts of India.
9. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857.
10. History of the Freedom Movement in India (three volumes—2 editions).
11. History of Bengal (in Bengali)—in four volumes.
12. Study of Sciences in Ancient India (in Bengali).
13. History of Ancient Bengal.
14. On Rammohan Roy.
15. History of Mediaeval Bengal.
16. Renascent India.
17. Bangiya Kulasastra (in Bengali).

18. Hindu Sabhyata O Sanskritir Kramabikasa (in Bengali).
19. Surya Sen Memorial Lectures.
(Lectures published in the form of books as mentioned above are not included in the above list).
Thirty-six articles-published in different Journals have been published in the form of a book entitled "Readings in Political History of India."

Also received the Rabındra prize (Rupees five thousand) from the Government of West Bengal, Rabindra Memorial prize (Rupees five thousand) from the Kerala University for delivering six lectures) and the sum of Rupees seven thousand and five hundred from a Japanese newspaper (only twenty such prizes were given, the other nineteen recipients being Englishmen or American) respectively, in the years 1957, 1973 and in 1970. In May, 1978 ; the Fuel Instruments·and Engineers Ltd. of Ichadkaranji, Kolapur, gave a prize of ten thousand rupees (free of Income Tax).

পরিশিষ্ট—৩

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অভিমত

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার অল্পকাল পরেই আমি "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রে 'ইংরেজ ভারত ছাড়িল কেন' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আমার প্রবন্ধে আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে ইহার জন্য আমরা প্রধানতঃ তিনজনের নিকট ঋণী। প্রথমতঃ মহাত্মা গান্ধীর প্রচারের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এরূপ দৃঢ়ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে দমন নীতি অর্থাৎ সৈন্যবল ব্যতীত ভারতে বৃটিশ আধিপত্য রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু হিটলারের সহিত যুদ্ধের ফলে ইংরেজ সৈন্যের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে ভারতীয় সিপাহীদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অথচ সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের ফলে ইংরেজ বুঝিতে পারিল যে প্রধানতঃ যে ভারতীয় সিপাহী সৈন্যের সহায়তায় তাহারা ভারতবর্ষ জয় ও এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, অতঃপর তাহাদের উপর আর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং ইংরেজ শ্রমিকদল মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াই ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

অতএব আমার মতে ভারতের মুক্তিলাভের কৃতিত্ব একমাত্র—এমনকি, প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য এই বহুল প্রচারিত মত ও সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। উপসংহারে আমি লিখিয়াছিলাম যে আমাদের পরাধীনতা হইতে মুক্তিদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ মহাত্মা গান্ধী, হিটলার ও সুভাষ বসুর তিনটি স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

আমার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ডে (৩৯৭ পৃষ্ঠা) আমি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে আমার এই মত ব্যক্ত করিয়াছি ঃ

"১৯৪৬ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতীয় নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে। ঠিক তাহার পরদিনই বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে ব্রিটিশ মন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে, স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান গঠন-সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য মন্ত্রীসভার তিনজন সদস্য (Cabinet Mission) ভারতে যাইয়া ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন।...ইহাও বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, জাপানী সৈন্য রেঙ্গুন অধিকারের চারি দিন পরেই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির দূত হিসাবে ক্রীপসকে (Cripps) ভারতে পাঠাইবার ঘোষণা করা হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, ১৯৩৩ সনে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হওয়ার পরে গান্ধী ভারতের মুক্তিসংগ্রামে আর কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন

নাই। অপর দিকে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন ও সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলিয়া ইহার সম্বর্ধনায় ইংরেজ যখন বুঝিতে পারিল যে, যে ভারতীয় সিপাহীদের সাহায্যে তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল এবং এই বিশাল সাম্রাজ্য বিদেশীয় আক্রমণ ও স্বদেশীয় বিপ্লবের হাত হইতে এতদিন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সিপাহীদের উপর আর নির্ভর করা চলে না, সেই দিনই সর্বপ্রথম তাহারা ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং তাহার জন্য ব্যবস্থা আরম্ভ করিল।"

বলা বাহুল্য আমার এই অভিমত গান্ধীভক্তদের মনঃপূত হয় নাই। বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিয়াছি আমার ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার ইংরেজী অনুবাদ দিল্লী সরকারের নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে আমার নাম 'কালো খাতায়' (Black Book) স্থান পাইয়াছে। ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে গান্ধীর ভক্তগণ ও গোঁড়া কংগ্রেস দল আমার মতটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর কৃপায়ই আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি।

আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে আমার মতটিই যে সত্য তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ সম্প্রতি পাইয়াছি।

আমার "বাংলা দেশের ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ড হইতে যে কয়েক পংক্তি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী আমার গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীমান সুরেশচন্দ্র দাসকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে হুবহু নকল করিয়া দিতেছি।

"ডঃ মজুমদারকে দিয়া বাংলা দেশের এই ইতিহাসটি লেখাইয়া এবং ইহা প্রকাশ করিয়া আপনি একটি মহৎ কর্ম করিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বিশেষতঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও মানসিক বিবর্তন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের সন্ধানীরা এই মহাগ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আপনার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে। গ্রন্থটির ভূমিকায় ডঃ মজুমদার লিখিয়াছেন যে ভারতের স্বাধীনতা যে একমাত্র, অথবা প্রধানতঃ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফল এই মত তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমি যখন অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলাম তখন যিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া ভারত হইতে ইংরেজ-শাসন সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন সেই লর্ড এ্যাটলি ভারতভ্রমণে আসিয়া কলিকাতার রাজভবনে দুই দিন অবস্থান করেন।* তখন তাঁহার সহিত আমার ইংরেজ ভারত হইতে চলিয়া যাইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে

*১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে গান্ধীর Quit India আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহুপূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সালে এমন কোন পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহার জন্য ইংরেজদের তাড়াহুড়া করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল—তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে এ্যাটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী সুভাষ বসু কর্তৃক ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীযুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরেজ-শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড এ্যাটলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইংরেজদের ভারতত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? ঐ প্রশ্ন শুনিবার পর এ্যাটলির ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন "m - i - ni - mal".

লর্ড এ্যাটলির সঙ্গে আমার ঐ আলাপের কথা আমি নেতাজীভবনে এক বক্তৃতায় সবিস্তারে বলিয়াছিলাম। All India Radio সেই বক্তৃতার বিবরণ broadcast করিয়াছিল, কিন্তু এ্যাটলির নেতাজী সম্পর্কিত কথাগুলি বাদ দিয়া।"

(স্বাক্ষর) শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রমিক দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি চার্চিল প্রভৃতি বিপক্ষ কনসার্ভেটিভ দলের নেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। সুতরাং 'ইংরেজ ভারত ছাড়িল কেন?' ইহার সম্বন্ধে এ্যাটলির উক্তিই যে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ২৮ বৎসর পূর্বে প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া আমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম আশাকরি তাহা এখন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সত্যের উপাসক। আশা করি তাঁহার ভক্তেরা সত্যের অনুরোধে আমার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের কৃতিত্ব যে কেবলমাত্র গান্ধীরই প্রাপ্য এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিয়া—ইহাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান যে মহাত্মা গান্ধীর অবদানের অপেক্ষা অন্ততঃ কোন মতেই কম নহে বরং বেশী—অপ্রিয় হইলেও এই সত্য স্বীকার করিবেন।

শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী আমাকে তাঁহার চিঠিখানি প্রকাশের অনুমতি প্রদান এবং আমার গ্রন্থের প্রকাশক ও ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র দাস এই চিঠিখানি আমার দৃষ্টিগোচরে আনয়নের জন্য আমি উভয়কেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশাকরি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই পত্রখানি একটি মূল্যবান দলিল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

[শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তীর চিঠির প্রতিলিপি মুদ্রিত করা হইল।]

[illegible] ভূমিকায় ডঃ [illegible] লিখিয়াছেন যে ভারতের
স্বাধীনতার যে একজন, একজন সৈনিক, [illegible]
অসহযোগ আন্দোলনের কাল, এই যে তিনি গ্রহণ করিয়া
ছিলেন তাই। আমি যখন অসহযোগ আন্দোলনে ছিলাম,
তখন, তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতার দিকে ভারত হইতে
ইংরেজ-শাসন [illegible] [illegible], সেই সব [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] দুই দিন [illegible]
[illegible]। তখন, [illegible] তাঁহার সহিত আমার ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
আমি [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলাম, [illegible]
Quit India আন্দোলনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ইংরেজ-শাসনের [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতের [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ইংরেজ-শাসনের [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible]
[illegible] করিয়াছিলাম, ইংরেজের [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে এবং তিনি
[illegible] [illegible] [illegible] "minimal"।

[illegible] [illegible] [illegible] আমার ও আমাদের [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলাম। All India Radio
[illegible] [illegible] [illegible] broadcast করিয়াছিলেন, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নির্দেশিকা

স

হ